উৎসর্গ

যাঁব জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হিমালয়েব দুর্গম তীর্থগুলি-দর্শনে
যাত্রা কবেছিলাম ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবেব অন্তবঙ্গপার্ষদ
পবিব্রাজকাচার্য সেই **শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ**
মহারাজের পুণ্যজন্মতিথি-দিবসে তাঁব
স্মৃতিব উদ্দেশে পুস্তকখানি
উৎসর্গীকৃত হলো।

॥ বিষয়-সূচী ॥

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

॥ কেদারনাথ—বদরীনারায়ণ ॥

এক

॥ হরিদ্বার—ঋষিকেশ ॥

ছ' মাসের উদ্যম, প্রচেষ্টা আর পরিকল্পনার আংশিক রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করে এক অজানা আনন্দে মনটা দুলে উঠল যখন ৩রা মে, বুধবার, সন্ধ্যা ৭-৫৫ মিনিটে কুণ্ডু স্পেশ্যালে অমৃতসর মেল যোগে কেদারবদরী যাত্রার উদ্দেশ্যে হরিদ্বার অভিমুখে রওনা হয়ে গেলুম—সঙ্গে নিয়ে শ্রদ্ধাস্পদ গুরুভ্রাতা ব্রহ্মচারী নির্মলচৈতন্য, সহকর্মী শ্রীসীতেন্দ্রনাথ রায় ও স্বামী প্রশান্তানন্দকে (ওরফে প্রদ্যোৎ মহারাজ)। বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে কেদারনাথজীর একান্ত আকর্ষণে শেষ মুহূর্তে এসে সঙ্গ নিলেন এক অতি-পরিচিত গ্রামবাসী প্রতিবেশিনী শ্রীগৌরীবালা ঘোষ হাজরা ওরফে গৌরীদি ও পরম স্নেহের পাত্রী তাঁর ব্রহ্মচারিণী কন্যা সারদা-সঙ্ঘের অজিতা। উভয় পক্ষ থেকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য হাওড়া ষ্টেশনে লোকজনের উপস্থিতিও কম হয় নি সেদিন। মানুষের প্রতি মানুষের যে একটি অনিবার্য আত্মিক আকর্ষণ আছে এ সত্যটুকু উপলব্ধি করতে বিলম্ব হয় না প্রবাসযাত্রা-প্রাক্কালে অভিনন্দনের আতিশয্যটুকু দেখে। এইসব অভিনন্দন জ্ঞাপনকারীদের সংখ্যাধিক্য ও কলকাকলিতে আমাদের কামরাটি পূর্ণ থাকায় প্রথমে বেশ একটু বিরক্তিভাব এসেছিল কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থায়। এই ভেবে যে, এই সংকীর্ণ কামরাটিতে এতগুলি প্রাণীর স্থান-সংকুলান হবে কেমন করে। গাড়ীটি চলার সঙ্গে সঙ্গে সে ভাব কিছুটা উপশম হয়েছিল এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের কামরাটির স্ত্রী-পুরুষ সকল যাত্রীই আলাপচারী হয়ে উঠেছিলুম একটি ঘরোয়া পরিবেশে। কারণ অনেকেই এই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলুম যে, কয়েক-

দিন এইভাবে পাশাপাশি একই পরিবেশে কাটাতে হবে পরস্পরের সুখ-দুঃখের সমব্যথী হয়ে। হলোও তাই। একটি রাত্রির মধ্যেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া ও মধ্যবয়সীদের মধ্যে একটি অখণ্ড পারিবারিক বন্ধন গড়ে উঠল এবং একে অপরের সঙ্গে আদান-প্রদানের মাধ্যমে পূরণ ক'রে নিতে লাগলেন নিজ নিজ অভাব অভিযোগগুলি। এক রাত্রির মধ্যেই ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়ে গেল, ম্যানেজার শ্রীসৌম্যেন মুখার্জির সঙ্গে—সূক্ষ্ম একটি যোগসূত্র ধরে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচার বিভাগের এ্যাসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বন্ধুস্থানীয় শ্রীসত্যেন মুখার্জির জেঠ্‌তুত ভাই তিনি—এই সুবাদে। নৈশ আহারের তত্ত্বাবধায়ক এ্যাসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার অসিতবাবুর সঙ্গেও আলাপ হ'তে বিলম্ব হল না, কারণ বেশ অমায়িক স্বভাবের মানুষ তিনি। অমৃতসর মেল হুস্-হুস্ শব্দে ছুটে চলেছে। পরিচিত-অপরিচিত বহু ষ্টেশন অতিক্রম করে চলেছি একের পর এক। ভেসে উঠতে লাগল দেবাশীষ, অরুণ, নীরদবাবু ও পূর্ণেন্দুবাবুর মত সুহৃদ্‌জনের পরিচিত মুখগুলি—যাঁরা এসেছিলেন পরম আত্মীয়ের ন্যায় ষ্টেশনে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে। রাত্রি ৯॥-টার মধ্যে নৈশ-ভোজনের পর্ব শেষ হল—লুচি, বেগুন ভাজা, ডাল, আলু-পটলের দম ও রসগোল্লা সহযোগে। সর্বাঙ্গসুন্দর হত টুরিষ্ট-কোচটির শয়নোপযোগী স্থানের সীমা আরও একটু প্রশস্ত হলে। এইভাবে আমরা ২৮ ঘণ্টা ট্রেনে কাটিয়ে ৫ই মে রাত্রি ১২-৯ মিনিটে লাক্‌সার ষ্টেশনে পৌঁছলুম। সেখানে আমাদের কোচটি কেটে রেখে অমৃতসর মেল দ্রুতগতি ছুটে চলল আপন গন্তব্য পথে। আমরা আধো-ঘুম আধো-জাগা অবস্থায় নিভৃতে পড়ে রইলুম লাক্‌সার ষ্টেশনে।

সেখান হতে অন্য একটি যাত্রীবাহী গাড়ী প্রায় ৩-টার সময় আমাদের কোচটিকে টেনে নিয়ে হরিদ্বার পৌঁছল ভোর ৫-টায়। ৫-৫॥-টার মধ্যেই এঁদের প্রাতঃকালীন চা দেবার ব্যবস্থা। ৭-৭॥টায় চা জলখাবারের সঙ্গে সিঙ্গাড়া, নিমকি, কচুরী, বেগুনি, পকৌরী—

যেখানে যেমন সেখানে তেমন ব্যবস্থা। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় যেখানে যেমন তরকারী সুলভ সেখানে সেইরূপ। কখনওবা তৎসহ দধি। নৈশভোজনের ব্যবস্থাও তদনুরূপ—রাত্রে লুচি, রুটি, ভাত। যিনি যেটি চাইবেন তৎসহ কোথাও রাবড়ি, কোথাও পায়েস বা রসগোল্লা, লেডিকেনি, বঁদে ও মিহিদানা। যাঁরা একাদশী পূর্ণিমা করেন তাঁদের জন্য ফল মিষ্টির ব্যবস্থা। এক কথায় কুণ্ডু স্পেশ্যালের খাদ্যসরবরাহ ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সুন্দর বলা চলে।

হরিদ্বার অতি পরিচিত স্থান। পূজার ছুটিতেও ঘুরে গেছি একবার --অনেক কিছুই এখানে জানাশোনা। ছড়িদার (পাণ্ডার প্রতিনিধি, পথপ্রদর্শক ও সেবক—যাত্রীরা সকলে মিলে এঁর ব্যয়ভার বহন করেন, পাণ্ডারা কিছু পারিশ্রমিক দিয়ে থাকেন) জিৎ সিং সকলকে সঙ্গে নিয়ে সকাল ৭-টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে। আমরাও বেরিয়ে পড়লুম ব্রহ্মকুণ্ডের হিমশীতল জলে স্নান করে ধন্য হবার আশায়। যাঁরা হরিদ্বারে এই প্রথম এসেছেন তাঁরা নবোদ্যমে দু'চোখ ভরে ষ্টেশন হতে পথিপার্শ্বের দৃশ্যাবলী দেখে চলেছেন। আমরা সময়াতিবাহিত করছি আলাপে আর গুঞ্জনে। এইভাবে প্রায় ১॥ মাইল পথ অতিক্রম করে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে স্নিগ্ধ হলুম সকলে। গত দু'রাত্রির ক্লান্তি অপনোদনে প্রত্যেকের চোখ-মুখে একটি পরম তৃপ্তির আভাস। এখন সকলেই হর-কি-পৌড়ীর বাজার ঘুরে দেখায় ব্যস্ত। বিশেষ করে মহিলাদের মন এটা-সেটা কেনার জন্য উশ্‌খুশ্‌ করছে। যাত্রাপথের একান্ত সঙ্গী হিসাবে আমরা কয়েকজন কয়েকটি লাঠি কিনেই সন্তুষ্ট হলুম। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন বৃদ্ধার অনুরোধে আরও কয়েকটি লাঠি কেনা হ'ল। গড়ে প্রতিটি লাঠির মূল্য ৬২ পয়সা। ধীরে ধীরে আপন মনের মানুষের সঙ্গে এক-একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন সকলে, কেনা-কাটা ও বাজার দর্শনের অভিপ্রায়ে। প্রত্যেক মানুষের এক-একটি স্থানে কয়েকটি বিশেষ দর্শনীয় বস্তুর প্রতি থাকে তীব্র আকর্ষণ। ব্যক্তিগত

এমনি একটি আকর্ষণ আছে আমার হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ড ও ভোলানন্দ গিরির আশ্রমের প্রতি। যখনই হরিদ্বার আসি এ দুটি স্থান বাদ দিই না দর্শন-সূচী হতে। তাই ধীরে ধীরে হর-কি-পৌড়ীর বাজারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি এটা-সেটা দেখতে দেখতে ভোলানন্দ গিরির আশ্রম অভিমুখে। নির্মল মহারাজ ও সীতেনবাবু দু'একটি অজুহাতে ফিরে গেলেন আমাদের টুরিষ্ট কোচের আস্তানায়। চলেছি আমি ও প্রদ্যোৎ মহারাজ। পথের সাথী হিসাবে প্রদ্যোৎ মহারাজকে উত্তম সাথী বলা চলে। সুযোগ পেয়ে সঙ্গ নিয়েছে অজিতা আর আমাদের কামরার শ্রীমতী ছবি মুখার্জী (Saha Institute of Nuclear Physics-এর Professor Dr. S. K. Mukherjee-র সহধর্মিণী)। উভয়েই শিক্ষিতা। ভোলানন্দ গিরির আশ্রম ও গঙ্গার উচ্ছল তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখে ফিরে এলুম হরিদ্বার ষ্টেশনে টুরিষ্ট কোচে বেলা ১১॥০-টায়। যথারীতি মধ্যাহ্ন ভোজনের পর্ব শেষ হল ১২॥০ টাব মধ্যে। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে মধ্যাহ্নে সরবৎ ও বৈকালিক চা-জলখাবারের সদ্ব্যবহার করে সন্ধ্যার প্রাক্কালে রওনা হলুম কনখল রামকৃষ্ণ সেবা-শ্রমের দিকে। সঙ্গে নির্মল মহারাজ, প্রদ্যোৎ মহারাজ ও সীতেনবাবু। এখানে (হরিদ্বারে) যাঁরা নতুন এসেছেন তাঁদের কেউ হরিদ্বারের দর্শনীয় বস্তু দেখতে, কেউ ব্রহ্মকুণ্ডে আরাত্রিক দর্শনে, কেউবা কনখলে দক্ষ প্রজাপতির রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দর্শনের জন্য যাত্রা করলেন।

কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের তৎকালীন কর্মসচিব (Secretary) স্বামী প্রমথানন্দজী আমাদের পরিচিত বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি। সাত বৎসর পূর্বে ১৯১১ সালে মাতাঠাকুরাণীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম এই সেবাশ্রমে। তখনকার কনখল সেবাশ্রম এখন নবরূপে হয়েছে সজ্জিত। স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্বামীজীর একটি ধ্যানগম্ভীর মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আশ্রমের প্রবেশপথের দক্ষিণ পার্শ্বে। নির্মিত হয়েছে ৪৭টি শয্যাবিশিষ্ট X-Ray, Electro-

Theraphy ও Laboratory সহ বৃহৎ অট্টালিকা "Vivekananda Centenary Block" নাম দিয়ে। এই সুদূর পার্বত্য অঞ্চলে রোগগ্রস্তদের সেবাশুশ্রূষার এরূপ সুষ্ঠু পরিকল্পনা দেখে সত্যই মস্তক অবনত হয়ে আসে সেই মহামানবটির প্রতি, যিনি একদিন উদাত্তকণ্ঠে তাঁর এক অনুগত শিষ্যকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন :

"My boy can you do something for the suffering people at Hardwar and Rishikesh who have got none to look after them during their illness? Go and serve them."

এই বাণীরই সার্থক রূপায়ণ ফুলে ফলে সুশোভিত কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম। আশ্রমপরিধির মধ্যেই প্রবাহিত খরস্রোতা ভাগীরথী। স্বামী প্রমথানন্দজী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমগ্র আশ্রম-পরিধি ও বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী ব্লকের প্রতিটি কক্ষ অর্গল মুক্ত করে দেখালেন সযত্নে। ফুলে ফুলে সজ্জিত আশ্রম-মন্দিরে সন্ধ্যার পূত আরত্রিক-লগ্নে জীবনদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আরাত্রিকে যোগদান করে ভক্তিরসাপ্লুত চিত্তে প্রণতি জানিয়ে আশীর্বাণী প্রার্থনা করলুম দুর্গম-যাত্রারম্ভের প্রাক্কালে। মন্দিরের পূজক—প্রদ্যোৎ মহারাজের বন্ধুস্থানীয়। প্রমথানন্দজীর সাদর অভ্যর্থনা, আতিথ্য ও অমায়িক ব্যবহার যাত্রাপথের পাথেয় হয়ে রইল। ফেরার পথে সেবাশ্রম হয়ে যাবার অনুরোধ জানালেন তিনি। ফিরে এলুম হরিদ্বারে রাত্রি ৮-টায়। সেখানে রাত্রের আহারাদি সমাপ্ত করে টুরিষ্ট কোচে রাত্রি কাটিয়ে পরদিন ৬ই মে ঋষিকেশ পৌঁছলুম সকাল ৬-টায়।

ঋষিকেশের দীর্ঘ কর্মসূচী—সকাল হতে সন্ধ্যা। এখানেও আমাদের একজন সুপরিচিত বিদগ্ধ সন্ন্যাসী সদানন্দ গিরির আশ্রম, তিলক রোডে। প্রাতরাশ সমাপ্ত করে নির্মল মহারাজ, প্রদ্যোৎ মহারাজ ও সীতেনবাবু সহ চারজন যাত্রা করলুম সদানন্দ মহারাজের

আশ্রমাভিমুখে। প্রথম সাক্ষাতেই সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। সেই সঙ্গে এ কথাও জানালেন যে, গত ২-৩ দিন যাবৎই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি। বহু বৎসর পরে এই সুদূর উত্তরাঞ্চলে একজন বহু-পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাতে সত্যই অন্তরে একটি অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হয়েছিল। তাঁর মুখেচোখেও সুপরিস্ফুট সে আনন্দের দীপ্তি। সদানন্দ মহারাজের সঙ্গে আলোচনাকালে অতীত স্মৃতির রোমন্থনে সেদিন কত কথাই ভেসে উঠছিল মানসপটে। যেহেতু তিনি এক সময় বেদান্ত মঠে আমাদের নিত্যসঙ্গী ছিলেন। এইভাবে ঘণ্টা-দুই আলাপ-আলোচনার পর যে মুখ্য উদ্দেশ্যে আমরা তাঁর শরণার্থী সেই কাজে বেরিয়ে পড়লুম আশ্রম হতে তাঁর পরিচিত এক Photographer-এর Studio অভিমুখে। উদ্দেশ্য ঋষিকেশে যেস্থানে ঝুপড়ি বেঁধে ১৮৮৮-৯০ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ তৎকালীন সমগ্র উত্তরাঞ্চলের অদ্বিতীয় ষড়দর্শনবিৎ পণ্ডিত ও বৈরাগ্যবান জ্ঞানী সন্ন্যাসী কৈলাসমঠের মোহান্ত ধনরাজ গিরির নিকট শাঙ্করভাষ্য সমেত বেদান্ত অধ্যয়ন করেছিলেন সেই স্থানের একটি ছবি নেওয়া। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের কর্মসচিব স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজীর সহিত স্বামী সদানন্দ গিরির পত্রালাপের মাধ্যমে সব ব্যবস্থাই পূর্বসূচী স্থির ছিল। কেবলমাত্র স্থানটি একবার স্বচক্ষে দর্শন করে কি ভাবে কৈলাস মঠকে পটভূমিকায় রেখে ছবিটি নিলে সুবিধা হয় সে সম্পর্কে পরস্পর একটি যুক্তি করে Photographer-কে সেই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হল। সেই সঙ্গে অগ্রিম মূল্য বাবৎ কিছু দিয়ে কেদারবদরী হতে ফেরার পথে ঋষিকেশ হতে ছবিটি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হল। আমরাও কেদারবদরী যাত্রার পথের স্মৃতি হিসাবে এখানে একটি ছবি তুলে নিলুম। ঋষিকেশের গঙ্গায় স্নান সেরে বেলা ১০॥-টায় ফিরে এলুম টুরিষ্ট কোচের বাসস্থানে। মধ্যাহ্ন ভোজনের পালা শেষ করে বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় বৈকালে ঋষিকেশ অভিমুখে যাত্রা করলুম চারজনে মিলে। ঋষিকেশের বাজার

ঘুরে ভরতজীর মন্দির দর্শন করে চন্দ্রেশ্বর শিবমন্দিরে আরাত্রিক দর্শনে যাত্রা করলুম। যে স্থানে (এখন নদীগর্ভে লীনপ্রায়) ফুস-ঘাসের ঝুপড়ি বেঁধে স্বামী অভেদানন্দ পরিব্রাজক অবস্থায় কিছুকাল সাধনায় অতিবাহিত করেছিলেন সে স্থানটিও দেখে নিলুম যাবার পথে। ফেরার পথে সাক্ষাৎ হল সদানন্দ মহারাজের সঙ্গে। ঋষিকেশ ষ্টেশনের পথ ধরিয়ে দিয়ে তিনি আশ্রমাভিমুখে চলে গেলেন। আমরা রাত্রি ৮৷৷-টায় ঋষিকেশ ষ্টেশনে প্রত্যাবর্তন করলুম। নৈশভোজন সমাপ্ত করে ঋষিকেশে রাত্রি কাটল।

পরদিন ৭ই মে ৫-৪৫ মিনিটে প্রথম কিস্তির (1st gate) বাস যোগে 'জয় কেদারনাথজী কি জয়' বলে রওনা হয়ে গেলুম কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্মচারী সহ ৫০জন যাত্রী গুপ্তকাশী অভিমুখে। ঋষিকেশ হতে গুপ্তকাশীর দূরত্ব ১১৫-১২০ মাইল। উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৪৮০০´ ফুট। পাহাড় অঞ্চলে সাধাবণত আপ-ডাউন বাসের একটি সময় আছে। তদনুসারে রাস্তা দু'এক ঘণ্টা আপ ও ডাউন বাসের জন্য খোলা থাকে। এভাবে পর পব বিভিন্ন কিস্তিতে আপ ও ডাউন বাসগুলি যাতায়াত করে। এর এক-একটি কিস্তির নাম gate. প্রথম কিস্তি 1st gate, দ্বিতীয় কিস্তি 2nd gate এবং তৃতীয় কিস্তি 3rd gate. এইভাবে ঋষিকেশ থেকে যাবার তিনটি কিস্তির বাস আছে।

দুই

॥ গাড়োয়াল—কেদারনাথের পথে দেবপ্রয়াগ ॥

৭ই মে ভোর ৫-৪৫ মিনিটে ঋষিকেশ হ'তে বাস চলতে শুরু করল বাঁয়ে রেখে যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী যাত্রার পথ। বাসখানি চলেছে ব্যাসচটি বা ব্যাসঘাট অভিমুখে। ঋষিকেশ হতে ব্যাসচটির দূরত্ব ২২ মাইল। এ রাস্তাটি বেশ প্রশস্ত। দুপাশের বড় বড় গাছের ছায়া এসে পড়েছে পথের ওপর। বনাচ্ছাদিত অঞ্চল—এখানে সেখানে ছোট ছোট নির্ঝরিণী। পাহাড়ের নীচে ব্যাসগঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গম—পায়ে-হাঁটা পথ ছিল পাশ দিয়ে—মোটরপথ হয়েছে অনেকটা ওপরে। এখান হতে দেবপ্রয়াগের দূরত্ব ২৩ মাইল। সামান্য কিছু সময়ের জন্য ব্যাসঘাটে অপেক্ষা করল বাসখানি ডাউন বাসগুলির জন্য। বেলা ৮-২০ মিনিটে দেবপ্রয়াগ এসে পৌছলুম।

এক এক কিস্তির বাসগুলি যখন চলতে থাকে তখন প্রথম বাসখানিতে লাল পতাকা ও শেষখানিতে নীল পতাকা যুক্ত থাকে। নীল পতাকাযুক্ত বাসখানি এলেই গেটের পুলিশ জানতে পারে যে সে কিস্তির শেষ বাস এসে গেল, তখন পুলিশ বাসগুলির নম্বর নিয়ে গেট পেরিয়ে যাবার অনুমতি দেয়। এইভাবে গুপ্তকাশী পর্যন্ত কেদারের পথে বাসগুলি চলতে থাকে। ঋষিকেশ থেকে দেবপ্রয়াগের দূরত্ব ৪৫ মাইল, উচ্চতা ১৭০০´ ফিট। এখানে ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থল। বাস স্ট্যাণ্ড থেকে ৮-১০ মিনিট নীচে এই সঙ্গম। ভাগীরথীর জল কিঞ্চিৎ পলি-মিশ্রিত। অলকানন্দার জল স্ফটিক-স্বচ্ছ। মহিলা যাত্রীদের অনেকেই স্নানাদি সেরে নিলেন এই সঙ্গমে। দ্রুতগতি গিয়ে আমরা সঙ্গমবারি মস্তকে স্পর্শ করলুম। আমাদের মধ্যে নির্মল মহারাজ সঙ্গমে স্নান করেছিলেন। কেদার-বদরী যাত্রা পথে পঞ্চ-প্রয়াগের মধ্যে দেবপ্রয়াগ প্রথম প্রয়াগ বা সঙ্গমস্থল।

অন্যগুলি যথাক্রমে রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ ও বিষ্ণুপ্রয়াগ। ভাগীরথী ও অলকানন্দা উভয়েই বেগবতী। স্বচ্ছ জলধারা প্রবল স্রোতবেগে পর্বতগাত্রে প্রহত হয়ে অগণিত শুভ্র ফেনায়মান লহরীতে শোভিত। এখানে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ সেবে নিলুম। বেলা ১০-২০ মিনিটে আমাদের বাসটি চলল শ্রীনগর অভিমুখে।

॥ শ্রীনগর ॥

শ্রীনগর পৌঁছলুম ১১-৪৫ মিনিটে। দেবপ্রয়াগ হতে ২৪ মাইল পথ। উচ্চতা ২০০০´ ফুট। শ্রীনগরের প্রায় ১ মাইল পূর্বেই দেখা যায় পুরাতন পায়ে হাঁটা-পথ এবং সেখানেই তুটি পথের সংযোগস্থল। বর্তমানে যে বাস চলাচলের পথ তা অলকানন্দার ওপার দিয়ে এসে কীর্তিনগর ছাড়িয়ে নবনির্মিত সেতুব এপারে চলে আসে। কিছুদুব অগ্রসর হলেই তুটি পথ এক হয়ে গেছে। ঋষিকেশ ও পৌড়ীর রাজপথ। পৌড়ীর মোটরপথও উপর থেকে নেমে এসেছে। পূর্বে শ্রীনগর ছিল গাড়োয়ালের রাজধানী। গাড়োয়াল জেলার সর্বাপেক্ষা বড় নগর এটি। এখানে কালী-কম্বলীর অতি বৃহৎ ধরমশালা, ডাক-বাংলো, ডাক ও তার-ঘর, পুলিশ থানা, হাইস্কুল ও মেয়েদের স্কুল প্রভৃতি আছে। এখানকার ছাত্রীরা বাঙালী মেয়েদের মত কাপড় পরতে সুরু করেছে। একটি বাজারও আছে—প্রায় সবরকম দ্রব্যাদিই মেলে। নীচেই অলকানন্দা বয়ে চলেছে উচ্ছল গতিতে। বেলা ১২-১৫ মিনিটে এখান হতে বাস ছেড়ে চলল রুদ্রপ্রয়াগ অভিমুখে। ঋষিকেশ হতে রওনা হবার ঘণ্টা তুয়েকের মধ্যেই বেশ কয়েকজনের বমি হতে সুরু হল। তাঁদের মধ্যে মহিলা যাত্রীর সংখ্যাই অধিক। কয়েকজন ক্রমাগত বমি করে বেশ কাতর হয়ে পড়েছিলেন। পুরুষদের মধ্যে একমাত্র এ্যাসিষ্টেন্ট ম্যানেজার অসিতবাবু বমি করে পুরুষ যাত্রীদের নামে কলঙ্ক লেপন করলেন। প্রদ্যোৎ মহারাজ ট্যাবলেট খেয়ে কোনরকমে সামলে নিলেন।

॥ রুদ্রপ্রয়াগ ॥

শ্রীনগর হ'তে ১২-১৫ মিনিটে রওনা হয়ে ২২ মাইল অতিক্রম করে রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছলুম বেলা ১-৪০ মিনিটে। এদিন পথিমধ্যে প্যাকেট ব্যবস্থায় খাদ্যসরবরাহ পাঁউরুটি, জেলি, আলু-মরিচ ও বঁদে সহযোগে। প্রবেশ পথে দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের উপর নবনির্মিত কলেজের ঘরবাড়ী, হাসপাতাল, ডাকবাংলো সব ছাড়িয়ে বাস স্ট্যাণ্ড। অলকানন্দার ওপর বড় সেতু। ওপারে পাহাড়ের তলা দিয়ে টানেল। সেতু পেরিয়ে টানেলের মধ্য দিয়ে বাসগুলি অপর দিকে মন্দাকিনীর তীরে আসে। এই মন্দাকিনী ধরেই বাস ছুটে চলবে গুপ্তকাশী অভিমুখে। অলকানন্দার সেতু পার হয়ে অপর পারেই অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল। এখান থেকেই পৃথক রাস্তা একটি কেদারনাথ, অপরটি অলকানন্দার দক্ষিণ তীর ধরে সোজা চলে গেছে বদরীনারায়ণের দিকে। কেদারের পথ গেছে বাঁয়ে ঘুরে। সামান্য পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করেই ১-৪৫ মিনিটে বাসখানি রুদ্রপ্রয়াগ ছেড়ে কেদারনাথের পথ ধরে চলতে শুরু করল গুপ্তকাশী অভিমুখে। মধ্যে চন্দ্রাপুরী পেরিয়ে বাস চলেছে সোজা কুণ্ডচটির দিকে। নূতন সেতু পেরিয়ে নদীর অপর পারে চটি। সেখান হতেই গুপ্তকাশীর চড়াই শুরু। পথের দুধারে বড় বড় আমগাছ ও অশ্বত্থের ছায়া। কোথাওবা পাশেই ঝরণা অথবা জলের ধারা। পথের ধারে ধূলি-ধূসরিত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করছে। ঘড়া-কলসী কাঁখে গ্রামবাসিনীরা হেলে-দুলে চলেছে। কোথাওবা পথের বাঁকে দোকানের বেঞ্চে বসে পুরুষেরা জটলা করছে।

॥ গুপ্তকাশী ॥

এমনি করে চলতে চলতে ৩-৩০ মিনিটে গুপ্তকাশী এসে পৌঁছলুম রুদ্রপ্রয়াগ হতে ২৪ মাইল আর ঋষিকেশ হ'তে প্রায় ১১৫৷২০ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে। আমাদের ছড়িদার জিৎ সিং ধরমশালায় নিয়ে

যাবার জন্য এখানে বাস স্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করছিল। সকলেই শ্রান্ত দেহে, ত্রস্তপদে, নিজ নিজ মাল কুলির পিঠে দিয়ে বেশ একটু চড়াই ভেঙে গুপ্তকাশীর ধরমশালায় উপস্থিত হলুম বৈকাল ৪টায়। ধরমশালাটি ছিল চন্দ্রশেখর মহাদেব মন্দিরের সন্নিকটে। মন্দিরের পাশেই মণিকর্ণিকা নামে যে কুণ্ড আছে সেখানে গঙ্গা-যমুনা নামে দুটি ধারা নির্গত হচ্ছে—সেই জলে স্নানাদি সেরে সারাদিনের ক্লান্তি অপনোদন করলুম সকলেই। সামনে একদিকে দূরে বদরীনাথের তুষারশীর্ষ। বাঁক ঘুরেই কেদারনাথের হিমানী-চূড়া। নীচে মন্দাকিনীর উপত্যকা। অপর পারে পাহাড়ের গায়ে উখীমঠ। ঘরবাড়ী, মন্দির। উখীমঠ কেদার তীর্থের একটি প্রধান কেন্দ্র। শীতকালে—অর্থাৎ বৎসরের ছয়মাস যখন কেদারনাথ মন্দির বন্ধ থাকে, উখীমঠেই পূজা হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বৈকালিক চা-পর্ব শেষ করে গুপ্তকাশীর ছোট বাজারের দিকে রওনা হয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগলুম এবং সীতেনবাবুর সঙ্গে এখানকার একটি দোকান হ'তে কানঢাকা (Monkey Cap) টুপি ক্রয় করলুম ২-৫০ পয়সা দিয়ে। শীতপ্রধান দেশে যাত্রাপথে এটির প্রয়োজনীয়তা যে কত মূল্যবান তা চলার পথে অনুভব করতে পেরেছিলুম। গুপ্তকাশীর দর্শনীয় বস্তু হল—মহাদেবের মন্দির, মন্দিরাভ্যন্তরে কাশী বিশ্বেশ্বরেব লিঙ্গমূর্তি ও নন্দীশ্বর, সেই সঙ্গে অষ্টধাতুনির্মিত পার্বতীর সুন্দর মূর্তি। গুপ্ত-কাশীতেই কেদারনাথের পাণ্ডাদের বাসস্থান। আমাদের পাণ্ডা পণ্ডিত মহাদেওপ্রসাদ শর্মার পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। এখানে বাবা কালী-কম্বলীর ধরমশালা, সদাব্রত, ডাক ও তার-ঘর আছে। গুপ্ত-কাশীতেই মালপত্র ওজন করে কুলির পিঠে দেবার ব্যবস্থা। যথারীতি সব ওজন করে কুলির পিঠে দেওয়া হল। এজন্য যাত্রা-সূচী পূর্ব-নির্দিষ্ট সময় হতে একবেলা পিছিয়ে গেল। আলাপ-আলোচনা ও যুক্তি করে গৌরীদিকে গুপ্তকাশী হ'তেই ডাণ্ডী ভাড়া ক'রে দেওয়া হ'ল। মালবাহী কুলিভাড়া কেদারনাথ পর্যন্ত যাতায়াত ১'৫০ পঃ

প্রতি কে. জি.। ঘোড়া ৮০'০০+১২'০০ (খাদ্য খরচ)=৯২'০০, ডাণ্ডী ১৮০'০০+১২'০০ (খাদ্য খরচ)=১৯২'০০, কাণ্ডি ৬৫'০০ টাকা। ভাড়াগুলি মোটামুটি এইভাবেই চলে। কদাচিৎ সামান্য তারতম্য ঘটে।

সান্ধ্য-উপাসনায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও আচার্যদেব স্বামী অভেদানন্দের চরণে অন্তরের আকুতি নিবেদন করলুম—নিরাপদে যাত্রাপথ অতিক্রম করার শক্তি সঞ্চয় মানসে। চলার পথে এল অদম্য উৎসাহ ও নির্ভীকতা। নিঃশঙ্কচিত্তে হ'ল পথ চলা শুরু। কবির ভাষায় "অকারণ, অবারণ চলা।"

॥ নলাচটি—ভেতা—মৈখণ্ডা ॥

গুপ্তকাশীর গা বেয়ে সোজা পথ। সেই পথ ধরেই ৮ই মে ১১-৪৫ মিনিটে গুপ্তকাশী হতে চলতে শুরু করে এক মাইলের মধ্যেই নলাশ্রম বা নলাচটি। বহু নীচে মন্দাকিনীর উপত্যকা। দুপাশে সারি সারি ঘর। পথের বাঁকে প্রকাণ্ড এক বৃক্ষের ছায়া। নূতন পথ তৈরী হচ্ছে রামপুর পর্যন্ত। মজুরেরা দলে দলে কাজ করছে, পাহাড় ভাঙছে, পাথর ভাঙছে। নলাচটিতে ভগবতী ললিতা দেবীর মন্দির। পূজারী যাত্রীদের কাছে দেবীপূজার বস্ত্রাদির জন্য কিছু-কিছু প্রণামী আদায় করলেন। এক মাইল পরেই ভেতা চটি। অধুনা এসব চটিগুলির গুরুত্ব তেমন কিছু নাই। তবে মাঝে মাঝে ক্লান্তি অপনোদনের জন্য চা সিগারেট খাওয়ার অছিলায় বিশ্রাম নেবার সুবিধা হয় মাত্র। আরও তিন মাইল অগ্রসর হয়ে মৈখণ্ডা চটি। নব-নির্মিত মোটর মার্গ হতে মৈখণ্ডা হাঁটা-পথে মাত্র আধ মাইল। আমরা চলেছি হাঁটা-পথেই। এখানে মহিষমর্দিনী দেবীর মন্দির ও হিন্দোলা আছে। দেবী ভগবতী এখানে মহিষাসুরকে খণ্ড করে বধ করেন, এজন্য এখানে দেবীর নাম মহিষমর্দিনী। স্থানের নাম মৈখণ্ডা। এরূপ কথিত আছে যে, মহিষাসুরকে বধ করে দেবী উক্ত হিন্দোলায়

চড়ে আমোদ প্রমোদ করেছিলেন। মন্দিরের সম্মুখে কয়েকটি মৃগচর্মের আসন পাতা। পূজারী অন্ততঃ দেড় কে. জি. আটার মূল্য বাবদ দক্ষিণা প্রার্থনা করতে লাগলেন। যৎসামান্য দান করে দেবীকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলুম।

॥ ফাটা চটি ॥

এইভাবে আমরা ফাটায় পৌঁছলুম ৪-২০ মিনিটে। গুপ্তকাশী হতে ফাটার দূরত্ব ৭ মাইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে গেল চা ও পকৌরী। পরম তৃপ্তি সহকারে সেগুলি শেষ করতেই বিছানাগুলি এসে গেল। তখন বিশ্রামের জন্য তৎপর হয়ে হোল্ড-অল্ খুলতে লাগলুম। এখানেই আমাদের রাত্রিবাস। শীতের প্রকোপ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে প্রায় ৫২৫০´ ফুট উচ্চে উঠে এসেছি। ফাটায় ধরমশালা হ'তে শৌচাগার বেশ দূরে। সুতরাং শহুরে মানুষের কাছে এ ব্যবস্থা বিরক্তিজনক ও কষ্টকর মনে হচ্ছিল। গুপ্তকাশী হতে ফাটা পর্যন্ত মোটর রাস্তা নির্মিত হয়েছে এবং রামপুর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। বর্তমানে ঐ পথে রামপুর পর্যন্ত বাস চলাচল করছে। জীপ ও মালবাহী গাড়ীগুলিও চল্‌ছে। ফাটা একটি সুন্দর স্থান। ধরমশালা, ডাকবাংলা, পোষ্ট অফিস, হাসপাতাল সবই আছে। সব রকম খাদ্যদ্রব্যও মেলে।

॥ রামপুর ॥

৯ই মে প্রাতরাশ সেরে নিয়ে সকাল ৭-১৫ মিনিটে ফাটা হ'তে পুনরায় হাঁটা সুরু করেছি রামপুর চটি অভিমুখে। ফাটার কিছু পর থেকেই মাঝে মাঝে গভীর বনের ছায়া। রামপুর পর্যন্ত সেই বন-পথের বিচ্ছিন্ন অংশ। বড় বড় গাছ। পাহাড়ের গায়ে জটলা করে দাঁড়িয়ে গাছের গুঁড়ি ও ডালে ডালে পাক খেয়ে জড়িয়ে উঠেছে সবুজ গুল্মলতা। কোথাওবা দুই পাহাড়ের মাঝে ছোট পাহাড়ী

নদী। জলের কলকল শব্দ। ভিজে পাতা ও মাটির সোঁদা গন্ধ। জায়গাটা স্যাঁতসেঁতে। কখনওবা নাম-না-জানা পাখী শিষ দিয়ে উড়ে যায় অলক্ষ্যে, ডাল পাতায় তার শব্দ ওঠে। যাত্রীদের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ হাঁটতে সুরু করেছি, কারণ এখনও চড়াই আরম্ভ হয়নি। পথিমধ্যে বদলপুর চটি অতিক্রম ক'রে রামপুর এসে গেলুম বেলা ১০-১৫ মিনিটে। ফাটা হতে ৫ মাইল পথ অতিক্রম করে। কুলিরা বিছানাপত্র নিয়ে ত্রিযুগীনারায়ণের পথে এগিয়ে গেল। মধ্যাহ্ন ভোজন ও বিশ্রামের জন্য যে চটিতে আশ্রয় নেওয়া হয় কুলিরা সাধারণতঃ সে চটিতে থামে না। রাত্রিবাসের জন্য নির্দিষ্ট যে চটি তদভিমুখেই যাত্রা করে। অন্যথায় রাত্রিবাসের চটিতে সময়মত যাত্রীদের বিছানাদি পাওয়ার অসুবিধা ঘটতে পারে। রামপুরে স্নানাহার সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ১-৪৫ মিনিটে ত্রিযুগীনারায়ণের পথে হাঁটতে শুরু করলুম। অধিকাংশ যাত্রী প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্বে রওনা হয়ে গেছেন।

তিন

॥ ত্রিযুগীনারায়ণ ॥

ত্রিযুগীনারায়ণ ঠিক কেদারের পথে নয়। রামপুর হতে ১ মাইলের মধ্যে সীতাপুর। সীতাপুর হতে আধ মাইল গেলেই একটি ছোট সেতু। ঐ স্থানটির নাম পাতাগড়। সেখান হতেই একটি পথ পাহাড়ের ওপর দিয়ে চলে গেছে ত্রিযুগীনারায়ণের দিকে। অপরটি পাহাড়ের নীচে দিয়ে সোজা চলে গেছে গৌরীকুণ্ডের দিকে—সোমপ্রয়াগ হয়ে। যাঁরা ত্রিযুগীনারায়ণ না গিয়ে সোজা কেদারনাথ যাত্রা করেন তাঁরা এই পথেই যান। এজন্য ছড়িদাররা পথপ্রদর্শনের জন্য এখানেই পথের বাঁকে উপস্থিত থাকে, যাতে পথ ভুল না হয়। আমরা ত্রিযুগীনারায়ণের পথের যাত্রী। আমাদের ছড়িদার জিৎ সিং এখানেই ত্রিযুগীনারায়ণের যাত্রাপথের নির্দেশ দিয়ে দিল। ত্রিযুগীনারায়ণের পথ ভীষণ চড়াই, বন্ধুর ও দুরারোহ। চড়াই পথের প্রথম কষ্ট এখানেই অনুভব করি এবং সোজা খাড়াই পথে ঘন ঘন শ্বাসকষ্ট হ'তে থাকে। লজেন্স মুখে দিয়ে মাঝে মাঝে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার পথ চলি। অগ্রবর্তী সহযাত্রীরা অনেকেই পিছিয়ে পড়েছেন। এ যেন পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা। একে একে অনেকেই পড়তে সুরু করেছেন। অর্থাৎ দুস্তর চড়াই পথে চলার অক্ষমতার দরুণ কেহ ঘোড়া, কেহ ডাণ্ডী, কেহবা কাণ্ডি আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন এবং যাঁর যেমন সামর্থ তিনি তেমন যানবাহন নিতে আরম্ভ করেছেন। আমরা স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে ১০।১২জন ও কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্মচারীরা ধীরে ধীরে পয়দলে চলেছি। কেহবা বহু কষ্টে। অজিতার পায়ে ইতিমধ্যে ফোস্কা পড়েছে। সে চটি পায়ে লাঠিটি হাতে ক'রে এঁকে-বেঁকে চলেছে। শ্রীমতী ছবি মুখার্জির চলার ধরন ও মুখের ভাব দেখে অনুকম্পা জাগে। দু' মাইলের মধ্যেই চড়াই শেষে শাকম্ভরী

দেবীর মন্দির। এটি প্রদক্ষিণ করে পুনরায় চলা শুরু করে মোট তিন ঘণ্টা হাঁটার পর পৌণে চার মাইল পথ অতিক্রম ক'রে ত্রিযুগীনারায়ণ পৌছলুম বৈকাল ৪-৪৫ মিনিটে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আমরা চারজন ছিলুম একত্রে ক'লকাতা হ'তেই। দু'জন রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সন্ন্যাসী—নির্মল মহারাজ ও প্রদ্যোৎ মহারাজ, সঙ্গে আমি ও সীতেনবাবু। আমরা দু'জন পঞ্চাশোর্ধেও অকৃতদার। সঙ্গে জুটেছিলেন গোয়েঙ্কা কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ। তিনিও দৈবক্রমে অকৃতদার। এই পঞ্চ অকৃতদারের মিলনের ফলে কর্তৃপক্ষ বরাবরই একটি ক'রে পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করেছিলেন আমাদের সুবিধার জন্য। আব অন্য যাত্রীরা হাস্যরসের সৃষ্টি করছিলেন উক্ত ঘরকে "মহাপুরুষদের ঘর" বলে কটাক্ষ করে। এমনকি ছড়িদার জিৎ সিংও সে বিষয়ে অবহিত। আমাদের কোন চটিতে প্রবেশের পূর্বে সংবাদ দিত "আপকো ইস্পিশ্যাল কামরা ঠিক হ্যায়।" ত্রিযুগী-নারায়ণে এসেও জিৎ সিং-এর ভাষায় দোতলায় আমরা একটি 'ইস্পিশ্যাল কামরা' পেয়ে গেলুম। বৈকালিক চা জলখাবার এসে গেল—তার অল্পক্ষণের মধ্যেই এল আমাদের হোল্ড-অল্। তৎপর হয়ে সেগুলি খুলে বিশ্রাম নেবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলুম। এখানে বেশ শীত। ৭০০০´ ফুট উচ্চ সমুদ্রপৃষ্ঠ হ'তে।

যজ্ঞ-পর্বতের উপর ত্রিযুগীনারায়ণ নামে লক্ষ্মীনারায়ণের প্রাচীন মূর্তিটি অষ্টধাতু নির্মিত চতুর্ভুজ। কথিত আছে—হিমালয়ের ক্রোড়ে ত্রিযুগীনারায়ণেই হর-পার্বতীর বিবাহস্থল। পাণ্ডাদের মতে সেই বিবাহের হোমাগ্নি এখনও প্রজ্জ্বলিত, তাই "ত্রিযুগধুনি" নামে খ্যাত। পাণ্ডা আমাদের কপালে সেই ধুনির ভস্ম বিলেপিত করে কিছু দক্ষিণা নিল। মন্দির চত্বরের পূর্বে ব্রহ্মকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড, সরস্বতী ও বিষ্ণুকুণ্ড নামে চারটি কুণ্ড আছে।

এখানে একটি উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদেরই কামরার এক বৃদ্ধা সহযাত্রী পথ ভুলে অন্য পথে চলে যায়। সন্ধ্যা সাড়ে

ছটার মধ্যে তার কোন সন্ধান না পাওয়ায় সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কর্তৃপক্ষের দূরদর্শিতা ও তৎপরতায় মুহূর্ত মধ্যেই কুণ্ডু স্পেশ্যালের অনলস কর্মী হরি ও ছড়িদার জিৎ সিং ছুটল তার সন্ধানে। পরদিন প্রাতে সংবাদ এল যে, হরি তার সন্ধান পেয়েছে গৌরীকুণ্ডের পথে। কুণ্ডু স্পেশ্যালের ২রা মে তারিখের অগ্রগামী যাত্রীদল তখন গৌরীকুণ্ডে রাত্রিবাস করছেন। সেখানেই বৃদ্ধাকে নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা কবা হয়েছিল। আমরাও যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে রাত্রি যাপন করেছিলুম, তার অবসান ঘটল। তারপর হতে বৃদ্ধার নামকরণ হল "হারানো বুড়ি"। পবে জানা গেল বৃদ্ধাটি "ত্রিযুগীনারায়ণ" এই কঠিন নামটি ভুলে গিয়ে কোন পথে গৌরীকুণ্ড যাবে এ কথাই পথিকদের জিজ্ঞাসা করেছিল—তার ফলেই তার এই দুরবস্থা। এইভাবে ত্রিযুগীনারায়ণে রাত্রি যাপন করে পরদিন ১০ই মে সকাল ৭-৪৫ মিনিটে প্রাতরাশ সমাপ্ত করে ত্রিযুগীনারায়ণ হতে উৎরাই পথে নামতে থাকি গৌরীকুণ্ড অভিমুখে। এখান হতে ফেরার পথের অংশ অন্য দিকে। নেমে আসতে হয় কেদারের পথে সোমপ্রয়াগ বা শোনপ্রয়াগে।

॥ গৌরীকুণ্ড ॥

৭-৪৫ মিনিটে ত্রিযুগীনারায়ণ হতে রওনা হয়ে ৬ মাইল উৎরাই পথে সীতাপুর চটি পার হয়ে সোমপ্রয়াগে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে চা খেয়ে পুনরায় যাত্রা হল শুরু গৌরীকুণ্ডের উদ্দেশে। এখান হতে সাড়ে তিন মাইল পথ গৌরীকুণ্ড। উচ্চতা ৬৫০০´ ফুট। সেখানেই মধ্যাহ্ন ভোজন ও বিশ্রামের ব্যবস্থা। সোমপ্রয়াগ—মিলিত সোম-বাসুকি ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। বাসুকিগঙ্গা—বাসুকি-তাল হতে নির্গত হয়ে সোম নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং সেই মিলিত স্রোত মন্দাকিনীতে এসে পড়েছে। তিনদিকের তিনটি পাহাড়কে উন্মত্ত জলধারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে তারই একটি পাহাড়ে সোমপ্রয়াগ অবস্থিত। একটি ঝোলা সেতু সোমবাসুকির

উচ্ছ্বসিত জলধারার উপর দিয়ে তার উভয় তটকে সংযুক্ত করে রেখেছে—আর কেদারনাথে যাবার পথ সেই সেতু অতিক্রম করে ক্রমশ চড়াই-এর দিকে এগিয়ে চলেছে। এই ত্রিধারার মিলন দৃশ্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। দক্ষিণে প্রবাহিত মন্দাকিনী। দুপাশে বনাচ্ছাদিত অঞ্চল। এ পথটি মন্দাকিনী নদীবক্ষ হতে বহু উচ্চে থাকায় বনভূমির অন্তরালে মন্দাকিনী স্পর্শলেশহীন ও অদৃশ্যপ্রায়। পথিমধ্যে এক মাইল দূরত্বের ব্যবধানেই মুণ্ডকাটা গণেশ। কথিত আছে শনিদেবের কোপদৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড এখানে দেহচ্যুত হয়েছিল। যাই হোক, কিছু দর্শনী দিয়ে এগিয়ে পড়লুম। এইভাবে চলতে চলতে বেলা ১১-২০ মিনিটে গৌরীকুণ্ড পৌঁছলুম। এখানে আছে গৌরীদেবীর প্রাচীন মন্দির ও পাশাপাশি দুটি কুণ্ড। একটি কুণ্ডের জল কখন হলদে, কখন স্বচ্ছ দেখায়। অপরটি উষ্ণ জলের, তপ্তকুণ্ড নামে খ্যাত। অগণিত পুণ্যার্থী নরনারী আরামে স্নান করছেন সেই তপ্তকুণ্ডে। জল বেশ উষ্ণ—কুণ্ডমধ্যে স্নান করা প্রথমে বেশ কষ্টকর। ধীরে ধীরে সহ্য করে নিয়ে পরে কুণ্ডে স্নান করা যায়। ঐভাবেই স্নান সেরে নিয়ে বেশ আরামবোধ করলুম। প্রবাদ আছে শিবের ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তাঁর দেহনিঃসৃত স্বেদ হতে এই তপ্তকুণ্ডের উদ্ভব। অনতিদূরেই মন্দাকিনীর তুষার-গলা জলস্রোত। সেখানেই যাত্রীগণ সাবানজলে ময়লা কাপড় প্রভৃতি পরিষ্কার করে নিচ্ছেন। কারণ তপ্তকুণ্ডে এসব কাজ নিষিদ্ধ।

কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থানুযায়ী এখানে যথারীতি মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করে বিশ্রাম নিয়ে ২-৩০ মিনিটে রামওয়াড়া অভিমুখে যাত্রা করলুম। গৌরীকুণ্ড হতে কেদারনাথের চড়াই পথের দুর্গমতা সম্বন্ধে নানা চিত্তচাঞ্চল্যকর কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে ভ্রমণকাহিনীগুলিতে। এজন্য এখান হতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও হাঁটতে অক্ষম অনেক যাত্রীকেই কর্তৃপক্ষ ঘোড়া, ডাণ্ডী, কাণ্ডি প্রভৃতির ব্যবস্থা করে দিলেন।

অধ্যাপক পূর্ণবাবুও কাণ্ডি ভাড়া করলেন। আমরা চারজন রইলুম অবিচল, দৃঢ়চিত্ত, হাঁটার জন্য প্রস্তুত। মহিলাদের মধ্যে রইলেন উত্তরপাড়ার গৌরীবালা মণ্ডল, গ্রাম-সম্পর্কে—ভাগ্নি অজিতা ঘোষ হাজরা, বাগবাজারের শ্রীমতী ছবি·মুখার্জি, দিল্লী হতে আগত শ্রীমতী লীলা দাস, টবিন্ রোডের শ্রীসুরবালা সরকার। গ্রামাঞ্চলের আর একজন মহিলা জননীবালা পুস্তি—এইসব মিলে দশজন। আর কুণ্ডু স্পেশালের ম্যানেজার সৌম্যেনবাবু বাদে (ঘোড়ার যাত্রী) নয়-জন কর্মচারী। তার মধ্যে এ্যাসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার অসিতবাবু। সীতেন-বাবু, নির্মল মহারাজের সঙ্গে ধীরে ধীরে আসছিলেন। মধ্যে মধ্যে পথে তাঁদের সাক্ষাৎ মিলছিল। এখান হতে ক্রমেই চড়াই পথ আরম্ভ। যত উচ্চে ওঠা যায় দৃশ্যও তত অপূর্ব ও উপভোগ্য। পথিমধ্যে বিভিন্ন বিচিত্র ধরনের অজ্ঞাতনামা বৃক্ষ ও পুষ্পাদি দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। রডোডেনড্রন গুচ্ছ, পাঁচ পাপড়ি লতানে গোলাপ গাছ, ফলভারাবনত আখরোট বৃক্ষ, তৈজসপত্র এবং দারুচিনি বৃক্ষও চোখে পড়ে। এই-ভাবে এক মাইল পথ অতিক্রম করে চীরবাসা ভৈরব চটি পাওয়া গেল।—প্রায় ৭৫০০´ ফুট উচ্চ। চীরবাসা ভৈরব অরণ্যময় তপোভূমি। এখানে পূজারী বস্ত্রখণ্ড দানের জন্য কিছু মূল্য ভিক্ষা করলেন। কথিত আছে যে, শিবপুরীর কোতোয়ালরূপে এই ভৈরবই নাকি কেদারক্ষেত্র রক্ষা করছেন। পথিপার্শ্বে ছোট একটি মন্দির। ভৈরবনাথের মূর্তি। এখান হতে আধ মাইল অগ্রসর হয়েই ৮০০০´ ফুট উচ্চে জঙ্গল চটি। দৃশ্যাদি প্রায় একই রূপ। দক্ষিণে প্রবাহিত মন্দাকিনী। কাণ্ডি, ডাণ্ডী, ঘোড়া যাতায়াত করছে অবিরত। এদের পথ ছেড়ে দিতে পাহাড়ের গা ঘেঁসে দাঁড়াতে হচ্ছে। অন্যথায় আকস্মিক বিপদ উপস্থিত হতে পারে পাহাড়ের অন্যপ্রান্তে আশ্রয় নিলে। এটিই এ পথে চলার রীতি। ক্রমাগত চড়াই পথ শুরু হয়েছে। কিন্তু মাঝে মাঝে চটিতে বিশ্রাম ও চা-লজেন্সের সদ্ব্যবহারে তেমন পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত বোধ হচ্ছে না। তাছাড়া পথের দৃশ্যাবলী পথিকের মন ভোলায়।

গৌরীকুণ্ড হতে এইভাবে সাড়ে তিন ঘণ্টা চলার পর বৈকাল ছ'টায় রামওয়াড়া পোঁছলুম। গৌরীকুণ্ড হতে চড়াই-এর প্রথম পর্বের এখানেই সমাপ্তি।

চার

॥ রামওয়াড়া ॥

১০ই মে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ২-২০ মিনিটে গৌরীকুণ্ড হ'তে যাত্রা করে বৈকাল ছটায় রামওয়াড়া পেঁীছলুম—ক্রমাগত পৌণে চার মাইল চড়াই পথ অতিক্রম করে। রামওয়াড়া যাত্রাপথেই তুষারের ওপর প্রথম পদক্ষেপ শুরু হ'ল ৩।৪ মিনিট ক'রে। অর্থাৎ এখন হতেই যেন কেদারনাথ প্রবেশের তুষার-পথ অতিক্রম ও কেদারনাথে তুষার ক্রোড়ে বাসের প্রস্তুতি-পর্ব আরম্ভ। মৃত্তিকার উপরিভাগে এই প্রথম তুষার দর্শনে যুগপৎ মনে বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার হল। ৯০০০´ ফুট উচ্চে—বায়ুর সঙ্গে কন্‌কনে হাড়-কাঁপানো শীত। এখানে প্রয়োজনমত ৫০ পয়সা দিয়ে লেপ ভাড়া পাওয়া যায়। আমাদের সঙ্গী অধ্যাপক পূর্ণবাবু বয়স্ক ব্যক্তি – সঙ্গে সঙ্গে রামওয়াড়া পেঁীছে দু'খানি লেপ ভাড়া করে নিলেন। তিনদিকের পাহাড় অধিকাংশই তুষার-মৌলি, কদাচিৎ পাহাড়ের নগ্নগাত্র দৃষ্ট হয়। পথিমধ্যে বৃহৎ, নাতি-বৃহৎ নির্ঝরিণীর সমারোহ। পার্শ্বস্থ পর্বতগুলির গলিত তুষারে অসংখ্য নির্ঝরিণী সৃষ্টি হয়ে পাহাড়ের সানুদেশে গড়িয়ে পড়ছে। এখানেই আমাদের রাত্রিবাস। পৃথক ঘর মেলে নি। একই ঘরে পরিচিত কয়েকজন মহিলার সঙ্গে রাত্রি কাটিয়েছি আমরা পাঁচ জন—একটি নিভৃত গৃহকোণ খুঁজে নিয়ে। নির্মল মহারাজ, অজিতা এবং আরও কয়েকজন আমার ও প্রদ্যোৎ মহারাজের পূর্বেই রামওয়াড়া পেঁীছে গেছেন। আমাদের বিলম্বের কারণ পথিপার্শ্বস্থ গলিত তুষারের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলা ও অস্তায়মান সৌরকিরণ প্রতিফলিত তুষার-মৌলিগুলির অপরূপ দৃশ্যদর্শন। বরফের টুকরা ভাঙতে প্রদ্যোৎ মহারাজের পথের সম্বল যষ্টিখানির সূঁচল লোহার নালটি গেল খুলে। ছড়িদার জিৎ সিং প্রতিটি ধরমশালার প্রবেশ পথে ৫।৭ মিনিট দূরে ভগ্ন-

দূতের মত অপেক্ষা করে পথ দেখিয়ে ধরমশালায় নিয়ে যাবার জন্য। এটি তার দৈনন্দিন কর্তব্যের মধ্যে। আবার রাত্রি ৪ হতে ৪৷৷-টার মধ্যে উঠে যাত্রা করে একটি ধরমশালা হতে পরবর্তী ধরমশালার সন্ধানে—যে স্থানে আমাদের রাত্রিবাস পূর্ব-নির্দিষ্ট। এভাবেই যথারীতি তার কর্তব্য পালন করে চলেছে ছড়িদার। এমনি আরও দুটি মানুষ চলেছে —কখনও আমাদের সঙ্গে কখনও অগ্রে বা পশ্চাতে। এদের একজন আমাদের নেপালী কুলি জয়দত্ত, অপরজন স্বল্পবয়স্ক পুষ্কর, ওরফে পুষা। কেদারনাথ যাতায়াতের পথে আমাদের যৎসামান্য হাতের মালগুলি বহনের জন্য ২০·০০ টাকা দিয়ে পাঁচ জনে নিযুক্ত করেছি পুষাকে। আমরা চলেছি পকেটে কিছু লজেন্স ও হস্তের যষ্টিটি সম্বল করে। যাতায়াতের পথে পুষা আমাদের সঙ্গে খেয়েছে, আনুসঙ্গিক আরও অনেক-কিছু পেয়েছে—পরিবর্তে ছোট-খাটো অনেক কাজও করেছে। যেমন—জামা, গেঞ্জি সাবানজলে পরিষ্কার করা, যেখানে জলের কল দূরবর্তী অঞ্চলে সেখানে জল আনা, চায়ের কাপ ধোওয়া ইত্যাদি বহু কাজে তার সাহায্য মিলেছে। চায়ের দাম ২০ পয়সা হতে ধীরে ধীরে উচ্চতার তারতম্যে ৩০ পয়সায় উঠেছে।

নেপালী কুলি জয়দত্তকে নিযুক্ত করেছেন কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্তৃপক্ষ তথা সৌম্যেনবাবু গুপ্তকাশী হতে। আমাদের ৪।৫ জনের মাল বহন করছে এই সুবাদে তিনি জয়দত্তের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। রাত্রিযাপনের জন্য কোন নির্দিষ্ট ধরমশালায় পৌঁছেই আমরা উদ্বিগ্ন থাকতুম জয়দত্তের আশাপথ চেয়ে। কারণ শীতপ্রধান দেশে বিছানাপত্রই হ'ল রাত্রিযাপনের প্রথম ও প্রধান সম্বল। সে এসে হাজির হলেই সানন্দে হোল্ড-অল্ খুলতে তৎপর হয়ে পড়তুম সকলে। কখনওবা জয়দত্তই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিছু কিছু বিছানাদি খুলে দিয়ে আমাদেরই কামরার পাশে বসে গল্পগুজব শুরু করে দিত বিশ্রামলাভের অছিলায়। কয়েকদিনের মধ্যে জয়দত্ত আমাদের সুখদুঃখের অংশীদার হয়ে গেছে। আমাদের জন্য চা-বেগুনি,

সিঙ্গারা কিংবা পকৌরী এলে জয়দত্ত বা পুষা যে কেউ উপস্থিত থাকলে তাদেরও কিছুটা অংশ স্বেচ্ছায় দেওয়া হত। কখন কখন জয়দত্ত সিগারেট চেয়ে খেত। জয়দত্তের বয়স ৩০।৩২-এর মধ্যেই—এখনও অবিবাহিত। মুখে চোখে তার একটি যৌবনোচ্ছল দীপ্তি এবং হাসিখুসী মানুষ। স্বাধীন নেপালের বাসিন্দা তাই কথায়-বার্তায়ও একটা স্বাধীন ভাব। গায়ের রং ফর্সা, ঈষৎ রক্তাভ। মুখাবয়ব সুডৌল। বেশ সহজ সরল মানুষ। তাই সকলেই আমরা তাকে ভালবেসেছিলাম কয়েকদিনের সাহচর্যে। অবকাশ পেলেই নানা গল্প শুরু করে দিত দিনের শেষে, আমাদেরই ঘরের পাশটিতে বসে। নেপাল হতে ১৯ দিন হাঁটাপথে এসে তারপর ট্রেণে চড়ে বহু কষ্টে এখানে তাকে মাল বহন করতে আসতে হয়। কুলিগিরি করলেও সৌখীন লোক জয়দত্ত। একদিন সীতেনবাবুকে চুরুট ধরাতে দেখে জয়দত্তেরও চুরুট খেতে সখ গেল এবং সীতেনবাবুর কাছে চুরুটের মূল্য দিয়ে চুরুট কিনতে চাইল। সীতেনবাবুর কিন্তু ঐ একটি চুরুটই সম্বল—দান করেছেন টুরিষ্ট কোচের আমাদের কামরাটির সহযাত্রী মিঃ আর. এন. চ্যাটার্জী। সীতেনবাবু ও আমি উভয়েই জয়দত্তকে একটি চুরুট খাওয়াবার জন্য সচেষ্ট হয়ে মিঃ চ্যাটার্জির কাছ থেকে চুরুট নিয়ে জয়দত্তকে দিলুম পরের দিন। চুরুটটি পেয়ে ভারী খুসী জয়দত্ত। এমনি এক বিশ্রম্ভালাপের মুহূর্তে সে কোথায় একটি পশুশালা (Zoo) দেখে মুগ্ধ হয়েছে তার গল্প জুড়ে দিল। তার কথায় বুঝলুম্ সে যে পশুশালাটি দেখেছে তা আলিপুর পশুশালার তুলনায় নগণ্য। আমরা আলিপুর পশুশালার বিস্তৃত বিবরণ দিতেই জয়দত্ত কলকাতায় পশুশালা দেখতে আসার জন্য মনস্থির করে ফেললে এবং কলকাতার ভাড়া কত, কোন্ পথে যেতে হবে ইত্যাদি প্রশ্ন করতে শুরু করে দিল। কিন্তু বাংলাদেশের নিদারুণ গ্রীষ্মের কথা শুনেই একেবারে তার মন সরলো না কলকাতা আসতে। কারণ এক সময়ে দিল্লী ও মোদীনগরে কাজ করতে গিয়ে তার মুখে খুন চড়েছিল অর্থাৎ

মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল। সেই ভয়ে সে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যেতে নারাজ। অধ্যাপক পূর্ণবাবু বললেন, কেন অনেক নেপালী কুলি তো কলকাতায় কাজ করে। উত্তরে জয়দত্ত বললে: ভারতবর্ষে যেমন গ্রীষ্মপ্রধান, শীতপ্রধান অঞ্চল আছে, নেপালেও আছে তেমনি। সে খুব শীতপ্রধান অঞ্চলের লোক। শীতের দেশ ছাড়া গ্রীষ্মের আবহাওয়া মোটেই তার সহ্য হয় না। এজন্য কেদার-বদরী অঞ্চলেই সে মাল বহন করে। কলকাতায় যারা থাকে তারা নেপালের গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষ। সে বলে চলল, দুদিন পূর্বে খুব পরিশ্রান্ত হয়ে প্রায় ৭৲ টাকা খরচ করেছে সে তার খাদ্যাদি বাবৎ। আর আজ খরচ করেছে ৩৲ টাকা। এক সের দুধ, আটখানি পুরু রুটি ও বেশ কিছুটা চিনি খেয়েছে। যখন খুসী হয় তখন সে কাজু বাদাম, কিস্‌মিস্‌, ঘি, দুধচিনি দিয়ে সুজির সঙ্গে হালুয়া তৈরী করে খায়। কথায় কথায় বলল, এই মাল বহন করে ১৲ টাকা কে. জি. হিসাবে এবারে সে পাবে ৫৭৲ টাকা। অথচ আমাদের কাছে কুণ্ডু স্পেশ্যাল নিচ্ছে ১.৫০ পঃ হিসাবে কে. জি.। এ কথা যখন জয়দত্ত শুনল, তখন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই বলল, আপনারা আমাকে ১৲ টাকা করেই কে. জি. দেবেন, ওদের দেবেন না ১.৫০ পঃ করে কে. জি.। কিংবা আমার সামনে ওদের মালের দাম মেটাবেন। এই কথা বলতে বলতে দুঃখের সঙ্গে জয়দত্ত কপালের কাপড়টা খুলে দেখাল তার মাথার চুল কত উঠে গেছে এই মাল বহন করতে করতে। মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠল, অনুকম্পা জাগল জয়দত্তের প্রতি। সকলেরই চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠল। সত্যই তো আমরা যেখানে খালি হাতে চড়াই উৎরাই করতে হিমশিম খাচ্ছি আর জয়দত্ত কপালে চামড়ার ফিতে বেঁধে চলেছে ৫৭ কে. জি. মাল নিয়ে; তাতেও সে তার ন্যায্য প্রাপ্য হতে বঞ্চিত। মনটাকে হালকা করতে কথার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে জয়দত্তকে প্রশ্ন করলুম,—'এমনি করে কত টাকা রোজগার করবে তুমি'? উত্তরে বলল, ৫০০৲ টাকা সঞ্চিত হলেই দেশে চলে যাবে এবং

এ টাকা শীতের পূর্বেই সে উপায় করবে। অর্থাৎ কার্তিক মাসের পূর্বেই সে এ টাকা সঞ্চয় করতে পারবে বলে আশা রাখে। এই প্রসঙ্গে জয়দত্ত বলতে শুরু করল—একবার এমনি মালের ভাড়া কম দেওয়ায় কেমন করে সব কুলিরা একজোটে তাদের মেটকে (যে কুলি সংগ্রহ করে) বেদম প্রহার দিয়েছিল এবং পুলিশ তদন্তে এলে তাদেরও প্রহার করে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ন্যায্য ভাড়া আদায় করে-ছিল। কথাগুলো বলতে বলতে জয়দত্তের মুখমণ্ডল আরক্তিম ও দেহমন স্ফীত হয়ে উঠল। সত্যই অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইএ যে একটি স্বতস্ফূর্ত আনন্দ আছে—স্বাধীন নেপালের মানুষ জয়দত্তের সেদিনের সে মূর্তি প্রত্যক্ষ না করলে, তা অনুভবে আসত না। যাত্রাপথের সাথী হিসাবে যে কয়টি চরিত্র আমার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে জয়দত্ত তাদের অন্যতম। তার সহজ, সরল, অমায়িক ব্যবহার, স্পষ্টবাদিতা, জীবন-সম্পর্কে স্বাধীনচিন্তা, যথাসম্ভব নিজেকে বঞ্চিত না করে জীবনধারণের উপযোগী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও আহার-বিহারে পরিমিতিবোধ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। অথচ সে নিরক্ষর কুলি মাত্র।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ৯০০০´ ফুট উচ্চে রামওয়াড়ায় কন্‌কনে শীতে রাত্রিযাপন করা গেল। পূর্বেই বলেছি প্রায় প্রতিটি ধরম-শালাতে শৌচাগারগুলি বেশ দূরে দূরে। এখানেও সেই ব্যবস্থা—তারপর গরম জল ছাড়া ব্যবহারের উপায় নাই। সুতরাং মল-মূত্র ত্যাগের কথা চিন্তা করতেই বুদ্ধিভ্রংশ উপস্থিত হয়। যাই হোক, প্রাতঃকালীন চা-জলখাবার খেয়ে ৮-৪৫ মিনিটে কেদারনাথের পথে পা 'বাড়ালুম। পূর্বে বহু ভ্রমণকাহিনীতে পাঠ করেছি রামওয়াড়া হ'তে কেদারনাথ পথের দুস্তর চড়াই-এর কথা, সেই সঙ্গে উপস্থিত হয় শ্বাসকষ্ট। তাই শঙ্কিত চিত্তে, ধীরে, মন্থরে চলেছি সাবধানে। গাছপালা ক্রমেই শেষ হয়ে আসছে। ছোট ছোট ঝোপ-ঝাড়। নানা রঙের ফুলের শোভা। শিলাখণ্ডগুলির বর্ণ-বিন্যাস। মন্দাকিনীর

স্বচ্ছ জলের উচ্ছল ধারা। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গহ্বর। তারই ভিতর দিয়ে কল্ কল্ শব্দে জলের ধারা যাচ্ছে। ১০০০০´ ফুট অতিক্রম করার পর পথিমধ্যে মাঝে মাঝে তুষারস্তূপ দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। কোথাওবা তা কেটে পথ করা হয়েছে। কোথাওবা যাত্রী-সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার্থে ধাপে-ধাপে কেটে কেটে সিঁড়ি প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাকৃতিক লীলাবৈচিত্র্যে বিস্মিত ও মুগ্ধ হ'তে হয়। সত্যই তখন মনে হয় এই অহংসর্বস্ব মানুষের অস্তিত্ব এর তুলনায় কত নগণ্য। লাঠিতে ভর ক'রে চলতে চলতে কোথাওবা লাঠি গেঁথে যায়। কোথাওবা তুষারে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হ'য়ে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এজন্যই এসব স্থানে Goggles ব্যবহারের প্রয়োজন। ক্রমাগত এইভাবে চড়াই পথে চলেছি। অন্য যাত্রীরা কখনওবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কখনওবা ক্ষণিক দাঁড়িয়ে পথ চলছে। পথের সাথী প্রদ্যোৎ মহারাজ। কেদারপুরী প্রবেশের প্রায় দু'মাইল পূর্বে সাক্ষাৎ হল দিল্লী হতে আগত শ্রীমতী লীলা দাসের সঙ্গে। ঋষিকেশ হ'তে তিনি আমাদের সহযাত্রী। আরও দু'মাইল পথ চলা যেন তাঁর পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠেছে। চোখে মুখে করুণ চাহনি। দেখে মনে হ'ল বহু কষ্টেও দেহটিকে টেনে আর যেন নিয়ে যেতে পারছেন না। প্রদ্যোৎ মহারাজ ও আমি তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বললুম, এইত কেদার-নাথ---সামান্য পথ। আশ্বস্ত হয়ে নবোদ্যমে আমাদেরই সঙ্গে পথ চলা শুরু করলেন তিনি। ১১০০০´ ফুটের মাথায় গরুড় চটি।

তারপর এক মাইল তুষারপথ। তুষারপথের প্রারম্ভেই ছড়িদার জিৎ সিং কেমন করে তুষারের উপর লাঠি দিয়ে চলতে হয় তার নির্দেশ দিল। সেই মত তুষারপথ অতিক্রম করতে শুরু করলুম। স্থানটি প্রায় সমতল, তারই উপর জমাট তুষারের পথ। চলা খুব শক্ত নয়, তবে সময় লাগে চলতে। কারণ ঐ একই পথে কেদারনাথের যাত্রীরা দর্শনান্তে প্রত্যাবর্তন করছেন দলে দলে, কেহ পদব্রজে, কেহ ডাণ্ডী এবং কেহবা কাণ্ডিতে। মুখে তৃপ্তির হাসি। প্রত্যেককেই পথ

ছেড়ে দিয়ে পথিপার্শ্বে অপেক্ষা করতে হচ্ছে তাদের পথ অতিক্রমণের সময় পর্যন্ত। কারণ নির্দিষ্ট তুষারপথের বাইরে গেলে বিপদ আছে। অনতিদূরে তুষারের অভ্যন্তরপথে বয়ে চলেছে খরস্রোতা মন্দাকিনী। চতুর্দিক হতে হুড়্ হুড়্ শব্দে বরফগলা জল নির্গত হয়ে মিলিত হচ্ছে সেই স্রোতের সঙ্গে। এমনি করে ধীরে মন্থরে চলতে চলতে কেদার-নাথে পৌঁছলুম বেলা ১১-৪৫ মিনিটে।

পাঁচ

॥ কেদারনাথ ॥

হঠাৎ যেন স্তব্ধ পাহাড় ওঠে চমকে। শ্রান্ত ক্লান্ত যাত্রীর মুখে ফোটে হাসি। নবোদ্যমে সবাই এগিয়ে চলে। কে যেন অলক্ষ্যে সস্নেহে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যায়। সুনীল আকাশে স্বর্গের সুষমা ওঠে ফুটে। দেব-দেখনি এসে পৌঁছায়। চড়াই-উৎরাইএর পালা শেষ। সম্মুখে আকাশ-ছোঁয়া বিশাল তুষার-শিখর কেদারের গিরি-শ্রেণী। চারিপাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বরফের চূড়া। চূড়ায় চূড়ায় সৌরকিরণ। সে দ্যুতিতে শৃঙ্গগুলি রজত-শুভ্র রূপ ধারণ করেছে। মন্দাকিনীর ওপর ছোট পুল আর সারি সারি বাড়ী পেরিয়ে পথের শেষ প্রান্তে কেদারনাথের মন্দির।

৭ই মে সকাল ৫-৪৫ মিনিটে ঋষিকেশ হতে (1st. gate) প্রথম কিস্তির বাসযোগে রওনা হ'য়ে ১১৫ মাইল পথ অতিক্রম করে গুপ্ত-কাশীতে রাত্রিবাস করি। পরদিন ৮ই মে বেলা ১১-৪৫ মিনিটে গুপ্তকাশী হতে "পয়দলমার্গে" যাত্রা করে ১১ই মে তারিখে বেলা ১১-৪৫ মিনিটে কেদারনাথ ধামে পৌঁছি। সঙ্গে সঙ্গে বরফ পায়ে (ধুলো পায়ে নয়) ১২টার মধ্যে কেদারনাথজীকে প্রথম দর্শন করে "নেপালী ভবনে" আমাদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষটিতে বিশ্রাম নিতে আরম্ভ করি। রামওয়াড়া হতে কেদারনাথের দূরত্ব সওয়া তিন মাইল। পাণ্ডা পণ্ডিত মহাদেওপ্রসাদ আমাদের আগমনের পূর্বসূচী সংবাদ নিয়ে সত্বর চারখানি পুরু কাশ্মীরী গালিচায় মেঝেটি আচ্ছাদিত ক'রে তার উপর একখানি করে লেপ দিয়ে তাঁর যথারীতি কর্তব্য সমাধা করে গেলেন। যতদূর স্মরণে আছে, একমাত্র কেদারেই স্নান করা হয় নি—শীতের প্রকোপে সে প্রশ্ন মনেও জাগে নি। ১৷৷৹টার মধ্যে গরম খিচুড়ী, তৎসহ ঘি, পাঁপড় ভাজা ও বেগুনি দিয়ে উদর

পূর্তি করে সেদিন কি পরিতৃপ্তই যে হয়েছিলুম তা ভাষায় প্রকাশের নয়। তারপর স্ত্রী-পুরুষ সকল যাত্রী মিলে নেপালী ভবনের পার্শ্বস্থ প্রাচীরে, কড়া-মিঠে রৌদ্রে পিঠ দিয়ে আরামে বিশ্রাম করতে শুরু করলুম। সকলেরই চোখে-মুখে একটি তৃপ্তির হাসি। বিশেষ করে হাঁটা-পথের যাত্রীরা অন্তরে একটি পরম প্রশান্তি উপভোগ করছেন তাঁদের দুশ্চর তপস্যার ফলশ্রুতিতে, কেদারনাথজীর অবাধ দর্শনে কৃতকৃতার্থ হয়ে। 'পয়দল মার্গের' যাত্রীদের এখন হিসাব-নিকাশের পালা এসেছে—কেদারনাথে পৌঁছে। জুতা পরার অনভ্যাসের ফলে কারো পায়ে পড়েছে ফোস্কা, শীতের প্রকোপে কারো গলার স্বর গেছে বসে। কারো ঠোঁট ফেটে পড়ছে রক্ত, কারো বা জ্বরভাব, অতিরিক্ত শীতে কারো বেড়েছে বাতের ব্যথা—এসব সত্ত্বেও কেদার-নাথজীর চরণে যে প্রণতি জানাতে পেরেছি সকলে এই আনন্দের শিহরণ দেহের শিরায় শিরায়। অজিতা তার ক্ষীণ দেহ নিয়ে হাসি-মুখেই অতিক্রম করেছে এই দুরারোহ বন্ধুর পথ (তুষার পথ ব্যতীত) সর্বত্রই পায়ে চটি পরে। দিল্লীর শ্রীমতী লীলা দাস সব পথটাই অতিক্রম ক'রে শেষের দু'মাইল পথ বহু কষ্টেই অতিক্রম করেছেন। শ্রীমতী ছবি মুখার্জির চড়াই পথের কথা অনেকেরই চিত্তে অনুকম্পার উদ্রেক করেছিল। মহিলা যাত্রীদের মধ্যে হাসিমুখে হেঁটেছেন ষষ্টি বৎসর বয়স্কা উত্তরপাড়ার শ্রীগৌরীবালা মণ্ডল—পথের মাঝেই হাসি-তামাসার মাধ্যমে চলেছে তাঁর হাঁটা। আমার নামকরণ করেছিলেন "দেখন হাসি"। পুরুষদের মধ্যে কেবল ষষ্টি-বর্ষ বয়স্ক নির্মল মহারাজের বিশেষ শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়েছিল কেদাঁরের পথে চড়াই-এ। এজন্য তাঁকে কোরামিন দেবার ব্যবস্থা করতে হয়। সঙ্গে ছিলেন তাঁর একান্ত সঙ্গী সীতেনবাবু। বরাহ-নগরের টবিন্ রোডের শ্রীসুরবালা সরকার নিদারুণ বাতের ব্যথা সত্ত্বেও কেদারনাথে এসে তাঁর দর্শনলাভে হয়েছেন ধন্য। সমবয়সী অন্য একজন গ্রামাঞ্চলের মহিলা জননীবালা পুস্তী। তিনিও

পৌঁছেছেন কেদারনাথে। মোটকথা, হাঁটাপথের মহিলা ও পুরুষ যাত্রী মিলে ১০ জনেই কেহবা একটু কষ্টে, কেহবা হাসিমুখে এসে পৌঁছে গেছি কেদারনাথজীর মন্দিরে বেলা ১২টার পূর্বেই। ঘোড়া, ডাণ্ডী ও কাণ্ডিতে যাঁরা আসছিলেন তাঁরাও সকলে এসে পৌঁছে গেছেন।

মন্দাকিনীর বামতীরে হিমালয়ের উপত্যকায় অবস্থিত এই কেদারপুরী। দক্ষিণের কিছু অংশ ব্যতীত চতুর্দিকেই গগনচুম্বী তুষার-ধবল শৃঙ্গরাজিপরিবৃত কেদারপুরী সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১১৭৬০´ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ঊর্ধ্বে, নিম্নে ভূপৃষ্ঠে, সর্বত্রই তুষার। মন্দিরের পার্শ্ববর্তী ছাদগুলি প্রায় দেড় হস্ত পরিমিত তুষারে আচ্ছন্ন। সেই জমা বরফের স্তূপ হতে জল ঝরছে বিন্দু বিন্দু। মন্দির-প্রাঙ্গণ ব্যতীত প্রবেশপথের সর্বত্রই তুষারময়। এখনও তুষার কেটে মন্দির প্রবেশের পথ নির্মিত হচ্ছে। এ এক অভিনব দৃশ্য। সমতলবাসী গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষের মনে বিস্ময় জাগে। এ দৃশ্য দেখেই অনুমান করা যায় লণ্ডন ও আমেরিকার কথা। পশু-পক্ষী ও বৃক্ষলতাদিশূন্য এই কেদার-ধাম—ক্বচিৎ দৃষ্ট হয় এখানে দু' একটি পার্বত্য সারমেয়। তুষারের উপরেই অস্থায়ী ব্যবস্থা মলমূত্র ত্যাগের জন্য। দূরত্বের ব্যবধান হেতু ও তুষারপথ অতিক্রমের ভয়ে শৌচাগার থাকা সত্ত্বেও সেখানে যেতে অনেকেই অনিচ্ছুক। কেদারনাথ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। অন্যান্য শিবমন্দিরের মত কোন লিঙ্গ নাই এখানে। তৎপরিবর্তে আছে ৪।৫ ফুট উচ্চ বেশ দৈর্ঘ্য-প্রস্থযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ড। তুষারের পট-ভূমিকায় কারুকার্যময় প্রস্তরনির্মিত সুরম্য এক দেব-দেউল। সুবর্ণ-ময় তার শীর্ষদেশ। যেন হিমগিরির একান্তে সৌম্যকান্তি এক তপস্বী কোন অনাদিকাল হতে ধ্যানাসনে স্তব্ধ ও নিশ্চল। দু' পাশে সারি সারি দোকান। মন্দিরটির তিনটি অংশ—দক্ষিণ মুখে দরজা। মন্দির দ্বারে কেদারনাথের বৃষভবাহন নাদেশ্বর। মূল দরজায় গণেশের মূর্তি। প্রথম খণ্ডে চতুর্দিকে পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী, কুন্তী ও প্রমথ-

গণের মূর্তি, বামে নারায়ণ এবং মধ্যস্থলে পিত্তল নির্মিত নন্দীর মূর্তি। মধ্যাংশে দরজার দক্ষিণ পার্শ্বে পার্বতী ও বামে লক্ষ্মী। ভিতরে গর্ভ-মন্দিরে শ্রীশ্রীকেদারনাথ বিরাজমান। পুরাণে উল্লেখ আছে যে, যখন পাণ্ডবেরা রাজ্যপাট ছেড়ে কেদারনাথ দর্শনে যাত্রা করেন তখন মহাদেব পাণ্ডবদের গোত্রহত্যাদোষে দোষী জেনে শিলাময় মহিষরূপ ধারণ ক'রে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে উদ্যত হন। যখন শিলাময় মহিষের অগ্রভাগ পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে তখন পবননন্দন ভীম বায়ুবেগে সেখানে ছুটে তার পশ্চাদ্ভাগ স্পর্শ করে ফেলেন এবং পাণ্ডবেরা মহাদেবের তপে মগ্ন হন। তখন হ'তে দেবাদিদেব এখানেই শিলারূপে বিরাজমান। মূর্তিটি শিলাময় মহিষের পশ্চাদ্ভাগ। অগ্রভাগ শিলা যা পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল তা নেপালে আত্মপ্রকাশ করে পশুপতিনাথ নামে খ্যাত হয়েছে। নাভি মধ্যমহেশ্বরে (উখিমঠ হতে ১৩ মাইল দূরে) বাহু তুঙ্গনাথে, মুখ রুদ্রনাথে (মণ্ডলচটি হতে ১১ মাইল দূরে) এবং জটা কল্পেশ্বরে (ধ্যানবদরীর ১ মাইল দূরে) প্রকাশ পেয়েছে এবং এই চারিটি স্থান কেদারখণ্ডেরই অন্তর্গত। এজন্য কেদারনাথ সহ এই চারিটি স্থানকে পঞ্চকেদার বলে। মধ্যাহ্নে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বৈকালে কেদারপুরীর উত্তরে আদি শঙ্করের সমাধি মন্দির ও ফলাহারী বাবাকে দর্শনের জন্য তুষার অতিক্রম করে সকলে যাত্রা করলুম। এই সমাধিস্থল মন্দাকিনী, সরস্বতী-গঙ্গা, ক্ষীর-গঙ্গা, মহোদধি ও স্বর্গদ্বারী গঙ্গা—এই পঞ্চগঙ্গার সন্নিকটে। এ ছাড়া ভৈরবঝম্প বলে কেদারপুরীর অনতিদূরে একটি গিরিশৃঙ্গ আছে। আর আছে বাসুকীতাল বলে তুষার হ্রদ—সেখান থেকেই মন্দাকিনী নদীর উদ্ভব—নীলকণ্ঠ পর্বতের পাদদেশ থেকে বিস্তৃত। পথ তুষারাবৃত বলে ছড়িদার জিৎ সিং এ দুটি স্থানে যেতে সম্মত হল না। সুতরাং আমরা আদি শঙ্করের সমাধি মন্দির হয়ে ফলাহারী বাবার দর্শনে যাই। বৃদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ সাধু। কেদারনাথ তীর্থ ক্ষেত্রের এক অঙ্গ।

বারো মাস থাকেন কেদারেই। মন্দির পার্শ্বস্থ একখানি কুটিরে। ধুনির জ্বলন্ত অগ্নি সম্মুখে আসীন। গায়ে একটা কম্বল জড়ানো। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ। স্নিগ্ধ, সজাগ দৃষ্টি। প্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে এলুম সন্ধ্যার প্রাক্কালে ধরমশালায়। হিন্দী ভাষায় অনভিজ্ঞতার জন্য কোন বাক্যালাপ হয়নি তাঁর সঙ্গে। কেদারনাথজীর আরাত্রিক আরম্ভ হয় সন্ধ্যা ৭-৩০মিনিটে। আমরা তার কিছু পূর্বেই আরাত্রিক দর্শনাভিপ্রায়ে মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হলুম। শিলাখণ্ডেরই আরাত্রিক। পূজারী অরূপের রূপসজ্জা সজ্জিত করেছেন। বসনভূষণ পুষ্পমাল্যে শোভিত। ধূপদীপ প্রজ্জ্বলিত। কাঁসর ঘণ্টা শিঙা বাজে সেই সঙ্গে ব্যোম্ ব্যোম্ ধ্বনি একটি গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে। ভক্তেরা নিবিষ্ট চিত্তে দর্শন করছেন আরাত্রিক। তবে কেদারনাথজীর আরাত্রিক ও কাশীর বিশ্বনাথজীর আরাত্রিকে বিশেষ প্রভেদ আছে। এখানে আরাত্রিকের সময়েও দলে দলে দর্শনার্থী সম্মুখের একটি উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হয়ে কেদারনাথ-জীকে দর্শন করতে থাকেন। অর্থাৎ আরাত্রিক ও উক্ত দর্শন যুগপৎ চলতে থাকায় পশ্চাদ্বর্তী জনসাধারণের অবাধ আরতি দর্শনে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। যাই হোক, এইভাবেই আরাত্রিক দর্শন করে রাত্রি ৮টার মধ্যে ফিরে এলুম নেপালী ভবনের আস্তানায়। এখানে কয়েক মিনিট চলাফেরা করলেই শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। বিশেষ করে সূর্যাস্তের পর অক্সিজেন অভাবে এটুকু বেশ অনুভূত হতে থাকে। প্রদ্যোৎ মহারাজ অনেক সময় উঠে বসে এখানে রাত্রি যাপন করেছেন।

সেদিন (১১ই মে) ছিল শুক্লা চতুর্দশীর স্বচ্ছ আকাশ। নিস্তব্ধ রজনী। গভীর রাত্রে নিদ্রাভঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়ালুম। কেদারপুরীর অপরূপ রূপ দেখে মুগ্ধ হলুম। পূর্ণচন্দ্রের রজত-শুভ্র কিরণপাতে অগণিত তুষার-শৃঙ্গ ও তুষারাচ্ছন্ন ভূপৃষ্ঠ যে একটি শুভ্র জ্যোতিস্নাত অখণ্ড রূপ ধারণ করেছিলো তদ্দৃষ্টে মনে হল কেদারনাথের স্বরূপটি

যেন বিশ্বাত্মক সত্তারূপে দ্যুলোকে ভূলোকে পরিব্যাপ্ত। এইভাবে কেদারে এক রাত্রি কাটিয়ে পরদিন ১২ই মে আমাদের পাণ্ডা পণ্ডিত মহাদেওপ্রসাদ শর্মার সঙ্গে বেলা ৯টায় ধরমশালা হতে যাত্রা করলুম। প্রায় ১৷৷০ ঘণ্টার মত অপেক্ষা করে ১০৷৷০টায় মন্দিরের অভ্যন্তর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ ক'রে এই শিলাময় মহাদেবের পূজান্তে তাঁর সর্বাঙ্গে ঘৃত মার্জন করে ও অন্তরের সঙ্গে গাঢ় আলিঙ্গন করে একটি পরমা প্রশান্তি অনুভব করলুম। প্রস্তরনির্মিত মন্দিরাভ্যন্তরে একটি সুবৃহৎ ঘৃত-দীপ জ্বলছিল। মন্দিরাভ্যন্তরভাগ স্বল্পালোকিত—ধূপধুনা ও পুষ্পচন্দনাদিব সুগন্ধে মন্দিরপ্রকোষ্ঠ আমোদিত। দিগন্তব্যাপী সুনীল আকাশ—চতুর্দিকে গগনচুম্বী গিরিশ্রেণী—তুষার-মণ্ডিত শৈলশৃঙ্গ—মন্দাকিনীর ধারা—আর কেদার মন্দিরের ধূপধুনার ধূমায়িত কুণ্ডলী—এ সবের সম্মিলিত আকর্ষণ—যেন এক পরম রহস্যময়—দেশকাল অতীত অনুভূতির স্পর্শ জাগায়। এখানে রয়েছে পঞ্চকুণ্ড—মন্দির পরিক্রমাকালে পার্শ্বেই হংসকুণ্ড, মন্দিরের পশ্চাতে অমৃতকুণ্ড, অনতিদূরে রেতঃকুণ্ড, ঈশান কোণে ঈশানকুণ্ড। পরিক্রমার শেষ দিকে উদককুণ্ড। রেতঃকুণ্ডের বৈশিষ্ট্য হল জলাধারের পাশে দাঁড়িয়ে চীৎকার করলে বা হাততালি দিলে জলে বুদ্বুদ ওঠে। এই কুণ্ডগুলি বেলা দশটার পর খোলা হয়। সর্বত্রই একজন পাণ্ডা আছেন। গাত্রে কুণ্ডবারি সিঞ্চন করে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রার্থনা করেন। কেদারপুরীর অন্তর্গত এইসব দর্শনীয় বস্তুগুলি দর্শন করে কেদারনাথজীর পূজান্তে আশীর্বাদ ও প্রসাদ গ্রহণ করে আমাদের পাণ্ডার বাড়ী হয়ে ধরমশালায় প্রত্যাবর্তন করি ১১-৩০ মিনিটে। তখন অনেকেই রওনা হয়ে গেছেন গৌরীকুণ্ডের পথে। জয়দত্ত আমাদের মালপত্র নিয়ে পূর্বেই রওনা হয়ে গেছে। আমরা ত্রস্তভাবে কয়েকখানি শুষ্ক পরোটা চিবিয়ে ১০ মিনিটের মধ্যে (১১-৪০ মিঃ) বেরিয়ে পড়লুম—প্রত্যাবর্তনের পথে গৌরীকুণ্ড অভিমুখে। আমাদের সাথের কুলি পুষা ততক্ষণে অধীর হয়ে উঠেছে

রওনা হবার জন্য। সঙ্গে জুটিয়েছে তাব একটি ৭।৮ বৎসরের ছোট ভাইকে—কেদারনাথে কোন এক দোকানে চাকরী করতে পাঠিয়েছিল। পুষার ভার লাঘবের জন্য সেও কিছু মাল বহন করেছিল আমাদেরই। "জয় কেদারনাথজী" বলে উদ্দেশে শেষ প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে পড়লুম উৎরাই পথে।

॥ ছয় ॥

॥ বদরীনারায়ণ ॥

চড়াই পথে চলা যেমন শক্ত উৎরাইতেও আছে কষ্ট। কারণ উৎরাই পথে ইচ্ছামত চলার গতিবেগ সংহৃত করা যায় না। স্বতঃস্ফূর্ত গতিবেগে নেমে যেতে হয় যা সব সময় স্বস্তিকর মনে হয় না। তবু বলা যেতে পারে, চড়াই অপেক্ষা উৎরাই পথই সহজ। কারণ, চড়াই পথে যেখানে চলার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১ মাইল হতে ১¼ মাইল, উৎরাইতে হয়েছে সেখানে ১½—২ মাইল।

১২ই মে বেলা ১১-৪০ মিনিটে কেদারনাথজীকে প্রণাম জানিয়ে উৎরাই পথে যাত্রা শুরু হল গৌরীকুণ্ড অভিমুখে। সাত মাইল উৎবাই অতিক্রম করে ৫০০০´ ফুটেরও অধিক পথ অবতরণ করে বৈকাল ৪টায় গৌরীকুণ্ড প্রত্যাবর্তন করলুম। বৈকালে এসে স্বল্পক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তপ্তকুণ্ডের জলে স্নান সেরে নিলুম। তারপর যথারীতি চা-জলখাবার খেয়ে হোল্ড-অল্ খুলে সকলে বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলুম। এখানেই আমাদের রাত্রিবাস। স্বচ্ছন্দে রাত্রি যাপন করে সকালে প্রাতঃকালীন চা-জলখাবার খেয়ে চলা শুরু হল ৭টায়। আমরা চারজন তপ্তকুণ্ডে স্নানাদি সেরে ১ ঘণ্টা পরে অর্থাৎ বেলা ৮টায় রওনা হলুম গৌরীকুণ্ড হতে রামপুর চটির দিকে। কেদারনাথ যাত্রাকালে এখানে যে পথটি উৎরাই ছিল ফেরার পথে এখন তা কঠিন চড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইভাবে বেলা প্রায় ১০টায় সোমপ্রয়াগে পৌঁছলুম। এখানে ৬৲ টাকা কে. জি. হিসাবে ২০০ শত গ্রাম খোয়াক্ষীর ক্রয় করে প্রত্যোৎ মহারাজ ও আমি জলযোগ সেরে নিলুম—সাথের কুলি পুষা ও তার ভাইকে কিছু অংশ দিয়ে। পুষার ভাইটি সেই ক্ষীরটুকু গলাধকরণ করতে করতে মাঝে মাঝে আমাদের দিকে আড়চোখে চেয়ে পরম তৃপ্তির এমন একটি হাসি

হাসছিল যে দৃশ্যটি যাত্রাপথের ঘটনার অবিস্মরণীয় স্মৃতিরূপে মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত হয়ে আছে। কারণ, অনাস্বাদিতপূর্ব কোন সুরুচিকর খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের পরিতৃপ্তিতে মানুষের মুখাবয়বের যে পরিবর্তন সূচিত হয় ক্ষীর খাওয়ার অবকাশে পুষার ভাই-এর মুখমণ্ডলের সেইরূপ একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করে ব্যক্তিগতভাবে আমিও সেদিন সোমপ্রয়াগের চটিতে যে পরম তৃপ্তি লাভ করেছিলাম তা প্রকাশের ভাষা নাই। বিশ্রামেব অছিলায় প্রায় ২০।২৫ মিনিট সময় অতিবাহিত কবে সোমবাসুকি ও মন্দাকিনীর মিলনানন্দের দৃশ্য উপভোগ ক'রে মাঝে মাঝে আখরোট ও গৌরীফলের গাছ দেখতে দেখতে সীতাপুর চটি পাব হয়ে ৫ মাইল পথ অতিক্রম করে রামপুরে এসে পৌঁছলুম বেলা ১২-৩০ মিনিটে। সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজনাদি সমাপ্ত কবে ফাটা চটি অভিমুখে রওনা হয়ে গেলুম বেলা ১-৪৫ মিনিটে। পথিমধ্যে মৈখণ্ডা, ভেতা ও নলাশ্রম চটি অতিক্রম করে ৪-৩০ মিনিটে ফাটায় এসে উপস্থিত হলুম। ফাটাতেই রাত্রি যাপন। নৈশ ভোজন শেষ করে ফাটাতে রাত্রি কাটিয়ে ১৪ই মে সকাল ৭-৪০ মিনিটে ফাটা হতে গুপ্তকাশীর দিকে রওনা হলুম এবং ১২-৩০ মিনিটে গুপ্তকাশী পৌঁছলুম। ফাটা হতে 'মোটর মার্গ' বরাবর গুপ্তকাশীর পথ সহজ হলেও বেশ যন্ত্রণা অনুভব করেছিলুম হাঁটুর নীচের মাংসপেশীতে (পায়ের ডিমে) এবং দুটি জংঘার উপরি-ভাগের শিরাগুলিতে। এইভাবে সীতেনবাবু, প্রদ্যোৎ মহারাজ ও আমি বরাবর পয়দলে এলুম ফাটা হতে। কখন অগ্রে কখন পশ্চাতে অজিতা ও শ্রীমতী মুখার্জি। অধ্যাপক ঘোষ ও নির্মল মহারাজ প্রায় ৪ মাইল পথ পি. ডব্লিউ. ডি.-র একখানি মালবাহী ট্রাকে উঠে কিছু দক্ষিণা দিয়ে গুপ্তকাশীর ১ মাইল দূরে অবতরণ করলেন। যাই হোক, আমরা সকলে ১২ই মে ১১-৪০ মিনিটে কেদারনাথ হ'তে রওনা হয়ে গৌরীকুণ্ড ও ফাটাতে রাত্রি যাপন করে ২৪ মাইল পথ অতিক্রম করে ১৪ই মে বেলা ১২-১৫ মিনিটে গুপ্তকাশী পৌঁছি। এখানেই

আমাদের হাঁটা পথের বিরতি। গুপ্তকাশী এসে ধরমশালায় রাত্রে বিশ্রাম নিয়ে ও একটি সারিডন ট্যাবলেট্ খেয়ে সকালে বেশ সুস্থ বোধ করলুম। মণিকর্ণিকা কুণ্ডে স্নান সেরে যথারীতি মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ১১টার বাসযোগে গুপ্তকাশী হতে বদরীনারায়ণের পথে যাত্রা শুরু হ'ল। এখানেই নেপালী কুলি জয়দত্ত ও সাথের কুলি পুষার বিদায়ের পালা। জয়দত্তের একখানি কাপড়ের চাহিদা—তার সখ সে কাপড় পরবে। পুরাতন একখানি কাপড় ও কয়েক টাকা বখশিস্ দিয়ে জয়দত্তকে খুসী করা হ'ল। তার ইচ্ছা সে বদরীনারায়ণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে মাল বহন করতে যায়—কিন্তু সে ব্যবস্থা আমাদের হাতে নয়, কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্তৃপক্ষের। সান্ধ্য অবকাশে গুপ্তকাশীর বাজারে ঘুরছিলাম হঠাৎ জয়দত্তের সঙ্গে দেখা। সে আগ্রহভরে তার রাত্রের আহার্য রুটি তৈরী হচ্ছে যেখানে সে স্থানটি দেখাতে নিয়ে গেল। ধীরে ধীরে জয়দত্তের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র হ'ল ছিন্ন। পুষাও আজ ফিরে যাবে তার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে তাদের দেহাতি বাড়ীতে। তাকেও বিদায় দিলাম সকলে মিলে ৬৲ টাকা বখশিস্ দিয়ে। সেও খুব খুশী। যাবার পূর্বে সে হাতযোড় করে ক্ষমা চাইল তার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ কিছু হয়ে থাকলে তার জন্য। জয়দত্ত ও পুষা এরা পথের সাথী, পথেই বিদায় নিয়ে গেল—মালবাহী কুলি, মাত্র কয়েকটি দিনের পরিচয়। তবু কেন অবকাশ মুহূর্তে এদের জন্য মনের নিভৃত কোণে একটি অস্বস্তিকর বেদনা অনুভূত হয়? আপাতঃ-দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষের সত্ত্বা পৃথক বলে বোধ হ'লেও প্রতিটি মানুষ আসলে আত্মিক সত্ত্বার দিক হ'তে এক এবং অখণ্ড। সেখানে ধনী, নির্ধন, মুচি, মেথর, কুলি, উচ্চ নীচ কোন ভেদ নাই। যাঁদের চেতনা যত সূক্ষ্ম, সত্ত্বার দিক হ'তে অপরের সহিত তাঁদের একত্বানুভূতিও তত গভীর। সাধক, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক ও দার্শনিক এমনি একটি সহজাত সূক্ষ্ম চেতনার অধিকারী। তাই অপর সকলের অপেক্ষা তাঁরা অধিক পরিমাণে মানবপ্রেমিক ও মানবদরদী।

॥ রুদ্রপ্রয়াগ ॥

গুপ্তকাশী হতে বাসযোগে ১১টায় রওনা হয়ে পথিমধ্যে কুণ্ড চটি, নারায়ণ চটি, ভেরী চটি, চন্দ্রাপুরী ও শৌরী চটি পার হয়ে অগস্ত্যমুনি এসে পৌঁছলুম এবং সেখান হতে রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছে যে 'মোটর মার্গ'টি অলকানন্দার ধারে ধারে গেছে সেই রাস্তা ধরে বদরী-নারায়ণের পথে এগিয়ে চলল আমাদের বাসখানি। গুপ্তকাশী হতে রুদ্রপ্রয়াগের দূরত্ব ২৪ মাইল।

॥ কর্ণপ্রয়াগ ॥

রুদ্রপ্রয়াগ হতে ২১ মাইলের মধ্যেই কর্ণপ্রয়াগ। পথিমধ্যে ১৪ মাইল এসে গৌচরে বাসটি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। গৌচর একটি উপত্যকা। চারিদিকে পর্বত। মধ্যে বিস্তৃত ময়দান সবুজ ঘাসে ভরা। কথিত আছে নন্দরাজার গোচারণ ভূমি ছিল এটি। পিণ্ডরগঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থল এই কর্ণপ্রয়াগ। স্থানটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ২৬০০' ফুট উচ্চে অবস্থিত। এখানে দ্বাপর যুগে মহারাজা কর্ণ এই সঙ্গমস্থলের নিকটস্থ উমা দেবীর আশ্রয় নিয়ে মহান্ যজ্ঞ করেছিলেন এবং আধ মাইল ঘুর পথে সঙ্গমের ওপরেই একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ডে উপবিষ্ট হয়ে সূর্যের তপস্যা ক'রে তাঁর দর্শন ও বরলাভ করেছিলেন। এখানেই ছিল কর্ণের রাজপ্রাসাদ। এখন উক্ত প্রস্তরখণ্ডের উপর নির্মিত হয়েছে মন্দির। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের মর্মর মূর্তি রয়েছে সেখানে। আশেপাশে পাথরের উপর আছে কয়েকটি কুণ্ড—কর্ণকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড প্রভৃতি। তাই স্থানটির নাম কর্ণপ্রয়াগ। স্বচ্ছ অলকানন্দার সহিত পলিমিশ্রিত পিণ্ডর নদীর সঙ্গম সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। এখানে বাজার, স্কুল, ডাকঘর, হাসপাতাল সবই নদীর তীরে। সঙ্গমের উপরে উমা দেবীর মন্দির আছে।

॥ নন্দপ্রয়াগ ॥

কর্ণপ্রয়াগ হতে ১৩ মাইল অতিক্রম-পথে নন্দপ্রয়াগ। নন্দাকিনী ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থল। উচ্চতা ৩০০০´ ফুট, এখানে মহারাজা নন্দ যজ্ঞ করেছিলেন, এজন্য স্থানটির নাম নন্দপ্রয়াগ। এঁর অপর নাম মহাপদ্ম এবং ইনিই নন্দবংশ স্থাপন করেন। এখানেই চণ্ডিকা দেবী, যশোদা, কৃষ্ণ, বলরাম ও লক্ষ্মীর মন্দির আছে। মহর্ষি কণ্ব (শকুন্তলার পালক পিতা) এখানে তপস্যা করেছিলেন বলে এর অপব নাম কণ্বাশ্রম। কথিত আছে এখানেই কণ্বের পালিতা কন্যা শকুন্তলাকে দুষ্মন্ত গান্ধর্বমতে বিবাহ করেন। এই নন্দপ্রয়াগ পর্যন্তই বদরীক্ষেত্রের স্থূল পরিধি। আমাদেব ৪টি প্রয়াগ দর্শন হল। বাকী রইল কেবল বিষ্ণুপ্রয়াগ।

॥ চামোলি ॥

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কর্ণপ্রয়াগ ও নন্দপ্রয়াগ হ'য়ে অলকানন্দার তীর ধবে আমাদের বাসখানি চামোলি এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। এই অবকাশে অনেকেই এখানে অবতরণ করলেন। দীর্ঘ সময় অন্য কোথাও অবতরণের সুযোগ ছিল না। চামোলি পূতসলিলা অলকানন্দার তীরে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৩১৫০´ ফুট উচ্চে অবস্থিত এবং নন্দপ্রয়োগ হতে ৭ মাইল পথ। স্থানটির গুরুত্ব আছে। এখানে ডেপুটি কলেক্টরের কোর্ট, তহশিল, আদালত, বন-বিভাগের দপ্তর, পুলিশথানা, স্কুল, হাসপাতাল, ডাক ও তারঘর, ডাকবাংলো, সদাব্রত ইত্যাদি আছে। বাজারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সবই মেলে।

॥ পিপলকোঠি ॥

১৫ই মে বেলা ১১টায় গুপ্তকাশী হতে বাসযোগে রওনা হয়ে উক্ত স্থানগুলি দর্শন করে পিপলকোঠি পৌঁছলুম বৈকাল ৫টায়। চামোলি হতে পিপলকোঠির দুরত্ব ৯ মাইল—গুপ্তকাশী হতে ৭৪

মাইল, উচ্চতা ৪০০০´ ফুট। এসেই চা-বেগুনির সদ্ব্যবহার করে বাইরে দোতলা বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলুম, এখানে কোন পৃথক ঘরে আমাদের পাঁচজনের একত্রে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা নাই জেনে। একই ঘরে স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে রাত্রিবাসের যে ব্যবস্থা কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্তৃপক্ষ করেছিলেন তা আমাদের মনঃপূত হয় নি। এজন্য আমরা পাঁচজনে ৫·০০ টাকা দিয়ে ধরমশালার অনতিদূরে একখানি বাথরুম সহ দু' কামরা ঘর ভাড়া করেছিলুম রাত্রিযাপনের জন্য। পিপলকোঠি একটি ক্ষুদ্র লোকালয়। পথের উপরের অধিকাংশ ঘরেই দোকান-পসার। পূর্বে এখানে বাঘ ও হরিণাদির চামড়া এবং চামর সুলভে বিক্রয় হ'ত। এখন তিব্বত যাতায়াত ও মাল-চলাচল নিষিদ্ধ হওয়ায় এসব দ্রব্য প্রায় দুষ্প্রাপ্য। তবু বাজার ঘুরে সন্ধ্যায় প্রদ্যোৎ মহারাজ ১টি মৃগচর্ম ক্রয় করে আনলেন। এখানকার বাজারে খাদ্যদ্রব্য সবই মেলে বিশেষ করে দুগ্ধজাত দ্রব্য। শীতের প্রকোপ মন্দ নয়। কিন্তু স্বচ্ছন্দে রাত্রিযাপনের কোন অসুবিধা হয়নি। পরদিন ভোর ৫টার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে রইলুম বদরীনারায়ণ অভিমুখে যাত্রার জন্য। প্রত্যহ যেখানে রাত্রিবাস সেখানেই হোল্ড-অল্ খোলা আর গোটানো এক প্রাণান্তকর ব্যাপার। অথচ এ ছাড়া এ পথে অন্য কোন গতি নাই। পিপলকোঠি হ'তে বাসযোগে যাত্রা করলুম ৫-৪৫ মিনিটে বদরীনারায়ণের পথে।

॥ যোশীমঠ ॥

পিপলকোঠি হ'তে রওনা হয়ে পথিমধ্যে গরুড়গঙ্গা, টঙ্গনী, পাতালগঙ্গা, গোলাপকুঠি ও হেলঙ্গ চটি অতিক্রম করে সকাল প্রায় ৯টার মধ্যে যোশীমঠে পৌঁছলুম। পিপলকোঠি হতে যোশীমঠ ১৯ মাইল পথ। উচ্চতা ৬১৫০´ ফুট। এখানে বাসখানি সামান্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলতে শুরু করল বদরীনারায়ণের পথে। যোশীমঠ হতে বদরীনারায়ণের দূরত্ব ২৭ মাইল। প্রত্যাবর্তন পথে যোশীমঠ দর্শনের ব্যবস্থা।

॥ বিষ্ণুপ্রয়াগ ॥

যোশীমঠ হতে তু'মাইলের মধ্যেই বিষ্ণুপ্রয়াগ। বিষ্ণুগঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থল এটি। এখানেই আমাদের পঞ্চপ্রয়াগ দর্শন শেষ। আবার ফেরার পথে একটি একটি করে অতিক্রম করে যাব পাঁচটি প্রয়াগ। বাম পার্শ্বের উচ্চ পর্বত হ'তে নিম্নে প্রবাহিত হবার সময় বিষ্ণুগঙ্গা তু'দশটি ক্ষুদ্র পর্বতের মত অতি-বৃহৎ স্খলিত প্রস্তরে ধাক্কা খেয়ে টাল খেতে খেতে কলনাদিনী স্ফীতবক্ষা অলকানন্দায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কত সমারোহে নিজের অদম্য বেগকে অলকানন্দার বুকে উৎসর্গ করে যেন বৈরাগ্যের উপদেশ দান করছে। পথের তুধারে সুউচ্চ পর্বত। মাঝখানে নদী। পথ যেন গিরিসংকট। পর্বত তুটির নাম জয় ও বিজয়। বিষ্ণুপ্রয়াগ ছেড়ে বাস এগিয়ে চলে অলকানন্দার তীব ধরে। পথিমধ্যে বলদোড়া ও ঘাট চটি অতিক্রম করে আমরা পাণ্ডুকেশ্বরে পৌছলুম। বিশ্রাম নেই এসব স্থানে, কেবল পথের দৃশ্য হিসাবে দর্শন করে চলেছি স্থানগুলি।

॥ পাণ্ডুকেশ্বর ॥

বিষ্ণুপ্রয়াগ হতে ৬½ মাইল ও গুপ্তকাশী হতে ১০১½ মাইল পথ অতিক্রম করে চলে এলুম। উচ্চতা ৬০০০´ ফুট। পাণ্ডুকেশ্বর এ অঞ্চলের একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। লোকালয়সমৃদ্ধ, শস্য-শ্যামলা। অলকানন্দাই শ্যামলতা দান করে তাকে সম্পদ ও শ্রীমণ্ডিত করেছে। পাণ্ডুকেশ্বর নাম—পাণ্ডু এবং পাণ্ডবগণের সঙ্গে জড়িত। এই স্থানটিই পাণ্ডবদের জন্মস্থান। এখানে পাণ্ডু রাজা, কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত কঠোর তপস্যা করেছিলেন। পাণ্ডু রাজার মৃত্যুও হয় এখানে। পাণ্ডুকেশ্বর প্রবেশের প্রায় পৌণে এক মাইল পূর্বে গোবিন্দ ঘাট নামে একটি শিখ গুরুদ্বার দেখা যায়। উক্ত শিখ গুরুদ্বারের পাশ দিয়ে পাকদণ্ডী পথ চলে গেছে অলকানন্দার উপরিস্থ একটি ঝোলা সেতু পার হয়ে। সেই পথেই পাণ্ডুকেশ্বর হতে ১২ মাইল দূরে "ফুল

কি ওয়ারা" বা "নন্দন কানন"—১৪২৫০´ ফুট উচ্চে। হেমকুণ্ড ও লোকপাল যাবারও পথ এটি। এ পথে ৪ মাইল চড়াই ওঠার পর আর কোন গ্রাম নাই। বাস হতে গুরুদ্বার, ঝোলা-সেতু ও পাকদণ্ডী পথটি সুস্পষ্টভাবেই দেখা যায়। কুণ্ডু স্পেশ্যালের অনলস কর্মী ও উত্তম পথপ্রদর্শক হরি অঙ্গুলি নির্দেশে পথটি দেখিয়ে দিল।

এখানে অলকানন্দার এক অভিনব রূপ দৃষ্ট হয়। একটি মাত্র স্রোতস্বিনীর বিভিন্ন মূর্তি এক সঙ্গে কিরূপ হতে পারে প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যভাণ্ডার হতে তার বহু নিদর্শন অলকানন্দা এখানে একত্র সঞ্চয় করেছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসংখ্য প্রস্তরখণ্ডে ব্যাহত হয়ে অলকানন্দা প্রায় শত গজ নিম্নে পতিত হচ্ছে; শতধা বিভক্ত স্রোতে, কোথাও নির্ঝরিণী আকারে কোথাও উত্তাল তরঙ্গময়ী রূপে, কোথাও ফেনিলোচ্ছ্বাসে আবর্তের সৃষ্টি করে, কোথাওবা ধীরা, মন্থরা, আবেগময়ী মূর্তিতে। এ এক অপরূপ দৃশ্য। সংকীর্ণ পার্বত্যপথে বাসের গতিও মন্থর—এজন্য এ দৃশ্য উপভোগে বাধা সৃষ্টি হয় না। সম্মুখে বিনায়ক ও লামবগড় চটি অতিক্রম করে হনুমান চটির দিকে এগিয়ে চলেছে আমাদের বাসখানি।

॥ হনুমান চটি ॥

১৬ই মে ১০-৪৫ মিনিটের মধ্যে হনুমান চটিতে আমাদের বাসখানি পৌঁছে গেল। বিষ্ণুপ্রয়াগ হতে ১৩ মাইল পথ। উচ্চতা ৯০০০´ ফুট। তুষারপথ শুরু হয়েছে। পথ অত্যন্ত দুর্গম ও ভয়াবহ। এখান হ'তে বদরীনারায়ণ পর্যন্ত যাত্রাপথটি সবই তুষারময়। কোথাও পথিমধ্যে তুষারস্তূপ দ্বিধা-বিভক্ত করে গিরিবর্ত্মের ন্যায় পথ নির্মিত হয়েছে। বাসখানি কখন সেই সংকীর্ণ পথে কখনবা গলিত তুষার-ঝরণা অতিক্রম ক'রে চলেছে। এমন ভয়াবহ পথও আছে যেখানে বাসখানির চাকার পরিধির বাইরে অর্ধহস্তপরিমিত স্থানও নাই অথচ পথ তুষারময় এবং 'Z'-এর ন্যায় কুটিলগতিতে বাসখানি ক্রমেই

চড়াই পথে চলেছে। পার্শ্বে প্রায় ৯০০০' ফুট সুগভীর খাদ। এই সব পথ অতিক্রমকালে দেহে-মনে শিহরণ জাগে এই ভেবে যে, দৈবাৎ বাসখানি যদি নির্দিষ্ট কক্ষপথ হ'তে চ্যুত হয়ে পড়ে তখন কি অভাবনীয় অবস্থারই না উদ্ভব হবে। পথিপার্শ্বে বরফ কেটে পথ প্রশস্ত করা হচ্ছে। তুলনামূলক আলোচনা করলে মনে হয় এর চেয়ে কেদারনাথ যাত্রার পায়ে-হাঁটা পথ বহুগুণে নিরাপদ। এই সব মোটরচালকদের কৃতিত্ব সত্যই প্রশংসনীয়। এ অঞ্চলে প্রতি বৎসরই দু'একটি দুর্ঘটনা বিরল নয়। তবে এখানে মেঘ-নির্মুক্ত স্বচ্ছ আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে যে অভিনব দৃশ্য চোখে পড়ে তা অতুলনীয়। তুষারমৌলি গগনচুম্বী শৃঙ্গগুলি যেন বাহু প্রসারিত করে নীলাম্বরের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে উদ্‌গ্রীব। পরস্পরে যেন আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'তে উৎসুক। কে কাকে ধরা দেবে এই অছিলায় চলেছে লুকোচুরি। যে নিপুণ শিল্পীর অলক্ষ্য ইঙ্গিতে এই অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভিসার তাঁর কথা চিন্তা করে মন এককালে তন্ময়ী ভাব প্রাপ্ত হয়। চেয়ে দেখি রণ্ডক ও কাঞ্চন-গঙ্গার সঙ্গম অতিক্রম করে আমাদের বাসখানি বদরীক্ষেত্র প্রবেশের পুর্বে একটি সমতল ক্ষেত্রে উপস্থিত। বেলা তখন ১১-৩০ মিনিট। এখান হতে ১৫ মিনিট পায়ে হেঁটে গিয়ে অলকানন্দা ও ঋষিগঙ্গার পুল পার হয়ে বদরীপুরী পৌঁছলুম বেলা ১১-৪৫ মিনিটে।

॥ বদরিকাশ্রম ॥

১৫ই মে বেলা ১১টায় বাসযোগে গুপ্তকাশী হ'তে যাত্রা করে ৭৪ মাইল পথ অতিক্রম করে বৈকাল ৫টায় পিপলকোঠিতে এসে পৌঁছে সেখানে রাত্রিযাপন করে আরও ৩৮ মাইল পথ উত্তীর্ণ হয়ে ১৬ই মে বেলা ১১-৪৫ মিনিটে বদরীপুরী এসে পৌঁছলুম। হনুমানচটি হতে বদরীনাথের দূরত্ব প্রায় ৫ মাইল। উচ্চতা ১০,৫০০´ ফুট। প্রবেশ পথে অপেক্ষমান ছড়িদার জিৎ সিং যথারীতি ধরমশালায় নিয়ে গেল।

সেখানে সত্বর মালপত্র রেখে ধুলা পায়ে বেরিয়ে পড়লুম বদরীনাথ-জীকে প্রথম দর্শনের আশায়। পথের মাঝে আমাদের পাণ্ডা সুবোধ-কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল—সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। নানারূপ কারুকার্যমণ্ডিত অতি সুরম্য মন্দির। সম্মুখভাগের অধিকাংশই কাষ্ঠনির্মিত। পূর্বদিকে প্রবেশ দ্বার। উপরে একটি পিতলের ঘণ্টা। সাধারণের নাগালের বাইরে।—তবে দূর হতে শোনা যায় তার গম্ভীর ও শ্রুতিমধুর শব্দ।

শ্রীশ্রীবদরীবিশালজীর বিরাট স্বর্ণশীর্ষ মন্দির। মূল মন্দির তিন-ভাগে বিভক্ত। ভিতরে গর্ভমন্দিরে শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ বিগ্রহ। দেখলুম মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবান নারায়ণের কৃষ্ণপ্রস্তরের যোগস্থ মূর্তি, আকৃতি ধূসর বর্ণের। পার্শ্বে দক্ষিণে কুবের, গণেশ, উদ্ধব গরুড়। বামে লক্ষ্মী, নারদ ও নরনারায়ণ ঋষি। বাহির পরিক্রমাতে দক্ষিণাবর্তে লক্ষ্মীদেবীর মন্দির ও ভোগমণ্ডী। বামদিকে হনুমান ও ঘণ্টাকর্ণ। ভগবান বদরীনারায়ণ তপস্যার্থ বদরীভূমিতে আছেন, এজন্য লক্ষ্মীদেবী তাঁর মন্দিরাভ্যন্তরে অবস্থান না ক'রে বাহির পরিক্রমায় প্রথম মন্দিরে ভগবানের নিকটে অথচ ভিন্ন স্থানে বিরাজিতা। বদরীনারায়ণে শীতের প্রকোপ খুব। কেদারনাথ অপেক্ষা অধিক শীত ভোগ করতে হয়েছে এখানে। কারণ পশ্চাতেই চির তুষারাবৃত নীলকণ্ঠ পর্বত বদরী-নারায়ণের প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান। উচ্চতা ২১,৬৫০´ ফুট। নীলকণ্ঠকে দূর হতে সাধারণতঃ পিরামিড আকারের একটি মন্দির বলে মনে হয়। চূড়ার নিম্নে কিছু অংশ নীলাভ, এজন্যই বোধ হয় এর নাম নীলকণ্ঠ। বদরীধাম চতুর্দিকে উচ্চ পর্বতবেষ্টিত, সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১০,৫০০´ ফুট উচ্চে অবস্থিত। অতি মনোরম, প্রায় সমতল একটি উপত্যকার উপর স্থাপিত। এই পুণ্যভূমির পূর্ব গাত্র বিধৌত ক'রে পুণ্যস্রোতা অলকানন্দা দক্ষিণবাহিনী। অলকানন্দার পূর্বকূলে নর-পর্বত, পশ্চিমে নারায়ণ। এই উভয়ের মধ্যে সমভূমিতে (উপত্যকায়) অলকানন্দার দক্ষিণ পার্শ্বে (নারায়ণ পর্বতের পাদদেশে) শ্রীশ্রীবদরীনাথ পুরী।

শ্রীশ্রীবদরীনাথ বিগ্রহ : পুরাণমতে বদরীনাথে শ্রীভগবানের কোন মূর্তি ছিল না। যখন ভগবান দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হবার উদ্যোগ করছেন তখন দেবগণ তাঁকে বদরীভূমি ত্যাগ না করতে অনুরোধ করলেন। উত্তরে ভগবান তাঁদের জানালেন যে, কলিযুগে নরগণ পাপী ও ধর্মকর্মহীন হবে, সুতরাং প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎরূপে তখন বদরীক্ষেত্রে থাকা যাবে না। তবে পতিতপাবনী অলকানন্দার মধ্যস্থ নারদকুণ্ডে আমাব এক দিব্য মূর্তি আছে, তাকে উত্তোলন ক'রে তোমরা কোন স্থানে স্থাপন কব। সে মূর্তি যে দর্শন করবে তার আমাকেই সাক্ষাৎ দর্শনের ফল হবে। ব্রহ্মাদি দেবগণ নারদকুণ্ড থেকে সে মূর্তি উত্তোলন করলেন। শালগ্রাম শিলায় ধ্যানমগ্ন চতুর্ভুজ মূর্তির সেই সময় হতে পূজা আরম্ভ হ'ল।

যখন বৌদ্ধধর্মেব প্লাবনে সনাতন বৈদিক ধর্ম লুপ্তপ্রায় তখন বিষ্ণু ভগবানের পূজারও ব্যাঘাত হ'তে লাগল। বৌদ্ধগণ বিষ্ণুপূজা বন্ধ করে দিলেন। শ্রীশ্রীবদবীনারায়ণেব ধ্যানমূর্তিকে ভগবান বুদ্ধদেবেরই মূর্তিভ্রমে বৌদ্ধগণ পূজাদির ব্যবস্থা করেন। যখন সনাতন বৈদিক ধর্মাবলম্বীদের রক্ষার্থে শঙ্কর অবতীর্ণ হলেন তখন তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়ে বৌদ্ধ-শক-হূণাদি তিব্বতের পথে পলায়ন করলেন। পলায়নের সময় এতদিন বুদ্ধমূর্তি বলে পূজিত শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ মূর্তিটি অলকানন্দার মন্দির সম্মুখস্থ নারদ কুণ্ডে বিসর্জন দিয়ে যান। আচার্য শঙ্কর 'গন্ধমাদন' পর্বতে বদরিকাশ্রমে এসে মন্দিরে শ্রীশ্রীবদরী-বিশালের মূর্তি না দেখে ধ্যানযোগে জানতে পারেন যে, মূর্তিটি নারদ কুণ্ডে নিমজ্জিত আছে তখন তিনি সেখান থেকে মূর্তিটি উদ্ধার করে পুনরায় মন্দিরে স্থাপন করেন। বর্তমানে যে মূর্তিটির পূজা হয় উহা বৌদ্ধগণ কর্তৃক অলকানন্দায় নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় খণ্ডিত হয়েছিল, এখনও খণ্ডিত আছে। বদরীবিশালের বর্তমান মন্দিরস্বামী বরদারাজাচার্য গাড়োয়ালের মহারাজকে অনুরোধ করে পঞ্চদশ শতকে নির্মাণ করিয়েছিলেন। মন্দিরে শঙ্খ, চক্রের চিহ্ন ছিল,

কিন্তু স্মার্তদের অধিকারে পূজা ব্যবস্থা আসার পর সেই চিহ্ন লুপ্ত হয়েছে। শঙ্করাচার্য নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ ছিলেন; আজও এই নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণদের মধ্যেই একজন রাওল বা বদরীনারায়ণের পূজারী নিযুক্ত হন।

এখানে ১৬ই ও ১৭ই মে দু'রাত্রি তীর্থবাসের ব্যবস্থা। সুতরাং দর্শনাদির অবকাশ যথেষ্ট। এখানেও আমরা পাঁচজনে একখানি পৃথক ঘর পাওয়ায় অসুবিধা কিছু ছিল না। পাণ্ডার প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি এসে কয়েকখানি লেপ দিয়ে গেলেন। বিছানাপত্র খুলে সব গুছিয়ে রেখে বদরীনারায়ণের মন্দিরপার্শ্বস্থ তপ্তকুণ্ডে স্নানের জন্য সকলে রওনা হয়ে গেলুম। প্রথম কুণ্ডের জল বেশ উষ্ণ। তবে প্রথম কুণ্ডটি হতে পার্শ্বস্থ দ্বিতীয় কুণ্ডে এসে যখন জল সঞ্চিত হচ্ছে সে কুণ্ডটির জল ঈষদুষ্ণ। স্নানের বিশেষ অসুবিধা হয় না—বরং কুণ্ডে অবতরণ করে স্নান করে বেশ আরাম উপভোগ করা যায়। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে দ্বিতীয় কুণ্ডটিতেই স্বচ্ছন্দে স্নান সেরে নিচ্ছেন। আমরাও একে একে স্নান সেরে নিলুম। হরিদ্বারের মত স্বামী-স্ত্রী হাত ধরাধরি করে স্নান করছেন। ফিরে এলুম ধরমশালায়। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বৈকালে বদরীপুরীর অবশ্য দর্শনীয় বস্তুগুলি দর্শনের জন্য মন্দিরের দিকে যাত্রা করলুম। পূর্বেই উল্লেখ করেছি—হরিদ্বার হতেই স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই নিজ নিজ মনের মানুষের সঙ্গে এক একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন—এখানেও সেইভাবে তাঁরা এক একটি দলে বিভক্ত হয়ে দর্শনাদির জন্য বেরিয়ে পড়লেন।

শ্রীশ্রীবদরীধামে অবশ্য-দর্শনীয় বস্তুগুলি:

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যের মন্দির—শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণের মন্দিরের সিংহ-দ্বারের নিম্নস্থ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে অলকানন্দার ঘাটে তপ্তকুণ্ডের দিকে অবতরণের মধ্যপথে—দক্ষিণপার্শ্বে। মন্দিরে আদি শঙ্করাচার্য লিঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত। উক্ত পথেই বামপাশে আদি কেদারের মন্দির।

এতদ্ব্যতীত পঞ্চতীর্থ, পঞ্চশিলা, ব্রহ্মকপাল, ব্রহ্মকুণ্ড বদরীপুরীরই অন্তর্গত।

পঞ্চতীর্থ—(১) ঋষিগঙ্গা—এই নদীটি নীলকণ্ঠ পর্বত হতে উদ্ভূত হয়ে বদরীপুরীর দক্ষিণে অলকানন্দায় মিশেছে। বদরীপুরীর প্রবেশ পথেই দেখা যায়।

(২) কুর্মধারা—তপ্তকুণ্ডের অনতিদূরে শীতল জলধাবা।

(৩) প্রহ্লাদধারা—তপ্তকুণ্ডের পাশে প্রহ্লাদধারা নামে একটি ঝর্ণা।

(৪) নারদকুণ্ড—তপ্তকুণ্ডের সম্মুখে অলকানন্দার বুকে নাবদ-শিলা। এই শিলা ও তপ্তকুণ্ডের মধ্যস্থ অলকানন্দার অংশ নারদকুণ্ড।

(৫) তপ্তকুণ্ড—একটি উষ্ণ জলধাবা। শ্রীভগবানের চরণনিঃসৃত হয়ে একটি কুণ্ডে গিয়ে পতিত হচ্ছে। সেই কুণ্ডটির নাম তপ্তকুণ্ড। তপ্তকুণ্ডের পার্শ্বস্থ প্রহ্লাদধাবার সঙ্গে মিশ্রিত জলের আরও দুটি কুণ্ড আছে। একটির নাম গৌরীকুণ্ড ও অপরটির নাম সূর্যকুণ্ড।

পঞ্চশিলা—(১) নারদকুণ্ডের সম্মুখে অলকানন্দার বুকে নারদ-শিলা।

(২) নরসিংহ শিলা—অলকানন্দা নদীর বক্ষে নারদ-কুণ্ডের পাশে সিংহাকৃতি এক শিলা আছে তারই নাম নৃসিংহ বা নরসিংহ শিলা। হিরণ্য-কশিপু বধের পর ভগবান দেবতাদের অনুরোধে ক্রোধশান্তির জন্য বদরীপুরীতে চলে আসেন।

(৩) বরাহী শিলা—অলকানন্দার অভ্যন্তরে নারদ-কুণ্ডের পাশে শূকরাকৃতি এক বৃহৎ শিলা আছে, ইহাই বরাহী শিলা নামে খ্যাত।

(৪) গরুড় শিলা—তপ্তকুণ্ডের নিকটে একটি শিলা আছে, যেখানে গরুড় ভগবানের বাহন হবার জন্য তপস্যা করে ব্রত উদ্‌যাপন করেন, তারই নাম গরুড় শিলা।

(৫) মার্কণ্ডেয় শিলা—নারদ শিলার নিকটে অলকানন্দার বুকের উপর এই মার্কণ্ডেয় শিলা। মোট কথা, শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণের মন্দির নিম্নে তপ্তকুণ্ডের আশেপাশে ছড়িয়ে আছে এই দর্শনীয় বস্তুগুলি। দর্শনের বিশেষ অসুবিধা হয় না। মন্দিরচত্বরের দ্বারপালগণও দেখাবার ব্যবস্থা করতে পারে।

ব্রহ্মকপাল—বদরীপুরীর উত্তর প্রান্তে অলকানন্দা তীরে তপ্তকুণ্ড হতে ৩।৪ মিনিটের মধ্যেই অবস্থিত এই পিতৃতীর্থ ব্রহ্মকপাল। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই ব্রহ্মকপাল ও ব্রহ্মকুণ্ড দর্শন করে এলুম। সঙ্গে ছিলেন প্রদ্যোৎ মহারাজ। কথিত আছে এখানে পিতৃকুল, মাতৃকুল ও মৃত আত্মীয়স্বজনদের পিণ্ডদানে গয়ার আট গুণ ফল হয়। এ সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যায়িকাটি হল ঃ

"শিব এক সময়ে ব্রহ্মলোকে গিয়ে ব্রহ্মার অতিথি হন। সেখান হতে প্রত্যাবর্তনের সময় ব্রহ্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। গিয়ে দেখেন যে, ব্রহ্মা নিজ কন্যার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে উপগত হবার উদ্যোগ করছেন। শিবের নিষেধ সত্ত্বেও ব্রহ্মা বিরত হলেন না; তখন শিব ক্রোধান্বিত হয়ে ব্রহ্মার পঞ্চম শির ত্রিশূল দ্বারা ছেদন করলেন। কিন্তু কর্তিত মুণ্ড ভূমিতে পতিত না হয়ে ত্রিশূলবিদ্ধ হয়ে রইল। কোনক্রমেই ত্রিশূল হতে মুণ্ডটি মুক্ত করতে পারলেন না। এই অবস্থায় শিব অতি মাত্রায় চিন্তিত হয়ে বিষ্ণুর শরণার্থী হয়ে সকল ঘটনা বিবৃত করলেন। বিষ্ণু তখন শিবকে বললেন, "হে শিব, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ তপোভূমি উত্তরখণ্ডস্থ বদরীক্ষেত্রে যাও,

সেখানে গেলে স্থান-মাহাত্ম্যে তোমার শূল হতে ব্রহ্মার পঞ্চম শির গুপ্ততীর্থের কুণ্ড পার্শ্বে পতিত হবে। তারপব পার্শ্বস্থ কুণ্ডে স্নান করলে তবে তোমার ব্রহ্মহত্যাপাপ খণ্ডন হবে।”

বিষ্ণুর আজ্ঞায় শিব তাই করলেন এবং গুপ্তকুণ্ডের পাশে পৌঁছাবামাত্র ব্রহ্মার ছিন্ন মস্তক নিকটস্থ ময়দানে ত্রিশূল হতে পতিত হল। তারপর শিব কুণ্ডে স্নান করে ব্রহ্মহত্যার পাতক হতে মুক্ত হলেন। ত্রিশূল হতে যেস্থানে ব্রহ্মার খণ্ডিত মস্তকটি পতিত হয়েছিল তারই নাম ব্রহ্মকপাল নামে বিখ্যাত পিতৃতীর্থ। পার্শ্বস্থ যে কুণ্ডে শিব স্নান করেছিলেন তার নাম ব্রহ্মকুণ্ড। এই অনুপ্রেরণায় দর্শনাদি সমাপ্ত করে বদরীনারায়ণের পিণ্ড-প্রসাদের জন্য ২৲ টাকা জমা দিয়ে বদরীবিশালজীব আরাত্রিক দর্শনমানসে সিংহদ্বারে উপস্থিত হলুম।

মন্দিরাভ্যন্তর স্বল্পালোকিত। সাধারণ দর্শকেব মন্দিরের ভিতবে প্রবেশাধিকার নাই। কুড়ি বাইশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে শ্রীশ্রীবদরীবিশালজীকে দর্শন করতে হয়। দিবাভাগে অস্পষ্ট দর্শন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটি উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোক বিগ্রহমূর্তিতে প্রতিফলিত হওয়ায় সুস্পষ্টরূপে মূর্তিটি দৃষ্ট হয়। অপ্রশস্ত মন্দিরে লোকসংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় সুষ্ঠুরূপে আরাত্রিক দর্শন এক দুরূহ ব্যাপার। যাই হোক, কোনরূপে আরাত্রিক দর্শন করে রাত্রি ৮টার মধ্যে ধরমশালায় প্রত্যাবর্তন করলুম এবং নৈশভোজন সমাপ্ত করে নিদ্রার জন্য সচেষ্ট হলুম। কিন্তু কেদারনাথ অপেক্ষা এখানে শ্বাসকষ্ট অধিক অনুভূত হওয়ায় অস্বস্তির জন্য সুনিদ্রার ব্যাঘাত হলো। প্রদ্যোৎ মহারাজ মাঝে মাঝে উঠে বসে রাত্রি যাপন করেছিলেন। পরদিন ১৭ই মে, ৮-৩০ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে তপ্তকুণ্ডে স্নানের জন্য বেরিয়ে পড়লুম সঙ্গে নিয়ে প্রদ্যোৎ মহারাজকে। তপ্তকুণ্ডে যথারীতি স্নানাদি সেরে শ্রীশ্রীবদরীবিশালজীর পূজার সামগ্রী ক্রয় করে মন্দিরচত্বরে প্রবেশ করতেই সাক্ষাৎ হল আমাদের পাণ্ডা সুবোধ-কুমারের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে পূজা নিবেদন করা হল।

সুবোধকুমার অমায়িক লোক—পাণ্ডা হিসাবে দাবী কিছুই নাই। মন্দির হতে প্রত্যাবর্তন পথে পিণ্ডপ্রসাদ নিয়ে ও শ্রাদ্ধাদির সামগ্রী ক্রয় করে পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদির জন্য ব্রহ্মকপাল অভিমুখে চলতে শুরু করলুম। পৃথক ব্রাহ্মণ দ্বারা এক ঘণ্টা কাল পিতৃকুল, মাতৃকুল ও মৃত আত্মীয়স্বজনদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ-পিণ্ডাদি দান করে অলকানন্দার বুকে পিণ্ড বিসর্জন দিয়ে ব্রহ্মকুণ্ডের বারি মস্তকে স্পর্শ করে ১১-৫০ মিনিটে ধরমশালায় ফিরে এলুম। প্রদ্যোৎ মহারাজ এ যাবৎ সঙ্গেই ছিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রাম নিয়ে প্রদ্যোৎ মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরের দিকে চললুম দু'পাশের বাজার দেখতে দেখতে। উদ্দেশ্য ঐ অবকাশে কিছু জিনিসপত্র ক্রয় করা। সহযাত্রী স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এখানকার বাজারে বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয় করার উদ্দেশ্যে দোকানে দোকানে ঘোরা-ফেরা করছেন। আমাদের মত কেনা-কাটায় নিঃস্পৃহ ব্যক্তিরাও যখন এ্যালবাম, বদরীনারায়ণের মূর্তি অঙ্কিত ব্রোঞ্জের মেডেল প্রভৃতি ক্রয় করছি তখন অন্যদের আর কি কথা। কেদারানাথে ক্রমাগত তুষারপথে চলাফেরার দুর্ভোগজনিত ভীতিতে অনেকেরই জিনিসপত্র কেনায় বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তাছাড়া কেদারে বদরীনারায়ণের মত সুসজ্জিত দোকান-পসারেরও অভাব। এইভাবে, বাজার ঘুরে বদরীনারায়ণজীকে দর্শন করে সন্ধ্যার পর প্রত্যাবর্তন করলুম। এদিন সন্ধ্যায় বৃষ্টিপাত হওয়ায় শীতের প্রকোপ হ্রাস পেল, সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্টও লাঘব হল। সুতরাং রাত্রের সুনিদ্রায় দেহ-মনে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে লাগলুম। ১৮ই মে সকালের দিকটা বিশ্রামেই কেটে গেল। সীতেনবাবু ও অধ্যাপক ঘোষ শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যতাবশতঃ গতদিন স্নানাদি থেকে বিরত ছিলেন এবং ব্রহ্মকপালে শ্রাদ্ধাদিও করতে যান নি। আজ সকাল থেকেই তাঁরা উভয়ে এ বিষয়ে তৎপর হয়ে ব্রহ্মকপালের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। প্রদ্যোৎ মহারাজের সঙ্গে তপ্তকুণ্ডে স্নান সেরে শ্রীশ্রীবদরীনরায়ণজীর বাল্যভোগ দর্শন করে ফিরে এলুম ধরমশালায়।

তারপর মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে বদরীনারায়ণ হতে যোশীমঠ অভিমুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলুম। যোশীমঠ এ পথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ। শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত চারটি ধর্মদুর্গের বা চারধামের অন্যতম ধাম। সুতরাং অনেকেই আগ্রহী ছিলেন যোশীমঠ দর্শনের জন্য। বেলা ২টার সময় বদরীনারায়ণ ছেড়ে যোশীমঠ অভিমুখে যাত্রা করলুম বাসযোগে—"জয় বদরীবিশালকি জয়" ধ্বনি দিয়ে।

কেদারনাথ যাত্রাপথের পার্বত্য দৃশ্য ও বদরীনারায়ণ পথের পার্বত্য দৃশ্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। কেদার-পথের পার্বত্য দৃশ্য সরস, শ্যামলিমাময়। বদরীনারায়ণ যাত্রাপথের দৃশ্য শুষ্ক, মরুময়, কঠিন প্রস্তরীভূত পার্বত্য অঞ্চল, সরসতাবিহীন। কেদারপথের প্রস্তরখণ্ডও যেন রস-নিষ্ণাত।

অথচ দেবতা হিসাবে কেদারনাথ রুদ্র, জটাবল্কলধারী রিক্ত তপস্বী, ললাট-বহ্নিতে মদন ভস্মীভূত, সতীর দুশ্চর তপস্যায় সংসারী হয়েও উদাসীন, নাম তাই ভোলা মহেশ্বর। অপর পক্ষে বদরীনাথ যোগস্থ নারায়ণ মূর্তি—লীলান্তরে রসময়, কখন বৃন্দাবনে, কখন দ্বারকায় জীবন তাঁর মধুর লীলারসসিক্ত। তাই যৌবনোচ্ছলা তন্বী, প্রিয়দর্শিনী অলকানন্দা তাঁর পদাম্বুজ চুম্বনে তৃপ্ত হয়ে যেন বল্লভ-কান্তের সহিত কান্তার মিলনানন্দের উচ্ছ্বাস-বাণীই বহন করে চলেছে বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে।

॥ যোশীমঠ ॥

"যে পথ দিয়ে এসেছিলাম মোরা, যাবার পথে সে পথ দিয়েই ফেরা" অর্থাৎ যে পথে আমরা বদরীনারায়ণ এসেছিলুম সে পথেই প্রত্যাবর্তন করছি। ১৮ই মে বদরীনারায়ণ হতে বেলা ২টায় রওনা হয়ে হনুমান চটি, লামবগড় চটি, বিনায়ক চটি, পাণ্ডুকেশ্বর, ঘাট চটি, বলদোড়া ও বিষ্ণুপ্রয়াগ অতিক্রম করে একেবারে যোশীমঠে এসে পৌঁছলুম বৈকাল ৫-১৫ মিনিটে। এখানে উদ্যানবাটীকাস্থ "বিড়লা

ভবন”-এ আমাদের রাত্রিবাস। দ্বিতল গৃহ, সম্মুখে ফুলের বাগান, রক্তগোলাপ ফুটে রয়েছে অসংখ্য। পরিচ্ছন্ন, শান্ত পরিবেশ। ইলেক্‌ট্রিক লাইট, স্নানাগার, শৌচাগার সবই আছে। কিন্তু কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্তৃপক্ষ এখানে আমাদের পাঁচজনের জন্য পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করতে না পারায় “বিড়লা ভবন” হতে অনতিদূরে ৭।৮ মিনিট চড়াই পথে ৮৲ টাকা দিয়ে আমরা চারজনে একখানি ঘর ভাড়া নিয়েছিলুম—রাত্রিবাসের জন্য।

যোশীমঠ নাতিবৃহৎ রমণীয় পার্বত্য জনপদ, সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৬১৫০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। পাহাড়ের ঢালের দিকে অলকানন্দা পর্যন্ত গড়ে উঠেছে যোশীমঠ শহর। এখনও নির্মীয়মান বাড়ী চোখে পড়ে। এখানে ডাকবাংলো, হাসপাতাল, ডাক ও তারঘর এবং পুলিশ-থানা আছে। চীনের সহিত যুদ্ধ বিরতির পর বর্তমানে এখানে একটি স্থায়ী সেনানিবাস নির্মিত হয়েছে এবং অর্ধ-শহরে পরিণত হয়েছে। সৈনিক-পুলিশরাই এখানে যানবাহন মিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বাজারে সকল দ্রব্যই মেলে। শীতকালে শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণের চলমূর্তি নিয়ে এসে এখানে পূজা হয়। বদরীনাথের রাওয়াল বা পূজারী শীতকালে এখানে থাকেন।

যাই হোক, এখানে পৌঁছেই আমরা কয়েকজন এখানকার বিশেষ দর্শনীয় বস্তু জ্যোতির্মঠ ও যোশীমঠ দর্শনের জন্য সত্বর প্রস্তুত হয়ে নিলুম। কারণ, সন্ধ্যা আগতপ্রায়; অপরিচিত পার্বত্য অঞ্চলে বন্ধুর পথে চড়াই-উৎরাই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। সুতরাং সীতেনবাবু, প্রদ্যোৎ মহারাজ, নির্মল মহারাজ ও অজিতা সহ আমরা কয়েকজন জ্যোতির্মঠ দর্শনের জন্য বেরিয়ে পড়লুম। “বিড়লা ভবন”-এর বাম পাশ দিয়ে সামান্য চড়াই পথে (৩৫০´) ৬৫০০´ ফুট উচ্চে প্রস্ফুটিত গোলাপ-নিকুঞ্জ মধ্যে ফলে ফুলে সুশোভিত একটি নির্জন উপত্যকায় এই জ্যোতির্মঠ।

প্রবেশপথে দ্বার-সম্মুখেই পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জগন্মাতা

পূর্ণগিরির মন্দির। মন্দিরাভ্যন্তরে দেবীর মর্মর মূর্তি। এই দেবীর নামানুসারে জোতির্মঠের অপর নাম পূর্ণগিরিমঠ। সমগ্র উত্তরাখণ্ড যে জগজ্জননী ভগবতী অন্নপূর্ণার পীঠস্থান সেই বিশ্বম্ভরণী মহামায়া এখানে নিত্যবিরাজিতা। পূর্ণগিরি মন্দির দর্শনের পর পার্শ্বস্থ গোলাপ কুঞ্জ ও ফলভারাবনত আপেল, ন্যাসপাতি প্রভৃতি বৃক্ষাদি অতিক্রম করে উদ্যানমধ্যবর্তী পথ দিয়ে জ্যোতির্মঠের মূল মঠ বা পীঠভবনে প্রবেশ করলুম। দ্বিতলে তখন মঠের বর্তমান মোহান্তজী আগন্তুক ও ভক্ত শিষ্যগণকে উপদেশ দান করছিলেন। এখানে অতি প্রত্যূষে বেদপাঠ হয়। মন্দিরচত্বর ও চতুষ্পার্শস্থ গৃহগুলি দর্শন করে সেখান হতে অতি প্রাচীন সহঁতুতের অমর বৃক্ষ দেখতে গেলুম। এই বৃক্ষের ছায়ায় আদি শঙ্করাচার্য ১৬ খানি উপনিষদের ব্রহ্মসূত্র ও গীতার ভাষ্য রচনা করেছিলেন।

বৃক্ষটির কিছু নিচেই জগদ্‌গুরু আদি শঙ্করাচার্যের গুহা—ঐ গুহাতেই তিনি তাঁর জীবনের একাদশ থেকে ষোড়শ বর্ষকাল পর্যন্ত তপশ্চর্যায় অতিবাহিত করেন। গুহাটি বর্তমানে উপযুক্তভাবে সংরক্ষিত নয়, বহু অপ্রয়োজনীয় অব্যবহার্য দ্রব্যে পূর্ণ।

জ্যোতিরীশ্বর শিবের মন্দির—গুহাটির উপরে ও অমর বৃক্ষটির পার্শ্বে এই মন্দিরটি অবস্থিত। এই জ্যোতিরীশ্বর শিব-লিঙ্গ সম্বন্ধে এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, আদি শঙ্করাচার্য যে সময়ে এই গুহায় তপস্যা করতেন সেই সময় তাঁর সম্মুখে এক জ্যোতিঃ আবির্ভূত হয়ে পার্শ্বস্থ শিব-লিঙ্গে প্রবেশ করে। তারপর মন্দির নির্মাণ করে শঙ্করাচার্য শিব-লিঙ্গটি তথায় প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই লিঙ্গটিকে জোতিরীশ্বর নামে অভিষিক্ত করেন। এই স্থানে জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই স্থানটির নাম রেখেছিলেন জ্যোতির্মঠ। এই জ্যোতিরীশ্বর শিবকে স্পর্শ ও প্রণাম করে এলুম।

প্রায় ২৫০০ হাজার বৎসর পূর্বে বৌদ্ধধর্মের প্লাবনে যখন হিন্দুধর্ম লুপ্তপ্রায় তখন ভগবান শঙ্কর আচার্য শঙ্কররূপে অবতীর্ণ হয়ে সনাতন

হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে এবং ভবিষ্যতে বৈদিক ধর্মকে সুরক্ষিত করার মানসে ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি ধর্মদুর্গ বা ধর্মপীঠ স্থাপন করেন। পূর্বে—জগন্নাথধামে গোবর্ধন মঠ, পশ্চিমে—দ্বারকাধামে শারদামঠ, উত্তরে—বদরীধামের নিকট যোশীমঠের উপকণ্ঠে জ্যোতির্মঠ ও দক্ষিণে—শ্রীরামেশ্বরে শৃঙ্গেরী মঠ। ইহাই চারধাম নামে প্রসিদ্ধ। বাজারের রাস্তা দিয়ে উত্তরমুখে প্রায় ১০।১২ মিনিট উৎরাই পথে গিয়ে যোশীমঠে পেঁ ৗছলুম অজিতা ও প্রদ্যোৎ মহারাজের সঙ্গে। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। এখানে তিনটি প্রসিদ্ধ মন্দির দর্শন করলুম।

(১) শ্রীবাসুদেবের মন্দির—মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবানের শ্যামবর্ণ চতুর্ভুজ মূর্তি, বাহির পরিক্রমায় দ্রৌপদী ও গরুড়ের মূর্তি।

(২) দ্বিতীয় মন্দিরে ভগবতী, নবদুর্গা এবং জগজ্জননীর সঙ্গে গণেশ। সম্মুখে ঘৃতদীপ প্রজ্জ্বলিত। পার্শ্বস্থ কুণ্ডে দুইটি হস্তীমুণ্ডের ভিতর দিয়ে জলধারা নির্গত হচ্ছে।

(৩) নরসিংহ মন্দির—মন্দিরে সিংহাসনের উপর মধ্যস্থলে নৃসিংহদেব। বামে উগ্রমূর্তি নরসিংহ, দক্ষিণে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ ও শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ মূর্তি। পার্শ্বে কুবের, গরুড় ও চণ্ডিকা দেবীর মূর্তি। এই মন্দিরেই শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণজীর বারমাস পূজা হয়। দর্শনান্তে সন্ধ্যা ৭॥টার মধ্যে আমাদের বাসায় গিয়ে বিশ্রাম নিতে লাগলুম। পথিমধ্যে দু-একজন সহযাত্রীর সাক্ষাৎ পাওয়ায় অজিতা সেই সঙ্গে "বিড়লা ভবনে" চলে গেল। রাত্রে নৈশ ভোজনের পর বিশ্রাম নিয়ে পরদিন প্রাতে ১৯শে মে ৬-১৫ মিনিটে শ্রীনগর অভিমুখে যাত্রা করলুম।

॥ শ্রীনগর ॥

১৯শে মে সকাল ৬-১৫ মিনিটে যোশীমঠ হতে রওনা হয়ে ক্রমে হেলঙ্গচটি, গোলাপকুঠি পাতালগঙ্গা, গরুড়গঙ্গা, পিপলকোঠি, চামৌলি, নন্দপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ প্রভৃতি অতিক্রম করে

বৈকাল ৩-৩০ মিনিটে শ্রীনগর এসে বাসটি থামল। যোশীমঠ হতে শ্রীনগরের দূরত্ব ৯১ মাইল। এখানেই রাত্রিবাস ডাকবাংলোয়। পথে প্যাকেট ব্যবস্থায় লুচি আলু-মরিচ ও বঁদে সরবরাহের ব্যবস্থা, তৎসহ চা। শ্রীনগরের বর্ণনা সংক্ষেপে কেদার-যাত্রাকালে বিবৃত করেছি। শ্রীনগরে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অসুবিধা হ'ল পানীয় জল ও ব্যবহার্য জলের দুষ্প্রাপ্যতা। কারণ শ্রীনগর, টিহরী ও পৌরী—গাড়োয়ালের সংযোগস্থল। টিহরী হয়েই যমুনোত্রী যাবার পথ। এজন্য যাত্রীর সংখ্যা প্রচুর। জলের চাহিদা মেটান খুবই শক্ত। সকল সময় কলে জল থাকে না। শৌচাগারের সংখ্যাও অত্যল্প। স্বভাবতই লোকে শৌচাগারের ভিতর বাহির সর্বত্রই নোংরা করে রেখে দেয়। উত্তর প্রদেশ সরকারের বা স্থানীয় ব্যবস্থাপনার সাহায্যে এ সমস্যা দুটির সত্বর সমাধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। এককালে শ্রীনগর ছিল গাড়োয়ালের রাজধানী, সুতরাং রাজধানীর এ কলঙ্ক মোচন করে গাড়োয়াল সরকার শীঘ্রই যেন তৎপরিবর্তে তার ললাটে রাজটীকা পরাবার ব্যবস্থা করেন। যাই হোক, কুণ্ডু স্পেশ্যালের সুব্যবস্থায় জলাভাব বিশেষ ভোগ করতে হয় নি। শ্রীনগরে রাত্রিযাপন করে সকাল ৬-৪৫ মিনিটে ঋষিকেশ অভিমুখে রওনা হলুম।

॥ ঋষিকেশ ॥

২০শে মে সকাল ৬-৪৫ মিনিটে শ্রীনগর হতে রওনা হয়ে কীর্তিনগর অতিক্রম করে দেবপ্রয়াগে এসে বাসখানি আপ বাসগুলির জন্য ৩০ মিনিট থামল। এখান হতে বাসখানি বেশ দ্রুত চলতে শুরু করল, কারণ পথ ক্রমেই সমতলাভিমুখী। পথিমধ্যে ব্যাসঘাটে একবার আধঘণ্টার জন্য গেটের বাসের অপেক্ষায় এসে আমাদের বাসখানি থামল। ১৮ই মে বেলা ২টায় বদরীনারায়ণ হতে রওনা হয়ে যোশীমঠ ও শ্রীনগরে রাত্রিযাপন করে ১৮০ মাইল পথ অতিক্রম করে ঋষিকেশে পৌঁছলুম বেলা ১২টায়। এখানেই আমাদের

বাস-যাত্রার পরিসমাপ্তি, সেই সঙ্গে কেদারবদরী যাত্রার উদ্বেগ, চিন্তা ও ভাবনারও সমাপ্তি।

ঋষিকেশে পেঁাছে স্নানাদি সেরে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করে নিলুম বেলা ২টার মধ্যে। ২-৩০ মিনিটে আমাদের কোচটি "ঋষিকেশ হরিদ্বার" যাত্রীবাহী গাড়ীটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে হরিদ্বার অভিমুখে রওনা হয়ে গেল। সীতেনবাবু, প্রদ্যোৎ মহারাজ ও আমি রয়ে গেলুম ঋষিকেশে কয়েকটি কাজের জন্য। এখান হতে সদানন্দ মহারাজের আশ্রম অভিমুখে চলতে শুরু করলুম পূর্বসূচী মত ছবি দু'খানি নেবার অভিপ্রায়ে। তিনিও গতকাল হতে অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য। ঘণ্টাখানেক কেদার-বদরী ভ্রমণ-সূচীর গল্প করে ও কিছু প্রসাদ দিয়ে পূর্বোক্ত ফটোগ্রাফারের স্টুডিওর উদ্দেশ্যে আমরা চারজন রওনা হলুম তাঁর আশ্রম হতে। যথারীতি পূর্বকথামত ছবিগুলি নিয়ে গল্প করতে করতে এগিয়ে এলুম ষ্টেশনের পথে—বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে সদানন্দ মহারাজ চলে গেলেন তাঁর আশ্রমের দিকে। হরিদ্বার হতে সন্ধ্যা ৬-১০-এর গাড়ীখানি ১ ঘণ্টা বিলম্বে ঋষিকেশ পেঁাছানর ফলে প্রায় ১ ঘণ্টা বিলম্বে রাত্রি ৮টায় আমরা হরিদ্বার পেঁাছলুম। সান্ধ্য জলযোগ সেরে প্লাট্‌ফরমে চেয়ার বেঞ্চ পেতে হরিদ্বারের গাঙ্গেয় বায়ুতে বিশ্রাম নিতে লাগলুম অনেকেই। এখানে দু'রাত্রি বাসের ব্যবস্থা। সুতরাং অবকাশমত বাজার করা ও দর্শনাদির জন্য ব্যস্ততার কোন প্রয়োজন নাই। ২০শে মে রাত্রিযাপন করে পরদিন পুনরায় সীতেনবাবু, প্রদ্যোৎ মহারাজ ও আমি ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের জন্য বেরিয়ে পড়লুম। প্রদ্যোৎ মহারাজ মস্তক মুণ্ডন করে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান সেরে নিলেন। আমরা দু'জনেও ব্রহ্মকুণ্ডে "সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ" বলে স্নান করে স্নিগ্ধ হলুম। সহযাত্রীগণও ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে পুণ্যার্জনের আশায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। উচ্ছল উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছে গঙ্গা। সুগভীর জলরাশি ছুটে চলে পাহাড় পর্বত ভেদ করে সঙ্গমে সঙ্গমে প্রয়াগতীর্থ সৃষ্টি করে। তীরে

তীরে গড়ে ওঠে কত নগর, গড়ে ওঠে কত তীর্থ। বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে দেখি তার কলকল ছলছল রূপ। প্রত্যাবর্তন পথে আপন আপন প্রিয়জনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আদি ক্রয় করার উদ্দেশ্যে হর্-কি-পৌড়ীর বাজারে ঘোরা-ফেরা করতে লাগলুম সকলে। সামান্য কিছু ক্রয় করে তিনজনে ফিরে এলুম হরিদ্বার ষ্টেশনে—টুরিষ্ট কোচে। মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমি ও প্রদ্যোৎ মহারাজ কনখল সেবাশ্রমের কর্মসচিব স্বামী প্রমথানন্দজীর কথামত ফেরার পথে পুনরায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উদ্যোগ করতে লাগলুম। সীতেনবাবু ও নির্মল মহারাজ হর্-কি-পৌড়ীর বাজার যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। আর একটি মানুষ, যে গত ৫ই মে হতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ফিরেছে, ধর্মশালা ঠিক করেছে, পথপ্রদর্শক হিসাবে পথের বাঁকে অপেক্ষা করে বসে থেকেছে এবং হরিদ্বার হতে কেদারনাথ আর কেদারনাথ হতে বদরিকাশ্রম পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে—এবার সেই ছড়িদার জিৎ সিং-এর বিদায়ের পালা। আমরা পাঁচজনে সাধ্যমত তাকে বিদায়ী বখশিস্ মিটিয়ে দিলুম। সে খুসী হয়ে নমস্কার জানিয়ে অন্য যাত্রীদের কাছে ঘোরা-ফেরা করতে লাগল। পথের সাথী যারা ছিল একে একে সকলেই বিদায় নিয়ে গেল, আমরাও চললুম কনখল সেবাশ্রম অভিমুখে। স্বামী প্রমথানন্দ তাঁর স্বভাবসুলভ অমায়িক ব্যবহারে চা-বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। তাঁর জন্য নিয়ে গিয়েছিলুম কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণের প্রসাদ। আমাদের যাত্রাপথ নিরাপদ হয়েছিল কিনা এবং দর্শনাদি সুষ্ঠুভাবে হয়েছে কিনা সংবাদ নিলেন তিনি। কেদারবদরী ভ্রমণসূচীর আলোচনা চলছিল তাঁর সঙ্গে, ইতিমধ্যে আমাদের কামরার সহযাত্রীদের একটি দল সেবাশ্রম দর্শনে এলেন। প্রমথানন্দজীকে বলে তাঁদের জন্য একজন প্রদর্শকের ব্যবস্থা করে দেওয়া হল—আশ্রমের দর্শনীয় বস্তুগুলি প্রদর্শনের জন্য। কথাবার্তার মাধ্যমে সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখে প্রমথানন্দজীকে ব্রহ্মকুণ্ডে

আমাদের আরাত্রিক দর্শনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে তাঁর কাছ হতে বিদায় নিলুম। যাত্রা শুরু করেছিলুম কনখল সেবাশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ধ্যারাত্রিক লগ্নে—তাঁকে অন্তরের আকুতি নিবেদন করে। যাত্রাশেষে নিরাপদ প্রত্যাবর্তন অন্তেও মন্দিরে গিয়ে তাঁকে শেষ প্রণতি জানিয়ে ধীরে ধীরে আশ্রম-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে রওনা হলুম—মন্দির হতে একটি আশীর্বাদী পুষ্প নিয়ে।

ব্রহ্মকুণ্ডের সম্মুখ চত্বরে নিভৃত একটি স্থানে এসে দাঁড়ালুম স্তব্ধ হয়ে। সম্মুখে খরস্রোতা ভাগীরথী। আরাত্রিক সমাপ্তপ্রায়। দেব-দেবীর মন্দিরগুলি হতে সন্ধ্যারতির অস্পষ্ট শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে। গঙ্গাবক্ষে প্রদীপ সজ্জিত ভাসমান পুষ্পডালিগুলি নেচে নেচে দুলে দুলে চলেছে। কেদারনাথ ও বদরীনাথজী দর্শনানন্দের প্রশান্তি দেহে মনে এখনও সঞ্চরিত। মানসপটে ভেসে উঠল যাত্রাপথের স্মৃতি—কোন স্মরণাতীত কাল হতে যুগে যুগে, কালে কালে, কত তপস্বী, কত সন্ন্যাসী হয়েছেন এ পথের যাত্রী—তাঁদের পদরজপূত ঐ পথ। অশীতিবর্ষ পূর্বে ঐ পথ দিয়েই তো গেছেন একজন সন্ন্যাসী—নগ্নপদে, দণ্ড-কমণ্ডলু হস্তে, ভিক্ষাবৃত্তি ও কৌপীন-বহির্বাস মাত্র সম্বল করে; তাঁর পদরজওতো মিশে আছে ঐ পথের ধূলায়। সেই প্রেরণাতেই এবারের যাত্রা শুরু। যৌবনারম্ভে যাঁর পায়ে মাথা লুটিয়েছিলুম জীবন-পথের দিশারীরূপে, শিষ্যের মঙ্গলকামনায় কল্যাণ-হস্ত প্রসারিত করে, সজল নেত্রে, তিনি যে আজও দাঁড়িয়ে আছেন—পঞ্চাশোর্ধ্বে নিরাপদ কেদার-বদরী যাত্রা অন্তে সেই গুরুকৃপাটুকু উপলব্ধি করে ধন্য হলুম।

ব্রহ্মকুণ্ডের ব্রহ্মবারি মস্তকে স্পর্শ করে ধীরে ধীরে ফিরে এলুম হরিদ্বার ষ্টেশনে টুরিষ্ট কোচে। তখনও চলেছে দেহে মনে অতীত স্মৃতির রোমন্থন। ২২শে মে ভোর ৫-৩০ মিনিটে হরিদ্বার হতে একখানি যাত্রীবাহী গাড়ী আমাদের কোচটিকে নিয়ে লাকসার ষ্টেশনে পৌঁছল ৬-৩০ মিনিটে। ৭-৩০ মিনিটে আমাদের বগিটি পাঠানকোট

এক্সপ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছুটল শিয়ালদহ অভিমুখে। পথে মোরাদাবাদ ও লক্ষ্ণৌতে সকলেই উৎসুক হয়ে উঠলেন সেখানকার বিশেষ সামগ্রী আদি ক্রয় করার জন্য। এমনি করে সাড়ে তেত্রিশ ঘণ্টা চলার পর পাঠানকোট এক্সপ্রেস শিয়ালদহ পৌঁছুল ২৩শে মে বৈকাল ৫টায় নির্দিষ্ট সময়ের ১-৫০ মিনিট বিলম্বে। গাড়ীটি প্লাটফরমে প্রবেশের কয়েক মুহূর্ত মধ্যেই আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লুম ২১ দিনের সাহচর্য থেকে। অগণিত জনতার মাঝে একে একে হারিয়ে গেলুম সকলেই। এমনি করেই আমরা সমাজ, সংসার ও পারিবারিক বন্ধন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুহূর্তমধ্যে একদিন হারিয়ে যাই মহাকালের অতল আবর্তে।

॥ তুষারতীর্থ অমরনাথ ॥

এক

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে যায়।

তবে কেদার-বদরী যাত্রার মতো উদ্যম, প্রচেষ্টা ও প্রাক্-প্রস্তুতি ছিল না এবারের এই দুর্গম যাত্রায়। শেষ মুহূর্তেও ছিল মনের একটি দোলাচল বৃত্তি—যাওয়া-না-যাওয়ার দ্বন্দ্ব। কিন্তু তিনি যখন ডাক দিয়ে পথে বের করেন তখন ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা, বাধা-বিঘ্ন সব কিছুই হয়ে যায় গৌণ। এমন কি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে মানুষ হাসে আনন্দের হাসি। তাইতো কবি গেয়েছেন ঃ

'শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সংকট আবর্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি ; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ গুরুভ্রাতা স্বামী সদাত্মানন্দজী শ্রাবণী-পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীঅমরনাথ যাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করে কুণ্ডু স্পেশ্যালে তাঁর জন্য স্থান-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে বললেন। জানিনা, কেমন করে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছাও গেল জড়িয়ে। কতকগুলি সুযোগ-সুবিধাও এসে গেল। গতবারের কেদার-বদরীর সহযাত্রী ও সহকর্মী সীতেনবাবুর কাছে প্রথম প্রকাশ করি এ কথা। প্রথমে তিনি আমার কথায় আস্থা স্থাপন করতে না পেরে ব্যক্তিগত অসম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন এবারের যাত্রায় সঙ্গী হতে। অবশ্য পরদিন আবার তাঁরই অনুরোধে কুণ্ডু স্পেশ্যালের ষ্ট্র্যাণ্ড রোড অফিসে স্থান-সংরক্ষণের জন্য আমাকেই তাঁর সঙ্গী হতে হয়েছিল। আসাম হতে একই কামরায় স্থান-সংরক্ষণ

করেছিলেন গুরুভ্রাতা স্বামী কল্যাণানন্দ ও বেদান্ত মঠের জনৈক শিষ্য শ্রীশান্তিরঞ্জন দাস।

১০ই আগষ্ট ১০-২০ মিনিটে জনতা (দেরাদুন) এক্সপ্রেস যোগে শ্রাবণী-পূর্ণিমায় কুণ্ডু স্পেশ্যালে অমরনাথ দর্শনার্থীদের যাত্রার দিন। রাত্রি ৯-২০ মিনিটের মধ্যেই হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছে গেলুম। সঙ্গে স্বামী সদাত্মানন্দ, স্বামী কল্যাণানন্দ ও শ্রীশান্তিরঞ্জন দাস। ভবানীপুর হতে যথাসময়ে এসে উপস্থিত হলেন সহকর্মী শ্রীসীতেন্দ্রনাথ রায়।

রাত্রি অধিক হওয়ায় একান্ত প্রিয়জন ছাড়া এবারে অভিনন্দন-জ্ঞাপনকারীদের সংখ্যা ছিল কম। তবে এ বিষয়ে আমাদের আতিশয্য কম ছিল না। সকল অসুবিধা ভোগ করে এই দুর্গম তীর্থযাত্রার প্রাক্কালে ব্যক্তিগত সহানুভূতিটুকু জ্ঞাপন করতে এসেছিলেন অজাতশত্রু শ্রীপূর্ণেন্দু রায় সুদূর কস্‌বা হতে। এসেছিলেন বেদান্ত মঠ থেকে ননী মহারাজ, প্রদ্যোৎ মহারাজ, ব্রহ্মচারী তারাপদ ও নির্মল। ডানকুনি হতে এসেছিলেন শ্রীবীরেশ্বরবাবু প্রমুখ ভক্তবৃন্দ—এসেছিলেন বারানসীবাবু একান্ত আমার পক্ষ হতে। কর্তৃপক্ষের তরফ হতে শ্রীযুক্ত সুকুমার কুণ্ডু মহাশয় এসে পুরাতন যাত্রী হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেলেন ম্যানেজার বাদলবাবু ও এ্যাসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার অমরবাবুর সঙ্গে। গতবার কেদার-বদরী যাত্রাকালে কামরাটির সহযাত্রীদের সঙ্গে যেমন গড়ে উঠেছিল একটি ঘরোয়া পরিবেশ এবারে কিন্তু ছিল না সকলের সঙ্গে সেরূপ সহমর্মিতা। অনেকেই স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্যবোধ সম্বন্ধে ছিলেন এত সচেতন যে, একটি মানসিক ব্যবধান সকলের মধ্যে বাধাস্বরূপ হয়ে উঠেছিল সাবলীল মেলামেশার পক্ষে। ফলে যে একাত্মবোধ একটি আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে দুর্গম যাত্রাপথে যোগায় অভিনব প্রেরণা তার অভাব ছিল অন্ততঃ আমাদের কামরাটিতে। দ্বিতীয়তঃ কুণ্ডু স্পেশ্যালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, খাদ্যসরবরাহ ব্যবস্থা ও সেবাপরায়ণতার বিষয় প্রকাশ করতে কেদার-বদরী যাত্রাকালে যে লেখনী হয়ে উঠেছিল প্রশংসামুখর

—এবারে মুখরতা ভঙ্গ ক'রে সে লেখনী যেন চাইছে তার ছন্দ পরিবর্তন করতে। কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য যাত্রীসাধারণকেও মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ হতে দেখেছি। কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এটি সুখকর সংবাদ নয়। জানিনা, অমরনাথ যাত্রাপথের এটিই রীতি কিনা। কারণ, অমরনাথের দুর্গম, দুরারোহ ও বন্ধুর পথ, ছন্দপতনেরই পথ। ছন্দোবদ্ধভাবে কোন কিছু সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়।

জনসাধারণের গাড়ী দেরাদুন এক্সপ্রেস ১০-২০ মিনিটে চলতে শুরু করল জনসাধারণের গতির সঙ্গে তাল রেখে। কখন দ্রুত, কখন মন্দ তালে। সকলেরই চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে। রাত্রি ১১টা—জানালার পাশে বসে ষ্টেশন দেখার আগ্রহ তেমন কারো নেই। নিজ নিজ সংরক্ষিত শয়নোপযোগী স্থানে একে একে সকলেই নিদ্রা-দেবীর ক্রোড়ে ঢলে পড়লেন। তবে বিশেষ কয়েকজন নিদ্রাতুর ব্যক্তি ছাড়া নিদ্রা কার কতটুকু হয়েছিল তা ছিল বিতর্কের বিষয়। ট্রেনে প্রথম রাত্রি এরূপেই কাটে। যাই হোক, এইভাবে ৩৫ ঘণ্টা চলার পর ১২ই আগষ্ট সকাল ৯-৩০ মিনিটে হরিদ্বার ষ্টেশনে এসে পৌঁছলুম।

আপন আপন সুবিধামত একে একে ব্রহ্মকুণ্ডের ঈষৎ পঙ্কিল জলে স্নান সেরে দু'রাত্রির ক্লান্তি অপনোদনে স্নিগ্ধ হলুম সকলেই। অভ্যাস-মত হর-কি-পৌড়ির বাজার ঘুরে একটি (soap case) সোপকেস ও এক প্যাকেট সার্ফ কিনে ১১-৩০ মিনিট মধ্যে টুরিষ্ট কোচের আস্তানায় ফিরে এসে ১২টার মধ্যে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে বিশ্রাম নিতে লাগলুম। অনেকেই কুণ্ডু স্পেশ্যালের লোকসহ বেরিয়ে পড়লেন —হরিদ্বার, কনখল, লছমনঝুলা, ঋষিকেশ প্রভৃতি স্থানগুলি দর্শনের জন্য বেলা দু'টার মধ্যেই। এখানে আমাদের ১½ দিন অবস্থিতি। কেউ কেউ আগামী দিনের জন্য রেখে দিলেন তাঁদের সফর-সূচী। সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্বামী সদাত্মানন্দ, কল্যাণানন্দ, শান্তিবাবু ও সীতেন-বাবু সহ আমরা পাঁচজন বেরিয়ে পড়লুম কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম

অভিমুখে। স্বামী কল্যাণানন্দ এক সময় বহুদিনের কর্মী ছিলেন এই সেবাশ্রমে। তাঁর এক প্রাচীন সন্ন্যাসী বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল এখানে। কন্‌খল সেবাশ্রমের পরিবেশ, পরিধি ও সেবাপরায়ণতার বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করেছি কেদার-বদরী ভ্রমণ কাহিনীতে। স্বামী সদাত্মানন্দ, কল্যাণানন্দ ও শান্তিবাবু আশ্রমের সব ঘুরে দেখে নিলেন কল্যাণানন্দজীর সন্ন্যাসী বন্ধুর সঙ্গে। ৭-৩০ মিনিটে শান্ত পরিবেশে, পূত সন্ধ্যারাত্রিক লগ্নে দুর্গম যাত্রারম্ভে জীবন-দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাণী প্রার্থনা করে কন্‌খল সেবাশ্রম হতে পায়ে হেঁটে ফিরে এলুম টুরিষ্ট কোচে রাত্রি ৮-৩০ মিনিটে বৃষ্টি ভেজা দেহ নিয়ে। পরদিন প্রাতে স্বামী কল্যাণানন্দ ও সীতেনবাবু ঋষিকেশ রওনা হয়ে গেলেন ব্যক্তিগত দু'একটি প্রয়োজনে। হরিদ্বার, ঋষিকেশ এবং লছমনঝুলার অধিকাংশই অতি পরিচিত স্থান—এজন্য বিশ্রামের অছিলায় রয়ে গেলুম টুরিষ্ট কোচে।

১৩ই আগষ্ট বৈকাল ৬-৫ মিনিটে দেরাদুন-অমৃতসর যাত্রীবাহী গাড়ীতে রওনা হয়ে গেলুম অমৃতসর অভিমুখে। হরিদ্বারের সুপেয় জল ছেড়ে যেতে মায়া লাগে। হরিদ্বার হতে অমৃতসরের দূরত্ব ২৩৮ মাইল। দেরাদুন-অমৃতসর যাত্রীবাহী গাড়ীখানি ধীরে-মন্থরে চলতে চলতে পরদিন ১৪ই আগষ্ট বেলা ১১-৫০ মিনিটে অমৃতসর পৌঁছল ১৭ ঘণ্টায় ২৩৮ মাইল পথ অতিক্রম করে। পথে বিশেষ ষ্টেশনগুলি হল লাক্‌সার, শাহারাণপুর, অম্বালা ক্যাণ্টনমেণ্ট, অম্বালা সিটি, লুধিয়ানা, জলন্ধর ক্যাণ্টনমেণ্ট ও জলন্ধর সিটি। লুধিয়ানার পর শতদ্রু ও জলন্ধরের পর বিপাসা সেতু পার হয়ে একেবারে অমৃতসর পৌঁছলুম। অমৃতসর এমন কিছু বড় ষ্টেশন নয়। বিশেষ করে হাওড়া-শিয়ালদহ ষ্টেশনের অন্তর্বর্তী অধিবাসীদের কাছে ভারতের কোন ষ্টেশনই চমকপ্রদ নয়। ট্রেনটি ষ্টেশনে প্রবেশ করার কয়েক মিনিট মধ্যেই আমরা কয়েকজন রেলের ওভারব্রীজ পার হয়ে অমৃতসর বাজার ঘুরতে বেরিয়ে পড়লুম। পাঞ্জাব অঞ্চলে প্রখর রৌদ্র। এজন্য

কিছু দূর অগ্রসর হয়েই কয়েকজন মিলে একখানি টাঙ্গা ভাড়া করে বাজারের বিশেষ অংশগুলি ঘুরে দেখে নিলুম। কারণ, আজই সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে এখানকার দর্শনীয় যা-কিছু সংক্ষেপে দেখে নিয়ে পাঠানকোট রওনা হয়ে যেতে হবে। বাজারের প্রবেশপথেই ছোট একটি পার্কে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মর্মর মূর্তি। সুদূর পশ্চিমবঙ্গ হতে এসে একজন বাঙালীর আত্মত্যাগের মূর্ত মর্মর স্মৃতি দৃষ্টে বুকটা গর্ব ও আনন্দে স্ফীত হয়ে উঠল। হরিদ্বারেও ১৯১১ সালে প্রথম সুভাষঘাট দেখে এমনি ভরে উঠেছিল মনটা। অমৃতসরে বিশেষ দর্শনীয় বস্তু হল শিখগুরুদোয়ারা, স্বর্ণমন্দির, জালিয়ানওয়ালাবাগ, দুর্গাবাড়ী ও খালসা কলেজ। প্রতিটি স্থান ষ্টেশন হতে ২।৩ মাইল দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রাম নিয়ে বেলা ৩টার মধ্যেই সকলে বেরিয়ে পড়লুম উক্ত স্থানগুলি দর্শনের অভিপ্রায়ে প্রতি চারজনে ১৲ টাকা করে টাঙ্গা ভাড়া দিয়ে। প্রথমেই স্বর্ণমন্দির দর্শনে গেলাম। একটা অজানা আনন্দে মনটা ভরে উঠল—বাল্যকাল হতে ইতিহাসের পাতায় এতদিন যে স্বর্ণমন্দিরের ছবি দেখে এসেছি সেটি চাক্ষুষ দেখতে পাব এই আশায়। পনের মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলুম স্বর্ণমন্দিরের দরজায়। টাঙ্গাওয়ালা গাড়ীতে জুতা রেখে মন্দিরে প্রবেশ করতে বলল। স্বর্ণমন্দিরের প্রকৃত অর্থ হল House of God (ঈশ্বরের মন্দির), (The Golden Temple) —স্বর্ণমন্দির—পূর্ব নাম হরমন্দির। রণজিৎ সিং শীর্ষচূড়াগুলি সুবর্ণমণ্ডিত করেন। তাই নাম স্বর্ণমন্দির।

॥ স্বর্ণমন্দির ॥

মূল তোরণ-দ্বারের প্রবেশপথ হতে বিস্তৃত গালিচার ওপর পা ফেলে প্রবেশ করলুম মন্দির-চত্বরে। একটি শুচি-শুভ্র পরিবেশ। মন্দিরসহ সমগ্র চত্বরের আয়তন দৈর্ঘ্য-প্রস্থে এক স্কোয়ার মাইলের অর্ধেক। একটি সুবৃহৎ জলাশয়ে মধ্যমণিরূপে বিরাজিত বহু কক্ষ-

কেদাবেব পথে মন্দাকিনী

কেদারনাথ মন্দির—১১,৭৬০′

কেদারনাথ

শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ মন্দির—১০,৫০০

চন্দনবাড়ীর পথে তুষার সেতু
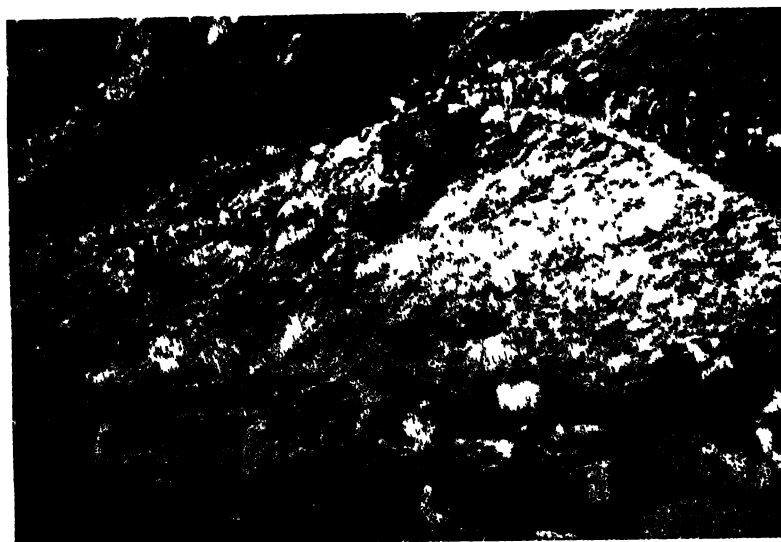
পিশু চড়াই

শেষনাগ হ্রদ

মহাগুণাস্ গিরিসংকট—১৪,০

পঞ্চতরণী

অমরনাথের তুষারপথ

তুষারলিঙ্গ অমরনাথ

অমরনাথ গুহা—১২,৭২৯´
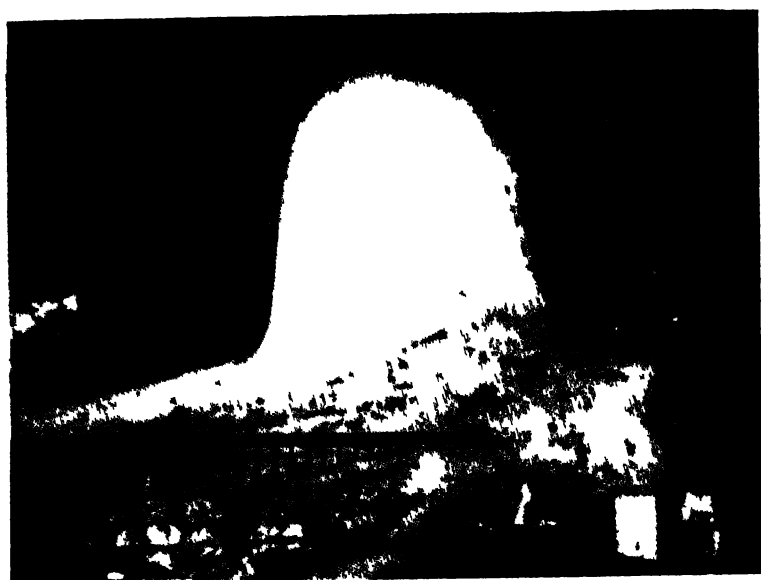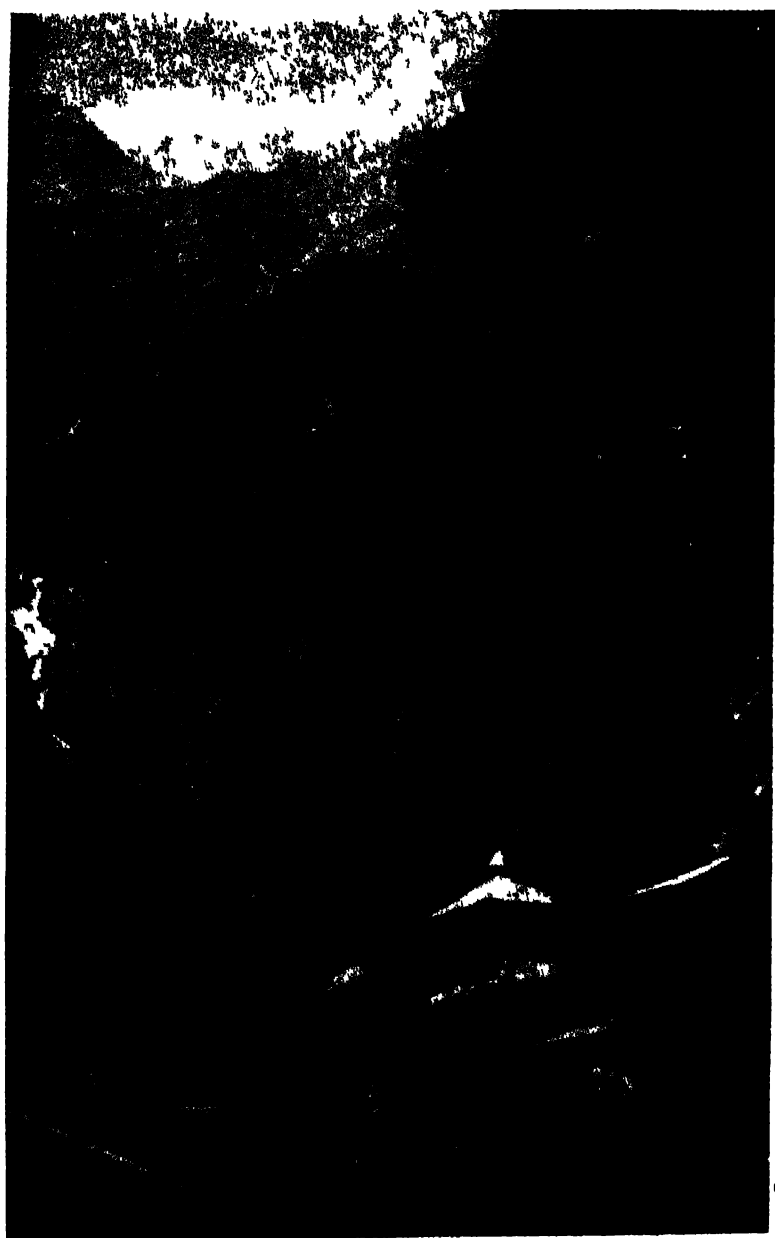
যমুনোত্রী মন্দির ১০,৮০০'

শ্রীমতী ডালিয়া মল্লিকের সৌজন্যে

বিশিষ্ট দ্বিতল এই স্বর্ণমন্দির। স্বর্ণমন্দিরের চারপাশে জলাশয়টি বেষ্টন করে সমগ্র চত্বরটি মার্বেল প্রস্তর দ্বারা গোলাকৃতিভাবে নির্মিত। এই বেষ্টনী-পথ ধরেই ধীরে ধীরে সকলে এগিয়ে চলেছেন—স্বর্ণমন্দির অভিমুখে। আমরাও অগ্রসর হয়ে জলাশয়ের পাশের চত্বরটির অর্ধেক পরিক্রমা করে একটি সেতু অতিক্রম করে প্রবেশ করলুম স্বর্ণমন্দিবের প্রবেশ-তোরণে। এই সেতুটিই জলাশয় ও স্বর্ণমন্দিরের প্রবেশ-পথরূপে সংযোগ বক্ষা কবছে। তোরণদ্বারে গুরুমুখী ভাষায় উৎকীর্ণ বণজিৎ সিংহেব গৌরব-গাথা যিনি সর্বপ্রথম মন্দির-শীর্ষ সুবর্ণমণ্ডিত কবেন। সম্মুখ প্রকোষ্ঠে গুরুগ্রন্থ পাঠরত একজন সন্ত। ধূপধুনা সুগন্ধি-দ্রব্য, পুষ্প ও মাল্য-চন্দনে আমোদিত গুরুগ্রন্থগৃহখানি। জুতা পায়ে বা অনাবৃত মস্তকে স্বর্ণমন্দিরে প্রবেশ নিষেধ। মন্দিরের বাহির ও অভ্যন্তবেব সুশোভিত কারু-শিল্প দর্শকচিত্ত বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত করে :

"যেন ঝালবে ঝলিত
স্বর্ণখচিত দাঁড়ায়ে স্তম্ভ সাব।"

এই স্বর্ণমন্দিবে সংবক্ষিত সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কব বস্তুটি হল একজন মুসলমান ভক্ত কর্তৃক প্রদত্ত ১,৪৫,০০০ চন্দনকাষ্ঠের সূত্র নির্মিত একখানি ব্যজনী। যেটি উক্ত ভক্তটি ১১২০ পাউণ্ড চন্দনকাষ্ঠ ব্যবহার দ্বারা ৫ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমে নির্মাণ কবেছিলেন। দর্শনান্তে বাহিব পথে প্রত্যেক দর্শনার্থীকে হালুয়া প্রসাদ বিতবণ করা হচ্ছে। প্রতিটি কক্ষের কারুকার্য ও ভিত্তিগাত্রে গুরুমুখী ভাষায় উৎকীর্ণ গুরুগ্রন্থের শিক্ষা সমুচ্চয় দেখতে দেখতে দ্বিতলে আরোহণ করলুম। সেখান হতে কয়েক মিনিটের ব্যবধানেই অবস্থিত শিখ সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার দেখতে গেলুম। সেখানে বিভিন্ন তৈলচিত্রে অঙ্কিত শিখজাতির স্বাজাত্যবোধ, ধর্মবিশ্বাস ও স্বর্ণমন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার্থ তাদের ৫০০ শত বৎসরের আত্মত্যাগের ঐতিহ্যময় ঘটনাগুলি দৃষ্টে মুগ্ধ হতে হয়। এখানেই সংরক্ষিত রয়েছে প্রাচীনকালে ব্যবহৃত

শিখজাতির অস্ত্র-শস্ত্র এবং সঙ্গীতকলার অপূর্ব নিদর্শনস্বরূপ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি। দেহমন স্ফীত হয়ে ওঠে যখন দেখি ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বাবা দীপসিংজী অভূতপূর্ব বীরত্ব দেখিয়ে দেহ হতে মস্তক বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেও যুদ্ধ করে চলেছেন—মোগলদের অত্যাচার হতে স্বর্ণ-মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার্থে।

এতদ্ব্যতীত স্বর্ণমন্দিরের চারপাশে যে সব স্মৃতিসৌধ ছড়িয়ে আছে তাদের ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। যেমন শিখ ষষ্ঠ গুরুর পুত্র বাবা অটল রায়ের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত দশমতল-বিশিষ্ট স্মৃতিসৌধ, অমৃতসরের সর্বোচ্চ প্রাসাদ। হবনকুণ্ডের বামপার্শ্বে শ্রীআকাল তকতসাহেব সৌধ যে স্থানে সন্ত ফতে সিং আত্মবিসর্জনের জন্য ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে নিজেকে অন্তরীণ রেখেছিলেন। আর রয়েছে তীর্থযাত্রীদের বিনামূল্যে খাদ্য ও বাসস্থানের উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য গুরু রামদাস নিবাস ১৫৬টি কক্ষযুক্ত আটটি সুবৃহৎ গৃহ। রয়েছে দীপসিংজীর শহীদ-স্মৃতি, রামসর গুরুদোয়ারা যেখানে গুরু অর্জন সিং গুরুগ্রন্থের শিক্ষা-সমুচ্চয় সংকলন কার্যে রত ছিলেন। যে শিখজাতি তার জন্ম হতে ৫০০ শত বৎসরের মধ্যে তাদের বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও ধর্ম-বিশ্বাসের মহিমায় এই গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য গড়ে তুলতে সক্ষম এবং যাদের শৌর্য বীর্য ভারতেতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছে সে জাতির উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক অধুনা পাকিস্তানভুক্ত লাহোরের নিকটবর্তী নানকানা সাহেব নামে একটি স্থানে ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন। এই সময়টিই শিখজাতির জন্মলগ্নের প্রথম দিন বলে ধরা হয়। ভারতে মুসলমান শাসনের তখন ৭০০ শত বৎসর অতিক্রান্তপ্রায়। হিন্দু মুসলমানের যৌথ সংস্কৃতির মিলিত ভাবধারা ভারতীয় মৃত্তিকায় এক অভিনব চিন্তাধারার উন্মেষ সাধন করল। গুরু নানক কর্তৃক প্রচারিত শিখধর্মের মূল শিক্ষা হল "শ্রীভগবানের

একত্বে বিশ্বাস। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি সৌভ্রাত্রবোধ ও পৌত্তলিকতাবাদ বর্জন।” গুরু নানক তদ্‌গতচিত্তে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে যে সকল প্রার্থনা-বাণী উচ্চারণ করতেন সেগুলিই গুরুগ্রন্থে সংকলিত। শিখরা সঙ্গীতপ্রিয় জাতি। কারণ শিখ গুরুগ্রন্থে প্রার্থনা-গুলি সঙ্গীতাকারে লিপিবদ্ধ। শিখ গুরুদোয়ারাগুলিতে প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় যে প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারিত হয় তা সঙ্গীতের সুরে গীত। শিখজাতি অত্যন্ত ধর্মপ্রবণ এবং তাদের জাতীয় চরিত্র ধর্মীয় অনুশাসন হতেই উদ্ভূত। ফলে তাদের সঞ্চিত অধ্যাত্মশক্তি ৫০০ শত বৎসরের ইতিহাসে বহু সংকটময় মুহূর্তে শিখজাতিকে রক্ষা করেছে। শিখ-জাতির অবশ্য পালনীয় নিয়মগুলি হল ধূমপান করা এবং চুল-দাড়ি কাটা নিষেধ। এগুলি শিখগুরুগণ কর্তৃক প্রবর্তিত। গুরু নানক ধর্মমত প্রচারের জন্য তাঁব পরবর্তী একজন শিষ্যকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। এই রীতি অনুসারে পব পর আটজন ধর্মগুরু উত্তরাধিকার-সূত্রে উক্ত পদ প্রাপ্ত হন। প্রত্যেক শিখগুরুই নিজ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত শিক্ষা দ্বারা দেশকাল ও পাত্রোপযোগী একটি নূতন জাতীয় চিন্তাধারায় শিখজাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন। শিখজাতির পঞ্চম গুরু অর্জনের অনুরোধে তাঁর একজন মুসলমান ভক্ত কর্তৃক এই স্বর্ণমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। একটি দ্বার বিশিষ্ট ভারতীয় মন্দিরের প্রথাগত রীতি বিলুপ্ত করে গুরু অর্জন ঐ মন্দিরের চারিটি দ্বার নির্মাণ করান। উদ্দেশ্য— শিখজাতির উপাসনা মন্দির জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা। এই পঞ্চম গুরুই অন্য চারজন গুরুর ধর্মমত ও সংগৃহীত প্রার্থনা-সংগীত সহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সন্ত-গণের প্রার্থনা-সঙ্গীতও এই গুরুগ্রন্থে সংযোজন করেন। ফলে পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে গুরুগ্রন্থ এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও উদারনৈতিক ভাবসমন্বিত। যখন মোগল সম্রাটগণের অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথ পরিহার করে জাতিকে অস্ত্রধারণ করার শিক্ষা দিলেন। নবম গুরু তেগ্‌বাহাদুর

তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পর তাঁকে তৎকালীন শাসকগণ নির্দেশ দান করলেন যে, হয় তিনি ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করুন নয়তো তাঁকে শক্তি-শালী সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের হাতে প্রাণ দিতে হবে। ষষ্ঠ গুরু শেষের পথটিই বেছে নিলেন। দিল্লীর রাজপথ রক্তে রাঙা হয়ে গেল— তাঁর শিরশ্ছেদ করা হল প্রকাশ্য রাজপথে। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের উপর শিখজাতির প্রতীক চিহ্নিত একটি বিরাট নিশান উড়ছে আজও ভারতের রাজধানীতে। শিখদের ইহা একটি পবিত্র মন্দির।

দশম গুরু এবং সর্বশেষ প্রবক্তা গুরুগোবিন্দ সিং নানকের অসমাপ্ত কার্যের একটি স্থায়ী রূপদান করেন। গুরুগোবিন্দের সময়েই শিখ-জাতি চরম পূর্ণতা লাভ করে। মূল শিক্ষা দয়া, দাক্ষিণ্য, নিঃস্বার্থপরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি সন্ত ও শহীদসম্প্রদায়কে একটি যুদ্ধশীল জাতিতে পরিণত করেন।

মুগলশাসকদের অমানুষিক অত্যাচারের জন্যই এই নীতি তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। স্বর্ণমন্দিরকে কেন্দ্র করে সংক্ষেপে ইহাই শিখজাতির ধর্মবিশ্বাস ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। স্বর্ণমন্দিরের স্বল্প ব্যবধানেই জালিয়ানওয়ালাবাগ। স্বর্ণমন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার্থে শিখজাতির যে আত্মত্যাগ ও রক্তাক্ত ইতিহাস রয়েছে এর পশ্চাতে তা অত্যন্ত করুণ ও মর্মস্পর্শী সন্দেহ নাই। কিন্তু তাদের বীরত্ব, দৃঢ়চিত্ততা ও ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠতা সবকিছু মিলে এবং স্বর্ণমন্দিরের পূত পরিবেশ ও অপূর্ব কারুকার্য দর্শন করে মনে জাগে একটি আনন্দ-বিজড়িত স্মৃতি।

॥ জালিয়ানওয়ালাবাগ ॥

জালিয়ানওয়ালাবাগ প্রবেশ করেই মনে হয়—এই সেই জালিয়ান-ওয়ালাবাগ। যার একটি করুণ কাহিনী বাল্যকাল হতে শুনে আসছি। সঠেলওয়ালা বাজারের সম্মুখে একটি গলি— দু'ধারে দোতলা বাড়ী,

মাঝখানে পাঁচ হাত চওড়া পথ। গলির ঠিক মাথার ওপরে ছোট অর্ধবৃত্তাকার খিলানে অস্পষ্ট হরফে লেখা "জালিয়ানওয়ালাবাগ"। পাথর-বাঁধান গলিপথে ছোট একটি গেট্—যেখানে পাশাপাশি চারজন লোকও হাঁটতে পারে না। এই গলিপথেই দু'জন করে সৈন্য পাশাপাশি নিয়ে গিয়ে জেনারেল ডায়ার সৈন্য সাজিয়েছিলেন। বাম পার্শ্বে উঁচু চাতাল এবং সেখান হতেই ডায়ার সাহেব হুকুম দিয়েছিলেন "ফায়ার"। সেই পথ পার হয়ে গলি গিয়ে পৌঁছেছে প্রান্তরে। আয়তন প্রায় আট একর। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের ম্লান স্মৃতিচিহ্নগুলি। প্রবেশদ্বারের পরই বাগের মুখে রক্তাক্ত অক্ষরে লেখা সেই বীভৎস ঘটনার সংক্ষিপ্ততম ইতিহাস!

"This ground was hollowed by the mingled blood of two thousand innocent Hindu and Mussalmans and Sikhs who were shot by the British bullets on 13th April, 1919. The ground was acquired from the owner by public subscription.

U. N. Mukherjee.
Secretary"

"১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল ইংরেজদের গুলীতে নিহত হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের মিশ্রিত রক্তপ্লাবিত স্থান এটি। জনসাধারণের দানে এই স্থানটি ভূস্বামীর নিকট হতে ক্রয় করা হ'ল।"

প্রান্তরের ভিতরে শহীদকূপ। তার উপরে একটি স্মৃতি-মন্দির—ইটের তৈরী সাদা চুণকাম করা। প্রান্তরের শেষ প্রান্তে দেওয়ালের গায়ে কয়েকটি গুলীর চিহ্ন। মধ্যস্থলে আকাশচুম্বী—স্বতন্ত্রতা-কি-জ্যোতি। বিরাট ফোয়ারা। কুড়ি-একুশ বৎসরের একটি বাঙালী যুবক (এখানকার সেক্রেটারীর পুত্র) পরম যত্নে সমগ্র জালিয়ানওয়ালাবাগ চত্বরটি বিশদভাবে বুঝিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। দলে দলে বাঙালীরা আসছেন জালিয়ানওয়ালাবাগ দেখতে—সকলেরই সহিত মিষ্ট

ব্যবহারে ছেলেটি সব ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে। ভাল লাগল, একজন প্রবাসী বাঙালী যে আজও জালিয়ানওয়ালাবাগে কর্মসচিব নিযুক্ত হয়ে আছেন এটুকু শুনে।

১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত ২৫০০০ নিরস্ত্র জনতার উপর ১৬৫০ রাউণ্ড গুলীবর্ষণের ফলে দু'হাজার মানুষ হতাহত হয়েছিল ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে। নিহতদের সংখ্যা ছিল ৩৭৯ এবং আহতদেব সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় হাজার। মৃত আর মুমূর্ষুদের দেহগুলি শায়িত ছিল রক্তাক্ত অবস্থায় স্তূপীকৃত হয়ে। সেবা-শুশ্রূষা বা স্থানান্তরিত করার দায়িত্ব বোধ করেন নাই তৎকালীন সরকার। গুলীবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে জালিয়ানওয়ালাবাগের জনতা স্থান ত্যাগের জন্য উদ্দাম হয়ে উঠেছিল। ছোটাছুটি করেছিল জ্ঞানশূন্য হয়ে। কোনদিকে পথ না থাকায় আত্মরক্ষার্থে অনেকে নিকটবর্তী কূপটিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল প্রাণরক্ষার জন্য। ডান, বাঁ, পিছন তিনদিকই ছিল রুদ্ধ। অধুনা হরিৎ-কোমল পুষ্পরাজি ও শত শত ফুলের টবে রং বেরং-এর ফুল, বাগিচার প্রবেশ ক্ষেত্রে, নানা শোভন অংশে থরে থরে সজ্জিত। এই হত্যাকাণ্ডের পটভূমিকা : প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ইংরাজ কর্তৃক প্রতিশ্রুত শাসন সংস্কার দানে সম্মতি থাকলেও তার পাশাপাশি যে এক বীভৎস দমন-নীতি পরিকল্পিত হয়েছিল সিড্‌নী রাউলাট্‌ কর্তৃক (যা কুখ্যাত রাউলাট্‌ এ্যাক্ট নামে খ্যাত) তারই প্রতিবাদে ২৫০০০ মানুষের একটি সভা আহূত হয়েছিল হংসরাজের সভাপতিত্বে জালিয়ানওয়ালাবাগ প্রান্তরে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল—বাঙালীর নববর্ষ দিনে। শুধু তাই নয়; এই রাউলাট্‌ এ্যাক্টের প্রতিবাদে আসমুদ্র হিমাচল সেদিন কেঁপে উঠেছিল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে। জালিয়ানওয়ালাবাগের জনতা ছত্রভঙ্গ করতেই ব্রিগেঃ জেনারেল ডায়ারের এই নৃশংস আচরণ। কবিসম্রাট্‌ রবীন্দ্র-নাথও সেদিন এর তীব্র প্রতিবাদে ইংরাজ প্রদত্ত নাইট্‌ উপাধি ত্যাগ

করেছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের একটি করুণ স্মৃতির গুরুভার বহন করে এখান হতে স্বল্প দূরের ব্যবধানে অবস্থিত দুর্গাবাড়ী এসে, মাতৃপদে এ গুরুভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলুম। শিখজাতির আদর্শে প্রতিষ্ঠিত দেবীমূর্তি দেখে প্রায় ১½ মাইল দূরে অবস্থিত শিখ মহাবিদ্যালয়গুলিব মধ্যমণি খালসা কলেজ অভিমুখে বওনা হলুম টাঙ্গাওয়ালাকে ঐ পথে টাঙ্গা চালাবার নির্দেশ দিয়ে। কারণ, এটি আমাদের সফর-সূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। খালসা কলেজ তার সুউচ্চ প্রাসাদ ও নির্মাণ-চাতুর্যেব অপূর্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিখদের জাতীয় ঐতিহ্যের স্মারকরূপে। মূল মহাবিদ্যালয়, খেলা-ধূলার মাঠ সহ খালসা কলেজেব পরিধি প্রায় ১ স্কোয়ার মাইলেব কম নয়। বর্তমানে এটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পবিণত করার চেষ্টা চলেছে।

কলেজে প্রবেশপথের দক্ষিণ পার্শ্বে খালসা মহিলা কলেজ। ভারতের মাত্র কয়েকটি কলেজ এব শিক্ষা ও খেলাধূলার সহিত প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম। পারসী ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছাড়া এদেব শিক্ষার হার যে কোন ভারতীয় জাতির শিক্ষার হার অপেক্ষা অধিক। রাজনৈতিক চেতনাব দিক হতে শিখসম্প্রদায় কতকগুলি দলে বিভক্ত। তন্মধ্যে শিরোমণি প্রবন্ধক কমিটি, আকালীদল ও খালসা দলই উল্লেখ্য। শিরোমণি প্রবন্ধক কমিটিই শিখজাতির কেন্দ্রীয় ধর্মসংস্থা। শিখজাতির সমস্ত ধর্মমন্দিরের যে বিপুল অর্থ ও সম্পত্তি তা এই প্রবন্ধক কমিটির অধিকারে। ইংরাজশাসক ও শিখ-জাতির পুরোহিত প্রথা উচ্ছেদসাধনে শিরোমণি কমিটি ও আকালী-দলের অবদান সর্বাধিক। প্রত্যাবর্তন পথে অমৃতসর বাজার থেকে একটি র‍্যাগ, সোয়েটার ও এক জোড়া পশমী মোজা কিনলুম—অমরনাথ পথের অকল্পনীয় শীতনিবারণের জন্য। শাল, আলোয়ান ও পশমী দ্রব্যসম্ভারে সুসজ্জিত অমৃতসর বাজার দৃষ্টে অতি নিঃস্পৃহ ব্যক্তিরও চিত্ত লুব্ধ হয়ে উঠবে কিছু ক্রয় করার জন্য। সন্ধ্যার

প্রাক্কালেই ফিবে এলুম টুরিষ্ট কোচে। সান্ধ্য জলযোগ সেরে ১৪ই আগষ্ট সন্ধ্যা ৭-৪৫ মিনিটে অমৃতসর-পাঠানকোট যাত্রীবাহী ট্রেন-যোগে রওনা হয়ে গেলুম পাঠানকোট অভিমুখে। সঙ্গে নিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগ ও অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরের করুণ-মধুব স্মৃতি।

দুই

॥ পাঠানকোট ॥

কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ, সূচীভেদ্য অন্ধকার—সেই অন্ধকারের বুক চিরে চলেছে আমাদের ট্রেনখানি—কখন দ্রুত, কখন মন্দগতিতে। চোখে ঘুম নেই—জানালার ধারে বসে অন্ধকারের নিথর রূপ দেখছি। মাঝে মাঝে সে নিথরতা ভঙ্গ করে আলোক-মুখরিত ষ্টেশনগুলি—যেন যাত্রীদের হাতছানি দিয়ে ডাক দিচ্ছে। অমৃতসর হতে পাঠান-কোটের দূরত্ব ৬৭ মাইল। পথিমধ্যে উল্লেখযোগ্য ষ্টেশনগুলি হল: বাটালা জংশন, ধারিওয়াল, গুরুদাসপুর, ভরোলি জংশন। রাত্রি ১১-৪৫ মিনিট; তন্দ্রালু নেত্রে চেয়ে দেখি ট্রেনখানি উত্তর রেলপথ সীমান্তের প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে। স্তব্ধ রাত্রি, যাত্রীরা গভীর ঘুমে অচেতন। রেলপথ শেষ। সম্মুখে রুদ্ধ গতিপথ। চালক চেষ্টা করেও গাড়ীখানিকে আর সম্মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। "চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে"। ১৫ই আগষ্ট বেলা ১১টা পর্যন্ত আমাদের এখানেই অবস্থিতি।

গতবারের কেদারবদরী যাত্রার ন্যায় এবারের সহযাত্রীদের সঙ্গে মানসিক একত্ববোধ না থাকলেও তাঁদের অধিকাংশদের সঙ্গেই ছিল যে একটি বাহ্যিক ঐক্য এ কথা অস্বীকার করা যায় না যখন গণনায় দেখা যায় যে, কামরাটির চৌদ্দজন যাত্রীর মধ্যে আটজন যাত্রীই ছিলেন অকৃতদার (দুইজন সন্ন্যাসী সহ)। একজন বিপত্নীক। শুধু তাই নয় এঁদের মধ্যে আবার শ্রীরামকৃষ্ণসংঘে আশ্রিতের সংখ্যা ছিল ছয়। কেদারবদরী যাত্রাকালেও এমনি একই কামরায় স্থান লাভ করেছিলুম আমরা চারজন অকৃতদার (দুইজন সন্ন্যাসী সহ)। অন্য কামরার কোন কোন যাত্রীর মন্তব্য হ'ল কুণ্ডু স্পেশ্যাল নাকি জেনে শুনেই আমাদের একঘরে (out caste) করেছেন। উক্ত

চৌদ্দজন যাত্রীর মধ্যে দশজন পুরুষ ও চারজন মহিলা। মহিলাদের মধ্যে তুইজন বিধবা। বিবাহিত পুরুষ বলতে শান্তিরঞ্জন দাস।

আমাদের কামরা হতে অন্য কামরা ও রন্ধনশালায় যাবার পথে—মধ্যে একটি দরজার ব্যবধান। এই দরজাটির বাঁপাশে জানালার ধারে সহকর্মী সীতেনবাবু—বয়স ৫৪।৫৫—অকৃতদার। আপন মনে বসে কখন ধূমপান করেন, কখন খৈনী খান, অবকাশমত নস্যও নেন। পান যেখানে মেলে সেখানে পানেও অরুচি নাই তাঁর। এ সবেও যখন মন ভরে না তখন আমাদের কাছে এসে গল্প-গুজব শুরু করে দেন। প্রয়োজন বোধে সীতেনবাবুব কাছে মাঝে মাঝে নস্য চেয়ে নিই। সীতেনবাবুর উপরের বাঙ্কে গুরুভ্রাতা স্বামী কল্যাণানন্দজী। স্বল্পভাষী ও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। পান খাওয়ার নেশা খুব—দন্তহীন হওয়া সত্ত্বেও।

সীতেনবাবুর সম্মুখে যাতায়াতের দরজাটির দক্ষিণ পার্শ্বে চারজন মহিলার সংরক্ষিত আসন। প্রথম আসনটির অধিকারিণী শ্রীমতী বিজন ঘোষদস্তিদার, বয়স ৪৮-এব কোঠায়। লম্বা-চওড়া পুরুষ্ট দেহ। পরবর্তী কালে অমরনাথের পথে যখন ঘোড়ার সওয়ারী হয়েছিলেন তখন টুরিষ্ট কোচের ছেলেমেয়েরা তাঁর নামকরণ করেছিলেন 'মিলিটারী দি' এবং এই নামের গুরুভারে তাঁর পিতৃ-মাতৃপ্রদত্ত নামটি এতই গৌণ হয়ে যায় যে, সে নামটি জানার জন্য কেউ আগ্রহ প্রকাশ বা প্রয়োজন বোধ করেন নি। তাঁর পার্শ্ববর্তিনী দ্বিতীয়জন বাঙালী ঘরের আদর্শ গৃহস্থ বধূ—পোষাকে-পরিচ্ছদে, আচারে-আচরণে ও লজ্জায়-সরমে। তিন সপ্তাহ এত কাছাকাছি থেকেও তাঁকে বিশেষ কোন কথা বলতে শুনিনি—বয়স ৪০এর কোঠায়। পরবর্তী তু'জন মহিলাই বিধবা, তবে এঁদের একজন বেশ সৌখীন। মোটামুটিভাবে এঁরা সাধারণ চাল-চলনের মাধ্যমে ও প্রয়োজনমত আলাপ-আলোচনার ভেতর দিয়ে সহযাত্রীদের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এই তু'জনের সহযাত্রী শ্রীঅন্নদা দে—স্থান

এঁদেরই একজনের উপরের বাঙ্কে। অন্নদাবাবু অকৃতদার। বয়স পঞ্চাশোর্ধ্বে। সাধারণভাবে বলতে গেলে—অন্নদাবাবু বেশ আমোদ-প্রিয় মানুষ ও একটু হুজুকপ্রিয়। যেখানেই একটু হুজুক ও আমোদের রেশ সেখানেই অন্নদাবাবু। বয়োজ্যেষ্ঠ, বয়োকনিষ্ঠ ও উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গেই তাঁর মেলামেশা। হোটেলে অবস্থানকালে আমাদের ঠাকুর-চাকরদের সঙ্গে—ষ্টেশনে থাকাকালীন ষ্টেশনের প্লাট্‌ফরমে পাখার নীচে বসে অন্য কামরার যাত্রীদের সঙ্গে নির্বিবাদে তাস খেলায় তাঁর মন মশ্‌গুল হয়ে ওঠে।

আমাদের সংরক্ষিত আসনের সম্মুখ দিয়ে বাথরুম ও শৌচাগারে যাবাব যে পথ তার দক্ষিণ পার্শ্বের আসনে শ্রীসবলকুমার দাস—অকৃতদার। বয়স ৬০-এর উর্ধ্বে। তাঁব নামের সঙ্গে আচরণের সামঞ্জস্য দেখে বিস্ময় জাগে। কাজ-কর্ম, শোয়া-বসা-ওঠা সবই ধীবে মন্থরে, কারো কোন অসুবিধা সৃষ্টি না করেই। নির্বিকার চিত্তে শয়ন কবে থাকেন বাত্রে, এমন কি একটিবারও পার্শ্ব পরিবর্তন না করে। আবার প্রত্যূষে উঠে বিছানাগুলি গুছিয়ে রাখেন ধীরে ধীরে একটি একটি করে হোল্ডঅলের মধ্যে। তাঁব এই নীরব ঔদাসীন্যের জন্য যাত্রীদের অনেকেই তাঁকে পছন্দ করতেন। স্বল্প ও মৃদুভাষী মানুষ। ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ ভাল লেগেছিল তাঁকে, যেহেতু তিনি বীডন ষ্ট্রীটে মদীয় আচার্যদেব স্বামী অভেদানন্দের গীতার ক্লাস শুনেছিলেন ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিকী উৎসবেও তাঁর অনবদ্য বক্তৃতা শ্রবণ করেছিলেন। তাঁর পাশে শ্রীসমরেন্দ্রনাথ মুখার্জি। বয়স ৪৩-এর কোঠায়—অকৃতদার। হিন্দুস্থান লিভারের সেলস্‌ম্যান। সকাল হতে ৩।৪ বার শৌচে যাবার প্রবণতা হেতু তাঁকে কেন্দ্র ক'রে অধিকাংশ যাত্রীই হাস্যরসের সৃষ্টি করতেন। মুখার্জি একবার শৌচাগারে প্রবেশ করলে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির শৌচে যাবার প্রয়োজন হতে পারে সে কথা এককালে বিস্মৃত হ'ত। মাঝে মাঝে হাত নেড়ে জগৎ মিথ্যা, এসব কিছু নয়, ভাল লাগে না কিছু—চাকরী ছেড়ে

মঠে যোগ দেব ইত্যাদি বলার পরক্ষণেই ফিট্‌ফাট্‌ হয়ে সাজ-গোজ করে প্রায় এক কৌটা পাউডার মাখা শুরু করে দিত। কামরাটির সহযাত্রীরা সকলেই এ ঘটনা উপভোগ করতেন। বাসে চলেছে মুখার্জি শ্রীনগরেব পথে—যেখানেই কিছুক্ষণ বাসের বিরতি—চা জলখাবার জন্য সেখানেই সে সবার আগে বাস থেকে নেমে কোথায় ডাকবাংলা, কোথায় বাথরুম কিংবা শৌচাগার তার সন্ধান নিয়ে অন্য যাত্রীদের অসুবিধার প্রতি উদাসীন হয়ে হয়তো দীর্ঘ সময় শৌচাগারে গিয়ে বসে আছে। মুখার্জির পাশেই শ্রীবিষ্ণুপদ চ্যাটার্জি বয়স ৪০-এর কোঠায়—অকৃতদার। মুখার্জি ও চ্যাটার্জি উভয়েই কানে বেশ খাট। সবচেয়ে উপভোগ্য হত যখন রাত্রের শয়নোপযোগী স্থানে তু'জনেব শোবার অসুবিধা নিয়ে কথা-কাটাকাটি শুরু হত—একজনে এক কথা বলে তো অন্যজনে তার উত্তর দেয় অন্যরূপ ; মূল বিষয় বস্তুর সঙ্গে হয়তো তার কোন সম্পর্কই নাই—এভাবে ঘটনাটি যতো দীর্ঘস্থায়ী হতো যাত্রীদের উপভোগের মাত্রাও যেত ততো বেড়ে। এ সব সত্ত্বেও ভালবেসেছিলাম মুখার্জিকে—তার সরলতার জন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে আশ্রয়লাভের জন্য। চ্যাটার্জিবাবুর পার্শ্বেই জানালার ধারে শ্রীধীবেন্দ্রনাথ মাহাতো বিপত্নীক, বয়স ৬০-এর উর্ধ্বে। রাত্রি ৪।৪-৩০টার মধ্যে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করতেন গামছা পরে। তারপর রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিয়ে জপে বসতেন ও জপান্তে গীতাদি পাঠ করতেন। মাহাতোবাবুকে অনুসরণ ক'রে বিষ্ণুবাবুও ঐরূপভাবে পাঠ ও জপাদি শুরু করে দিলেন রাত্রি ৪।৪-৩০টায়। তাঁর সোচ্চার গীতাদি পাঠের ফলে ঐসময় অনেকের ভোরের আমেজী ঘুমের ব্যাঘাত ঘটত ; এ সম্বন্ধে অজ্ঞাতসারে কেউ কোন মন্তব্য করেছিলেন কিনা জানি না। তবে তু'একদিন পরেই ঐরূপ সরব পাঠাদি বন্ধ হয়েছিল, মনে আছে। আচার, অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ এসব ধর্মের গৌণ অংশ। অথচ দেখা যায় সাধারণ মানুষ ধর্ম অর্থে এগুলির আচরণেই সন্তুষ্ট থাকে এবং ধার্মিক বলে পরিচিতি

লাভ করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে ধর্মের মুখ্য অংশ হল আত্মসংযম ও আত্মজ্ঞানলাভ। মাহাতোবাবুর উপরের বাঙ্কে নওগাঁ হতে আগত শান্তিরঞ্জন দাস। স্বল্পভাষী, সহজ, সরল, গ্রাম্য মানুষ। পথে বহু কাজকর্মে তাঁর যে সাহায্য পেয়েছি তা ভুলবার নয়।

বেদান্ত মঠের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ গুরুভ্রাতা স্বামী সদাত্মানন্দজী ও আমি দেড়টি সংরক্ষিত আসনের অধিকারী। পুরো একটা সীট্ সদাত্মানন্দজীর—বাকীটা আমার। রাত্রি ৯টার পূর্বে অন্য একটি বেঞ্চ জোড়া দিয়ে পুরো করে নিই আমাবটি। অর্থাৎ একটি বেঞ্চের একদিকে দু'জনে মাথা বেখে বিপরীত দিকে পা দুটো রেখে শয়ন করি। বিগত ৩০ বৎসর যাবৎ যেমন একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র রয়ে গেছে তাঁর সঙ্গে মঠে যাতায়াতের মাধ্যমে আমাদেব আচার্যদেবের জীবদ্দশা হতেই তেমনি এখানেও সে যোগসূত্রটি ছিন্ন হয় নি। মিতভাষী ও অমায়িক প্রকৃতির মানুষ তিনি। কামরাটিব সকল সহযাত্রীই এজন্য তাঁকে একটি ভক্তি-মিশ্রিত ভালবাসা দিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। মাহাতোবাবুব একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল তাঁর প্রতি। এখানেও সদাত্মানন্দজী মঠের প্রথাগত অভ্যাসমত নিরলসভাবে লিখে চলেছেন বহু পত্রাদির উত্তর। চিঠির বাক্স দেখলেই শান্তিবাবুর ও আমার অবশ্য কর্তব্য ছিল সেগুলি পোষ্ট করে দেওয়া—সেই সঙ্গে ডাকঘর দেখলেই কিছু পোষ্টকার্ড কিনে রাখা। এসব নানা কারণে সদাত্মানন্দজীর সঙ্গে রয়েছে একটি স্নেহ-মধুর সম্পর্ক। ফলে নানা আব্দার-অধিকারের প্রশ্নও তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে থাকায় যাত্রাপথের পাথেয়স্বরূপ যেসব সুরুচিকর খাদ্যদ্রব্য তিনি সঙ্গে এনেছিলেন তার ওপরও ছিল আমার একাধিপত্য। নারিকেলের নাড়ু থেকে শুরু করে—শ্রীনগরে গিয়ে সর্বশেষ সদ্ব্যবহার করেছি কলকাতার কড়া পাকের সন্দেশ। সত্যই শ্রীনগরে বসে কড়া পাকের সন্দেশ মুখে দিয়ে বেশ একটি তৃপ্তি ও আনন্দে মনটা ভরে উঠেছিল। সেই সঙ্গে এ আনন্দের অংশীদার করেছিলাম ম্যানেজার

বাদলবাবু ও এ্যাসিষ্টেন্ট ম্যানেজার অমরবাবুকেও। পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করার পর সন্দেশ বস্তুটির সাক্ষাৎ লাভ অন্যত্র দুর্লভ। স্বামী সদাত্মানন্দজী ও আমার মধ্যে এই মধুর সম্পর্কটি উপভোগ করে খুসী হতেন আমাদের সম্মুখস্থ সীটের বাসিন্দা সরলবাবু। মন্তব্য করতেন আপনাদের এই ভালবাসায় একটি স্বর্গীয় সুষমা আছে। হয়তো বা তাই—যা অলক্ষ্যে বেঁধে দিয়ে গেছেন আচার্যদেব স্বামী অভেদানন্দ। এইসব বিভিন্ন, বিচিত্র চরিত্র মানুষগুলির সঙ্গে আমরা চলেছি অমরনাথজী দর্শনে। শহর হিসাবে পাঠানকোট ভাল লাগেনি। অপরিচ্ছন্ন শহর। ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের কোন সজ্জা নেই। সুবিধার মধ্যে ষ্টেশনের কাছেই "কাশ্মীর টুরিষ্ট ইন্‌ফরমেশন্ ব্যুরো" —কাশ্মীরের সব তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা।

॥ পাঠানকোট—শ্রীনগরের পথে ॥

১৫ই আগষ্ট মধ্যাহ্ন ভোজনের পর জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের সৌখীন (ডিলুক্স) বাসযোগে পাঠানকোট হতে বেলা ১১টায় রওনা হয়ে গেলুম শ্রীনগরের পথে। পাঠানকোট হতে শ্রীনগরের দূরত্ব ২৪৯ মাইল। উচ্চতা ৫,২০০´ ফুট। যাত্রীরা সাধারণত কুদ্, বাটোট (বাতোত) কিংবা বাণিহালে রাত্রি যাপন করে থাকেন। দেড়দিনের পথ। এখন একদিনেও যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। পাঠানকোট হতে শ্রীনগরের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের সৌখীন (ডিলুক্স) বাস, কাশ্মীর পর্যটক বাস ও উত্তর রেলপথের আউট্ এজেন্সী বাসগুলি নিয়মিতভাবে যাতায়াত করে। এক-পিঠের একক ভাড়া—২২·৫০ পঃ, যাতায়াত একসঙ্গে ৩০-৪০ পঃ। স্থান-সংরক্ষণের জন্য পাঠানকোট পৌঁছিবার অন্তত এক সপ্তাহ পূর্বে মোট ভাড়ার ১৫% মনি অর্ডার যোগে জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের পরিবহন বিভাগের ম্যানেজারের নামে প্রেরণ করে পত্র দ্বারা তাঁকে স্থান-সংরক্ষণের জন্য অনুরোধ জানালে তিনি সব ব্যবস্থা করে থাকেন। পাঠানকোট হতে জম্মু

পর্যন্ত পথ প্রায় সমতল। শ্রীনগর পর্যন্ত সব পথটাই নির্মাণ করেছেন সামরিক বিভাগ। পথে লখনপুরের পর মাধোপুর হতেই সাথে সাথে চলেছে রাভী নদী। রাভী চীনাবে বা চন্দ্রভাগায় মিশেছে পাকিস্তানে। এই রাভীকে বেঁধে পূর্বগামী করা হয়েছে। জলরাশির বেগ এত প্রবল যে, দু'তিনটি খাতে এ'কে প্রবাহিত করার প্রয়োজন হয়েছে। বাস চলেছে উত্তর-পশ্চিম দিক ঘেঁষে। দক্ষিণ পার্শ্বে ছোট ছোট পাহাড়ের শ্রেণী। হু হু শব্দে বাস ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে পথে ধূলা আর কাঁকড় উড়ছে। ৪।৫ মাইলের ব্যবধানেই সেনানিবাস পড়ছে, এক একটি। এইসব সীমান্তরক্ষীরাই কাশ্মীরকে ধরে রেখেছে এখনও ভারতের মধ্যে। পথের দু'ধারে পরিচিত, অপরিচিত নানা জাতি বৃক্ষের সারি। তার মাঝে শিশু, আকন্দ ও নিমগাছগুলি চিনে নিতে বিলম্ব হয় না। এইসব গাছের ফাঁকে ফাঁকে মধ্যে মধ্যে দেখা যাচ্ছে রাভীকে। বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে জাতি-গত, ভাষাগত ও দৈহিক গঠনের একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও এই ধরিত্রীর সকল দেশের মৃত্তিকার মধ্যে যে একটি একত্বের সূক্ষ্ম যোগসূত্র অন্তর্লীন রয়েছে সেটি বুঝতে বিলম্ব হয় না যখন দেখি ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেরই বৃক্ষলতাদি ও রবিশস্যাদির মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্য।

সেকালে কাশ্মীর যাবার পথ ছিল অনেকগুলি। সাধারণত লোকে রাওলপিণ্ডি, মূরী, বারমূলা দিয়েই যেত। স্বামী বিবেকানন্দ ঐ পথেই গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় পথ হ'ল গুজরাটে নেমে ভীম্বর দিয়ে পীরপংজল গিরিসংকট অতিক্রম করে। তৃতীয় পথ ঝিলম শহরে অবতরণ করে পুঞ্চ দিয়ে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পথে কোন যান্ত্রিক যানবাহন বা মোটরপথ ছিল না। চতুর্থ পথ হুসানাবাদ—এ্যাবটাবাদ, মোটর চলার উপযুক্ত। এই চারিটি পথই এখন পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে। তাই পঞ্চম ও সর্বাধিক দুর্গম পথকে ভারত আজ প্রশস্ত করে নিতে বাধ্য হয়েছে। সে পথ পাঠানকোট

হতে জম্মু হয়ে বাণিহাল গিরিপথ অতিক্রম করে। আমরা এই পথেরই যাত্রী।

॥ জম্মু ॥

বেলা ১১টায় পাঠানকোট হতে রওনা হয়ে ৩টার মধ্যেই জম্মু এসে পৌঁছলুম। উঠলুম সরকারী ডাকবাংলায়—এখানেই চা-জলখাবার ব্যবস্থা করেছেন কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্তৃপক্ষ। পাঠানকোট হতে ৬৭ মাইলেব মধ্যে জম্মু, উচ্চতা ১০০০´ হাজার ফুট। জম্মুকে মন্দিরময় শহর বলা হয়। কারণ এই জম্মুতেই এককালে চীনাচারতন্ত্রের অনেক তাণ্ডব হয়ে গেছে। তাই জম্মুর আশে-পাশে এখনও তান্ত্রিক মঠ বা মঠের ভগ্নাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। প্রত্যাবর্তন পথে এখানেই আমাদের রাত্রিবাস।

॥ উধমপুর ॥

জম্মু হতে ৪২ মাইল দূরত্বের ব্যবধানে উধমপুর একটি বড় শহর ও ব্যবসাকেন্দ্র। উচ্চতা ২,২৪৮´ ফুট। এখান হতে বাণিহালের পথ one way (একমুখো)। তার প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়েছে। যখন সৈন্যবিভাগের জীপ্‌গুলি পিপীলিকার সারির মত আসতে থাকে —তখন বাস, ট্রাকগুলি শ'য়ে শ'য়ে বন্দী হয়ে পড়ে এই পথে। সৈনিক বিভাগের এই গাড়ীগুলি একে একে যতক্ষণ অতিক্রম করে না যায় ততক্ষণ সকল সরকারী বেসরকারী গাড়ীগুলিকে অপেক্ষা করতে হয়। এখানে বাজার, পোষ্ট অফিস টেলি-গ্রাফও অফিস, ছয়টি শয়নকক্ষ বিশিষ্ট একটি সরকারী ডাকবাংলা আছে।

॥ কুদ্ ॥

উধমপুর হতে কুদের দূরত্ব ২৪ মাইল—উচ্চতা ৫,৭০০´ ফুট। শ্রীনগর অপেক্ষাও উচ্চতা অধিক। বৈকাল ৪টায় জম্মু হতে রওনা হয়ে রাত্রি ৯-৩০ মিনিটে কুদে আমাদের বাসখানি থামল—৬৬ মাইল পথ অতিক্রম করে সরকারী ডাকবাংলাতে। এখানেই আমাদের রাত্রিবাস—ডাকবাংলার একাংশেই পর্যটক অফিস। কুদে শীতের প্রকোপ মন্দ নয়। স্থানটি গ্রীষ্মাবাসের উপযুক্ত। বসন্তে অপূর্ব শ্রী ধারণ করে। এখানে পোষ্ট অফিস, টেলিগ্রাফ অফিস আছে। পথের দু'ধারে সিদ্ধির বন—গন্ধে সারা পথ ভরপুর।

॥ বাতোত—রামবাণ ॥

১৬ই আগষ্ট সকাল ৭-৩০ মিনিটে চা-জলখাবার খেয়ে কুদ্ হতে রওনা হলুম। বাসখানি সর্পিল বাঁকাপথ বেয়ে উঠছে—গভীর নিম্নে পাইন্ গাছের বনের পর বন অতিক্রম করতে হবে তারই প্রস্তুতি-পর্ব। সামনে আসছে চেনাব বা চন্দ্রভাগা নদী। ৮-১৫ মিনিট মধ্যেই বাতোত অতিক্রম করে চলে এলুম। কুদ্ থেকে ১২½ মাইল পথ, উচ্চতা ৫,১৭০´ ফুট। এখানে একটি স্বাস্থ্য-নিবাস ও বহু শয়ন-কক্ষবিশিষ্ট ডাকবাংলা আছে। পোষ্ট অফিস, টেলিগ্রাফ অফিস এবং চিকিৎসালয় প্রভৃতি আছে। ডাকবাংলার একাংশেই পর্যটক অফিস।

বাতোত হতেই উৎরাই পথ শুরু। তীব্র ঢাল পার হতে হচ্ছে দ্রুতবেগে, ব্রেক্ টিপে টিপে। পদে পদে আঁকাবাঁকা ভঙ্গী। গভীর ছায়াঘন বন। ওধারে উঁচু পাহাড়। গভীর নালার কিনারা ধরে অবতরণ। সামনে চন্দ্রভাগা (চীনাব)। এই চন্দ্রভাগার তীরে তীরে রচিত হয়েছে ভারতের কত ইতিহাস। নদী গেছে এঁকেবেঁকে গভীর খাতের ভিতর দিয়ে। প্রচণ্ড সফেন নদী—কলতানে বয়ে চলেছে। চীর আর দেবদারু গাছের সারি—তার ঘন ছায়ায়

ঢাকা দক্ষিণ দিক। বাঁদিকে ধারে ধারে মোটর-মার্গ। লম্বা লম্বা কাঠের টুক্‌রো ভাসতে ভাসতে চলেছে—রামবাণের দিকে। সামনেই রামবাণ। সেখান থেকে ভাসতে ভাসতে যাবে আখনৌর শহরে।

বাতোত হতে রামবাণের দূরত্ব ১৭½ মাইল। উচ্চতা ২,২৫০´ ফুট। বেলা ৯-৩০ মিনিটে রামবাণে বাসখানি পৌঁছুল। এখানেও ডাক-বাংলা, পোষ্ট অফিস প্রভৃতি আছে। সামনেই রামবাণ পাহাড়।

॥ বাণিহাল ॥

রামবাণ হতে বাণিহালের দূরত্ব ২২ মাইল—উচ্চতা ৫,৬২০´ ফুট। বাণিহালের পথ কর্কশ ও বন্ধুর। বেলা প্রায় ১১টার মধ্যে বাণিহাল গিরিপথে এসে বাসখানি পৌঁছে গেল। পশ্চিমদিকে পড়ে রইল চন্দ্রভাগা বা চীনাব। আমরা চলেছি উত্তরদিকে। এখানে বর্ণনার কিছুই নাই। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এই পথ প্রথম নির্মিত হয়, তখন জনসাধারণ এ পথে চলাচল করতো না। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এ পথ। এখানে বহুকক্ষ-বিশিষ্ট ডাকবাংলা ও পোষ্ট অফিস আছে। ১৯৫৬ সালে 'জহর টানেল' নামে এখানে ভারতের একটি বৃহত্তম সুড়ঙ্গপথ নির্মিত হয়েছে। দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ মাইল। সুড়ঙ্গপথটি অতিক্রম করতে বাসখানির ১৫ মিনিট সময় লাগল। এই সুড়ঙ্গপথটি অপেক্ষাকৃত নীচু সমতলে নির্মিত হওয়ায় কাশ্মীর উপত্যকায় বৎসরের সকল সময়েই নিরাপদে যানবাহনাদি চলাচল করে। সুড়ঙ্গপথটির অভ্যন্তরে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে। কিছুটা অবতরণ করেই দিগন্ত বিস্তৃত বিরাট সমতল। এখানে সরু সরু পপ্‌লার আর এ্যাস্‌গাছ।

॥ আপার মুণ্ডা ॥

বাণিহাল হ'তে ২৯ মাইলের ব্যবধানে আপার মুণ্ডা, উচ্চতা ৭,২২৪ ফুট। পাঠানকোট হতে শ্রীনগরের পথে এইটিই সর্বোচ্চ স্থান।

এখানে তিনটি শয়নকক্ষবিশিষ্ট একটি ডাকবাংলা আছে। এখান হতে বাসখানি দক্ষিণে বাঁক নিলো—'লোয়ার মুণ্ডা'র পথে, বামে পড়ে রইল শ্রীনগরের পথ। বাণিহালের কর্কশ ও রুক্ষ মৃত্তিকার পর এখানে এক অভিনব দৃশ্য চোখে পড়ে—সরস, সরল, শ্যামলভূমির স্তর। এখান হতে ১৭ মাইল দূরত্বের মধ্যে 'ভেরীনাগ' ঝিলম্ বা বিতস্তার উৎপত্তিস্থল। বেলা ১টার মধ্যেই ভেরীনাগ পেঁাছে গেলুম্।

॥ ভেরীনাগ ॥

বাণিহাল গিবিপথেব উত্তব পশ্চিমদিকে একটি অর্ধোন্মুক্ত উপত্যকায় —পর্বতেব সানুদেশে শান্ত পরিবেশে অবস্থিত পরম রমণীয় উদ্যান-সংলগ্ন এই ভেরীনাগ প্রস্রবণ। কারও মতে শাহবাদ পরগণায় ভেব গ্রাম আছে তার থেকেই ভের নাগ নামের উৎপত্তি। কেউ বলেন নাগ শব্দেব অর্থ উৎস। সরীসৃপ গতিতে নদীগুলি প্রবাহিত হয় বলে এর উৎসকেও নাগ বলা হয়। এক সময় ভেরীনাগকে নীলনাগ ব'লেও অভিহিত করা হত। এ সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকাও আছেঃ "সতীন বলে গঙ্গাকে পার্বতী চিরকাল ঈর্ষা করে এসেছেন। তাই পার্বতীর সখ হলো তিনিও নদীরূপে ধরায় অবতীর্ণা হবেন, আব গঙ্গাব মত খ্যাতি লাভ করবেন। ছুতো পান কি কবে। তাছাড়া ঐ দিগম্বব ত্রিশূলধারীকে নইলেও তো চলবে না। শিবেব জটার ছোঁয়া পেয়েই তো গঙ্গার এত কৌলীন্য। এ কৌলীন্য তিনিই বা পান কোথা থেকে। হঠাৎ শুনলেন মরীচির ছেলে কশ্যপ কোথায় গিয়ে এক অপ্সরার সঙ্গে গোল বাধিয়ে নীল নামক এক ছেলেকে পাহাড়ের গুহায় রেখে এসেছেন। কশ্যপের ছেলে যে সে লোক নয়। অনেক জাতি, যাকে আমরা অনার্য বা এবরিজিনীস্ বলি এই শ্রীমান কশ্যপের গোলমালের ফল। এই নীলও এমনি একটা বংশের ছেলে সে বংশের নাম হলো নাগ বংশ। অনেকে মনে করেন ওরা

মধ্য এশিয়ার কোনও জাতি। এই বেচারী নীলনাগ একটা গুহায় বসে জপতপ আরাধনা করছে। তার উদ্দেশ্য পার্বতীর দর্শন পাওয়া। এত বড় একটা দেশ জলাভাবে মরে যাচ্ছে। নীল এখানে জল আনবেন তাই তপস্যা। বংশের লোকের বা পরলোকের জন্য নয়—তিনি তপস্যা করছেন ইহলোকের জন্য জগজ্জনের জন্য। পার্বতীও তো এটাই চাইছিলেন। তিনি নদীরূপে অবতরণের কথা শিবকে জানালেন। শিবতো শিব। পার্বতীর সেয়ানাপনা জানার তো বাকী নাই কিছু। মুচকি হেসে বললেন, "আচ্ছা চলো এগিয়ে, আমি আসছি"। পার্বতী ভাবলেন—ওঃ ডাকলাম বলে গুমোর। চললাম একাই। এলেন তো কল্ কল্ শব্দ করতে করতে। কিন্তু পাহাড় আর ভেদ করতে পারেন না। নীল নাগ তখন শঙ্করের স্তুতি আরম্ভ করলেন। ভক্তের ডাকে গিরীশ এলেন ত্রিশূল নিয়ে। পাহাড়ে মারলেন একটি ত্রিশূলের খোঁচা। গল্ গল্ করে বেরিয়ে এলো জল। তীর্থ হয়ে গেল জায়গাটা। পার্বতী বিতস্তারূপে পৃথিবীতে নেমে এলেন।"

আর ভূতত্ত্ববিদদের মতে এ জাতীয় জলনিঃসরণশীল বহু প্রস্রবণ রয়েছে কাশ্মীর অঞ্চলে। এই প্রস্রবণগুলির উৎপত্তির কারণ কাশ্মীর উপত্যকার চতুষ্পার্শ্ব তুষারাচ্ছন্ন সুউচ্চ পর্বতবেষ্টিত থাকায় ভূগর্ভে জলশোষণহেতু এই প্রস্রবণগুলির উৎপত্তি। এই ভেরীনাগ প্রস্রবণটি উদ্যানের উচ্চপ্রান্তে ছায়া-ঘন পাইনবৃক্ষ শোভিত ৫৪´ ফুট গভীর একটি অষ্টভুজ জলাধারের নিম্নে অবস্থিত। জলাধারটির স্থির সুনীল জল—অদ্ভুত এর বর্ণ যেন তুঁতে গোলা। হরিদ্বারের গঙ্গার মত জলের নীচে সুবৃহৎ মৎস্যগুলি সঞ্চরণশীল।

জলাধারটির অপূর্ব দৃশ্য থেকে চোখ ফেরান যায় না। এজন্য সীতেনবাবু ও আমি দু'বার জলাধারটি পরিক্রমণ করে দেখেছি এবং সে সময় জলাধারটির দেওয়ালগাত্রে উৎকীর্ণ যে দুটি শিলালিপি দেখেছি—তা হল :

"অজ জহাঁগীর শা ঈ আকবরশা
ইন্ বিনা সর্ কসিদা বর্ অফলাক্
বণি-এ-অকল্ য়্যাফ্‌ত তারিখাশ্‌
কসর্ অবদ্ ও চশ্মা-ই-ভরনাগ্‌।"

দেখ, দেখ, আকাশ লক্ষ্য করে এই অট্টালিকা উঠেছে আকবর-পুত্র জহাঁগীরের অনুগ্রহে। লেখক বুদ্ধিবলে এর সন তারিখ লিখে গেল। ভেরীনাগ প্রস্রবণের বাড়-বাড়ন্ত হোক।

অপরটি—

"হয়দর ব হুকুম শাহ্‌জহাঁ বাদশাহী দহর্‌
শুক্‌র এ খুদা কি সখত্‌ জুনিন অবসর্ জুই
ইন্ জ্ই দাদা অস্ত্‌জী জুয়ে বহিস্তয়াদ্
জিন্ অবসর য়াফতা, কাশ্মীর অব্‌ রুই
তারীখ ই জুই গফ্‌ত বা গোশম্ সরোষ ই গ্যয়ং
অজ্‌চশ্মা ই বিহিস্ত বিরুন্ অমাদস্ত্‌জুই।"

ভগবানের জয় হোক, ধন্যবাদ তাঁকে। সামান্য হায়দার অসামান্য এর ঝর্ণা তৈরীর কাজে বাদশাহ শাজাহানের কথায় নিযুক্ত হলো। স্বর্গের ঝর্ণার সমতুল এই ঝর্ণা যে শিল্প দিয়ে সাজানো হলো, কাশ্মীরের পক্ষে হয়ে রইলো তা গৌরব। এই ঝর্ণা তৈরীর তারিখ বলে গেল কোন্ অদৃশ্য শক্তি আমার কানে কানে—'এই ঝর্ণা স্বর্গের জল বয়ে আনছে'।

জলাধারটির এই স্থির জলই প্রবল বেগে ২।৩ ফুট গভীর একটি খাতের মধ্য দিয়ে হুড় হুড় শব্দে প্রবাহিত হয়ে উদ্যানপ্রান্তস্থ একটি সুগভীর গহ্বরে সরবে পতিত হয়ে ঝিলম বা বিতস্তা নদীর সৃষ্টি করছে। অষ্টভুজ এই জলাশয়টির সমগ্র দেওয়াল ও জলাধারের নির্মাণকার্য শুরু করেন জাহাঙ্গীর ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে এবং সমাপ্ত হয় শাজাহানের রাজত্বকালে। অধুনা এটি জলসেচের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। উক্ত জলাশয়টির জলধারা অন্য একটি অগভীর খাতে প্রবাহিত করে

জলের ধারা চিরে চিরে পরিপাটি করে ফলেফুলে সজ্জিত এই উদ্যান। জনসাধারণ উক্ত জলধারায় স্নানাদি সম্পন্ন করতে পারেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের প্রাক্কালে অপেক্ষাকৃত উক্ত অগভীর খাতে প্রবাহিত জলে সংক্ষেপে স্নান সেরে নিলুম। প্রকৃতির অফুরন্ত লীলাবৈচিত্র্যের মধ্যে ভেরীনাগ প্রস্রবণ অন্যতম। অপরদিকে মানব ও প্রকৃতির যুগ্ম প্রচেষ্টায় এই পার্থিব জগতে কেমন করে সৃষ্টি হতে পারে অপার্থিব সৌন্দর্য ভেরীনাগ-উদ্যান তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পুষ্পপল্লবশোভিত ভেরীনাগ-উদ্যানে, নগরীর কর্মকোলাহলমুক্ত শান্ত পরিবেশে উন্মুক্ত অম্বরতলে, সুবৃহৎ চিনার বৃক্ষছায়ায় শ্যামল তৃণাসনে উপবিষ্ট হয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনের পালা শেষ হল। স্মৃতিপথে উদিত হল সভ্যতার উষালগ্নে স্রোতস্বতী তীরে সামগান-মুখরিত তপোবনে উদ্‌যাপিত নিরাবরণ ও নিরাভরণ এক জীবনযাত্রার কথা। চমক ভাঙল— এ্যাসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার অমরবাবুর ডাকে "যাবার সময় এল"। ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হলুম সরকারী পরিবহনটির দিকে, মনে মনে আবৃত্তি করতে করতে:

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর"

জানি, আজকের দিনে মানুষের কাছে এ আবেদন কত তুচ্ছ, কত ব্যর্থ। কিন্তু ভেরীনাগ বেঁধে রেখেছে প্রাচীন ও নবীনকে যুগপৎ অক্ষয় রাখীবন্ধনে। বেলা ২-৩০ মিনিটে শ্রীনগরের পথে চলতে শুরু করল আমাদের সরকারী পরিবহনটি।

॥ কাজীগান্দ ॥

ভেরীনাগ হতে ২-৩০ মিনিটে রওনা হয়ে ১৯ মাইল পথ অতিক্রম করে আপার মুণ্ডার সংযোগস্থলে পৌঁছে বাঁদিকে শ্রীনগরের পথ ধরে বাসখানি একেবারে কাজীগান্দ পৌঁছল বেলা ৩-৩০ মিনিটে। আপার মুণ্ডা হতে কাজীগান্দ ১০ মাইল পথ, উচ্চতা ৫,২২৫´ ফুট। পথের দু'ধারে আপেল, চেরী ও আখরোটের দোকান। এখানে

আমাদের বাসখানি প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করল ধোয়া-মোছার জন্য। সেই অবকাশে অনেকেই আপেল, আখরোট, চেরী প্রভৃতি ক্রয় করে নিলেন। এখান হতে ১২ মাইল অগ্রসর হলেই খানাবল। খানাবল হতেই অনন্তনাগ, আচ্ছাবল, পাহালগাম্ ও কোকরং যাবার মোটর রাস্তা বেরিয়ে চলে গেছে। আমাদেব বাসখানি শ্রীনগরের পথ ধরে চলতে লাগল।

॥ অবন্তীপুর ॥

কাজীগান্দ হতে অবন্তীপুর ৬ মাইল পথ—উচ্চতা ৫,৫২৫´ ফুট। বিখ্যাত রাজা অবন্তী বর্মণের রাজধানী। তিনি রাজা হন ৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ও তাঁর মন্ত্রী যে দুটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন তাদের একটির নাম অবন্তীশ্বর-শিবমন্দির, অপরটি অবন্তী-স্বামী বিষ্ণুমন্দির। বহু পর্যটক ও শিল্পী বিষ্ণুমন্দিরের কারুশিল্পের প্রশংসা করে গেছেন। পাহালগাম্ যাবার পথে এব ধ্বংসাবশেষ দূর হতে দৃষ্ট হয়। পথে ছোট ছোট নালা বেয়ে জল বয়ে যাচ্ছে। পাশে লম্বা লম্বা পপ্‌লার দুলছে। জলে গাছের ছায়া পড়ছে। জলটা বয়ে যাচ্ছে সবেগে—মনে হচ্ছে স্থির। এ অঞ্চলে জলের বেগ দূর হতে বোঝা কঠিন। ভেরীনাগ থেকে ঝিলম (বিতস্তা) বয়ে যাচ্ছে শ্রীনগরের দিকে। নদীর পাশে পাশে পথ।

॥ পাম্পুর ॥

অবন্তীপুরের দশ মাইল ব্যবধানেই পাম্পুর—পূর্বে যার নাম ছিল পদ্মপুর। পদ্মেশ্বর স্বামীর বিরাট বিষ্ণুমন্দির ছিল এখানে। রাজার নাম ছিল বৃহস্পতি, খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ইনি রাজত্ব করেছিলেন এখানে। তাঁর মন্ত্রীর নাম ছিল পদ্ম, তিনিই বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করেন। সেকালেও এই পাম্পুরে হত জাফ্‌রাণের চাষ। এখনও এখানে প্রচুর জাফ্‌রাণের চাষ হয়। পূর্ণিমা রাতে যখন জাফ্‌রাণ

পুষ্পগুলি প্রস্ফুটিত হয় তখন এই ক্ষেত্রগুলি অপূর্ব শ্রী ধারণ করে। এখন এই জাফ্‌রাণই পাম্পুরের পুরাতন স্মৃতির ছায়া। সে হিন্দু রাজাও নাই, সে মন্দিরও নাই, বিগ্রহও নাই। আছে পাম্পুরের কঙ্কাল। এখান হতে শ্রীনগর মাত্র ৯ মাইল।

তিন

॥ শ্রীনগর ॥

১৬ই আগষ্ট বেলা ২-৩০ মিনিটে ভেরীনাগ হতে রওনা হয়ে, গাজীগান্দ, অবন্তীপুর ও পাম্পুর অতিক্রম করে ঝিলমের দু'ধারে নগরীর সৌধ দেখতে দেখতে বৈকাল ৫টার মধ্যে দাল হ্রদের তীরে বুলেভোর্দে এসে পৌঁছলুম। সামনেই নেহেরু পার্ক। ঝিকিমিকি বেলা—দালের জলে অস্তরবির রশ্মি পড়ে অপরূপ দেখাচ্ছে। একধারে উঁচু পাহাড়—তার গায়ে সরু সরু পপ্‌লারের চারা, অন্যদিকে ঐতিহাসিক বৃক্ষ চিনার—আকবরের দান। জলের নীচে শৈবালজাতীয় রাশি রাশি উদ্ভিদ। দালের নীচেই ঝিলম। দাল আর ঝিলমকে বাঁধ দিয়ে আলাদা করা হয়েছে। বাঁধের ওপর দুটো গেট্। প্রয়োজন বোধে গেট্ খুলে জল এদিক ওদিক করা যায়—সেই সঙ্গে দালের নৌকা ঝিলমে আর ঝিলমের নৌকা দালে চলে আসে। ব্যবসাবাণিজ্যও চলে অবাধে পণ্যতরীর যাতায়াতে। দালের তীরে তীরে বাঁধা সব হাউসবোট। না দেখলে এই হাউসবোট সম্বন্ধে ধারণা করা দুরূহ। ড্রইং রুম, দু'তিনটি শয়নকক্ষ, বাথরুম, ডাইনিং রুম, কোন কোনটিতে নাচঘর—এসব সজ্জা নিয়ে হাউস বোট। এগুলি একস্থানে স্থির থাকে। চলাফেরা করে না। আমরা যখন শ্রীনগরে পৌঁছি তখন সেটা হাউসবোটের মরশুম নয় তাই কোন যাত্রী ছিল না। মালিকরা সপরিবারে নৌকার রান্নাঘরের ভিতর বাস করছে আর অবকাশমত স্ত্রী-পুরুষ সকলেই গড়গড়া টানছে। বোধ হয় এটি কাশ্মীরের এক-চেটিয়া অভ্যাস। অভিজাত বংশের মহিলাদের মধ্যেও এর প্রচলন দেখেছি কয়েকদিন শ্রীনগরে বাস করে। বোটের কাজও চমক্ লাগায়। পাইন আর দেবদারুর পাতলা কাঠ দিয়ে নানারকমের নক্‌সা, বাইরে ছোট রেলিং, সেই রেলিং-এর ধারে মরশুমী ফুলের টব।

এই সব নৌকা শ্রীনগরের ঐশ্বর্য—এ দিয়ে পর্যটকদের কাছে অর্থশোষণ ও বিলাসী মনের তৃষ্ণা নিবারণ হয়। আশপাশেই নৌকায় বেচা-কেনার সামগ্রী। যাবতীয় সামগ্রী নিয়েই ভেসে বেড়ায় সাল্‌তি জাতীয় ছোট নৌকাগুলি, কাশ্মীরী পাথর, জাফরাণ ও অন্যান্য বিলাস-ব্যসনের দ্রব্য থেকে শুরু করে শাল-আলোয়ান, তরি-তরকারী, বাঁধাকফি, বীট্‌-গাজর, টমাটো ও আলু্‌ পেঁয়াজ পর্যন্ত। শ্রীনগরের এক-তৃতীয়াংশ বাসিন্দাই থাকে এই হাউসবোটে হয়ত দারিদ্র্যতার জন্যই। শ্রীনগবের ছেলেমেয়েরা সকলেই আশ্চর্য রকমের সুন্দর-সুন্দরী। সুন্দর বলতে যা বোঝায় তা কাশ্মীরে (শ্রীনগরে) না এলে ধারণা কবা কঠিন। তবে শহর ও শহরতলীর মানুষ উভয়েই নোংরা। শহর যেমন ধূলি-ধূসরিত মানুষের জামা কাপড় ও বিছানার মধ্যে নেই কোন পরিচ্ছন্নতা। বাস থেকে নেমে, নেহেরু পার্কের সামনেই দালেব যে গেট, সেখানে এসে দাঁড়িয়ে আছি নৌকার আশায়। যাব লীওয়ার্ড হোটেলে (Leeward Hotel)। সাল্‌তির মত হয়তো বা একটু বড়, চারিদিকে ঝালর ও স্প্রীং দেওয়া ছিটের কাপড় ঢাকা গদি, পেছনে হেলান দেবার ব্যবস্থা, নানা ইংরেজী নামে ভূষিত নৌকাগুলি নিয়ে দল বেঁধে ছুটে এল মাঝিরা হরতনের মত বৈঠা বেয়ে। এগুলোর নামই শিকারা। আমরা দুটি সাধারণ নৌকা করেই ৪০ জন যাত্রী লীওয়ার্ড অভিমুখে যাত্রা করলুম—দু'চোখ ভরে দালের সজ্জা দেখতে দেখতে। বৈকাল ৫-৩০ মিনিট মধ্যে লীওয়ার্ড হোটেলে এসে পৌঁছে গেলুম। আমাদের ৪ জনের জন্য (স্বামী সদাত্মানন্দ, কল্যাণানন্দ ও শান্তিবাবু) নির্দিষ্ট ঘরটিতে আপন আপন হোল্ডঅল্‌ খুলে বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলুম। ইতিমধ্যে কুণ্ডু স্পেশ্যালের নিয়মিত বৈকালিক চা-জলখাবার এসে গেল। সেগুলির সদ্ব্যবহার করে সকলে বিশ্রাম করতে লাগলুম।

বিস্তীর্ণ হ্রদ ও সুউচ্চ পর্বতমালা বেষ্টিত, ছায়া-ঘন চিনার ও পাইন

বনানী শোভিত তুষারাচ্ছন্ন হিমালয় ক্রোড়ে ৫,২০০´ ফুট উচ্চ একটি উপত্যকায় ঝিলম্ নদীর তুই তীর বরাবর ঘর-বাড়ী সজ্জিত কাশ্মীরের রাজধানী এই শ্রীনগব। ফুল ফল আর নরনারীর অপরূপ সৌন্দর্যে ভরা কাশ্মীর সত্যই স্বর্গতুল্য। এই নগরীর জনসংখ্যা ২,৮৫,২৫৭। শীতের প্রকোপ থাকে মে মাস হতে অক্টোবর পর্যন্ত যথাক্রমে ৫২,৫৭,৬৪,৬৩ ও ৪১ ফাঃ হিঃ। নেহেরু পার্কের নিকটে, দালের বুকে মবশুমী পুষ্পশোভিত প্রাঙ্গণপ্রান্তে বহু কক্ষবিশিষ্ট দ্বিতল গৃহ—হোটেল লীওয়ার্ড (Leeward)। এখানেই এক সপ্তাহ আমাদের অবস্থিতি (১৬-৮-৪১—২২-৮-৫২)। কোন অবসর মুহূর্তে এই লীওয়ার্ডের চত্বরে দাঁড়িয়ে চেয়ে চেয়ে দেখেছি—দালে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও কিশোর-কিশোরীদের অবিরত সাল্তি বেয়ে যাওয়া-আসা। কখন বধূরাও চলেছে সাল্তি বেয়ে, অবশ্য এরা অভিজাত বংশের নয়। দেখেছি কাশ্মীরী বধূদের পোশাক—আগাগোড়া আলখাল্লায় ঢাকা—মাথায় একটা কাপড় কপালের ওপর দিয়ে বেঁধে মাথার পেছনে গোঁজা। স্বল্পবয়সী বা কিশোরীদের গায়ে আলখাল্লা নেই—তবে মাথায় একটা রুমালজাতীয় কিছু ঐ একইভাবে বাঁধা। কানে কাশ্মীরী পাথরের তুল। সাল্তি বেয়ে পারাপার করছে। নিত্য প্রয়োজনীয় যা-কিছু সবই নিয়ে যাচ্ছে-আসছে। পারে যাবার সময় হলে ছোট ছেলেরা দল বেঁধে হাজির হচ্ছে সাল্তি নিয়ে পার করার জন্য।

শ্রীনগর প্রাচীন শহর। এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা দ্বিতীয় প্রবর সেন ৭২. খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাশ্মীর হতেই শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। শ্রীনগর এশিয়ার ভেনিস্ নামে পরিচিত। ভেনিস্ নগরীর সর্বত্র যেমন 'গণ্ডোলা'য় করে নদীপথে যাতায়াত করা যায় শ্রীনগরেও সেইরূপ সাল্তি করে একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত যাতায়াত করা যায়।

শ্রীনগরের অল্প শীতের আমেজে, দালের তীরে লীওয়ার্ডের শান্ত

পরিবেশে, কয়েকদিনের ট্রেন ও বাসযাত্রাব শ্রান্তিতে সুখনিদ্রায় রাত্রি কেটে গেল। শ্রাবণী-পূর্ণিমায় দর্শনার্থীদের আর একদল কুণ্ডু স্পেশ্যালের যাত্রী ১৩ই আগষ্ট পাঠানকোট এক্সপ্রেসে শিয়ালদহ হ'তে রওনা হয়ে পূর্বাহ্নেই লীওয়ার্ড হোটেলে পৌঁছে গেছেন। দুটি যাত্রীদলের লোকসংখ্যা এখন সর্বসমেত ৯০ জন। এতগুলি লোকের খাদ্যসরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা করছেন দু'জন ম্যানেজার ও দু'জন এ্যাসিষ্টেন্ট ম্যানেজার সহ প্রায় ২০ জন অনুচর। শ্রীনগরে খাদ্য ব্যবস্থা আমিষ ও নিরামিষ দু'রকমই ছিল। আমরা পাঁচজনে যাত্রাকালে নিরামিষভোজী ছিলাম। নৈশ ভোজনের সময় ম্যানেজার কিংবা এ্যাসিষ্টেন্ট ম্যানেজার শ্রীনগর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দর্শনীয় বস্তুগুলির একটি সফর-সূচী ঘোষণা করে নির্দিষ্ট সময়ে প্রস্তুত থাকার জন্য নির্দেশ দিতেন যাত্রীদেব। আমরা যথাসময়ে প্রস্তুত থাকলেও অনেকের পক্ষেই বিঘোষিত সময়েব মধ্যে যাত্রা করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে মহিলাদের সজ্জাতিশয্যই বিলম্বের কারণ। শ্রীনগরে অবশ্য-দর্শনীয় বস্তুগুলি হল: মুঘল উদ্যানসমূহ, নিকটবর্তী হ্রদগুলি, শঙ্করাচার্য মঠ, হরিপর্বত দুর্গ ও সংগ্রহশালা, জামা মস্‌জিদ, পাথর মস্‌জিদ, শা হাম্‌দান মস্‌জিদ, হজরৎবল, সেণ্ট্রাল মার্কেট, হারওয়ান জলাধার—যেখান হ'তে সমগ্র শ্রীনগর শহরে জল সরবরাহ করা হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীনগর হতে স্বল্প দূরে ও দূরবর্তী অঞ্চলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দর্শনীয় স্থানগুলি হল: ক্ষীরভবানী, সোনমার্গ, গুলমার্গ, ভেরীনাগ ও খিলানমার্গ প্রভৃতি।

॥ ক্ষীরভবানী ॥

১৭ই আগষ্ট বেলা ৯টার মধ্যেই জলযোগ সেরে ক্ষীরভবানী দর্শনে রওনা হয়ে গেলুম দু'খানি বাসভর্তি যাত্রী। ক্ষীরভবানী হতে ৩ মাইল দূরত্বের ব্যবধানে গন্দরবল হ্রদের পাশ দিয়ে একেবারে ১০টায় ক্ষীরভবানী পৌঁছলুম। দূরত্ব ১৬ মাইল—এক ঘণ্টার পথ। টিলার

বৃক্ষশোভিত বিরাট প্রাঙ্গণ বা চত্বর। চত্বরটির চারপাশ গাঙ্গখাই নামে পয়োনালা দ্বারা বেষ্টিত—গোলাকার। কথিত আছে এখানে ৩৬০টি প্রস্রবণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল কিন্তু এগুলির অধিকাংশই আজ বিস্মৃতির অন্তরালে। অবশিষ্টগুলি পলি মাটি ও নলখাগড়ায় পূর্ণ।

কাশ্মীর অতি প্রাচীনকাল হতেই ঋষিভূমি নামে খ্যাত। চারিদিকে উচ্চ পর্বতসমূহ থাকায় অপর দেশসমূহ হতে বিচ্ছিন্ন এই দেশের নিজস্ব একটি ভাষা, সাহিত্য, দর্শন ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত তুষারমণ্ডিত সুউচ্চ পর্বত কাশ্মীর ও শ্রীনগরের চতুষ্পার্শ্বে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকায় বহু প্রস্রবণ সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এ অঞ্চলে এসব প্রস্রবণ দেবদেবীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। এমনি একটি উৎসর্গীকৃত প্রস্রবণ ক্ষীরভবানী। এই প্রস্রবণটি যেস্থানে অবস্থিত তার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলটির নাম হল 'তূলামূলা' এবং এই তূলামূলা স্থানটি জলাভূমিতে ভাসমান একটি উদ্যান বা দ্বীপ বিশেষ। ক্ষীরভবানী প্রস্রবণটির আবিষ্কার ও উদ্ভব সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী আছে, তার মধ্যে বহু প্রচলিত কিংবদন্তীটি হল :

কৃষ্ণদত্ত নামে এক ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণকে এক দেবদূত স্বপ্নাদেশ দেন যে, তূলামূলা জলাভূমির মধ্যে রয়েছে ক্ষীরভবানী প্রস্রবণ। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন : কিভাবে সেটি আমি আবিষ্কার করতে সক্ষম হব ? উত্তর এল—শাদীপুর পর্যন্ত একটি নৌকা ভাড়া করে যাবে সেখান হতে একটি সাপ তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। যখন তুমি প্রস্রবণটির নিকটবর্তী হবে তখন সাপটি যেখানে ঝাঁপিয়ে পড়বে সেটিই ক্ষীরভবানী প্রস্রবণ জানবে। পথযাত্রার নির্দেশমত ব্রাহ্মণ নির্দিষ্ট স্থানটিতে উপস্থিত হলে একটি সাপ তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে যেস্থানে ঝাঁপ দিল—ব্রাহ্মণ সেই প্রস্রবণটিতে সঙ্গে আনীত দুগ্ধ, চাউল, শর্করা, কিস্‌মিস্, খেজুর, নারিকেল এবং পুষ্প সব কিছুই বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ সহ নিক্ষেপ করলেন। তারপর ব্রাহ্মণ উক্ত প্রস্রবণটি হতে দেবীর রূপ ও মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক একটি

সংস্কৃত শ্লোক প্রাপ্ত হলেন। পরবর্তী কালে উক্ত শ্লোকে যতগুলি অক্ষর আছে ততগুলি স্তবকে দেবীর স্তোত্র রচনা করলেন যা আজও বর্তমান। প্রথম শ্লোকটি হল :

যা দ্বাদশার্ক পরিমণ্ডিত মূর্ত্তিরেকা
সিংহাসন স্থিতিমতীমূরগৈ বৃতাং চ
দেবীং অনন্যগতি, রিপুবরতাং প্রপন্নাং
তাং নৌমিভর্গবপসং পরমার্থরাজীম্।

অর্থাৎ যিনি আমার একমাত্র আশ্রয় সেই সিংহাসীনা সর্পালঙ্কার-ভূষিতা দ্বাদশ অর্ক পরিমণ্ডিতা ব্রহ্মলীনা মুক্তি প্রদায়িনী কান্তিময়ী দেবীকে প্রণাম জানাই। এইভাবে দেবী ক্ষীরভবানীর আবির্ভাব হল। ধীরে ধীরে সমগ্র কাশ্মীরবাসী উক্ত স্থানটির মাহাত্ম্য জ্ঞাত হল এবং তাঁকে পূজা নিবেদনের জন্য সমবেত হতে লাগল। ঘটনাটি ৩৭৫—৭০ খ্রীঃ পূঃ অব্দের বলে অনুমান করা হয়। তখন গোপাদিত্যের রাজত্বকাল। প্রস্রবণটি সপ্তকোণ বিশিষ্ট অসম আকারের। উত্তর ও দক্ষিণ দিক পশ্চিমদিক অপেক্ষা দীর্ঘ—এটি মস্তক ও পূর্বদিককে পদ বলে অভিহিত করা হয়েছে। মধ্যস্থল একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের মত—পূর্বে সেখানেই মন্দির ছিল। স্বর্গত মহারাজা প্রতাপ সিং কর্তৃক এটি পুনর্নির্মিত হয়েছে। বর্তমান মন্দিরটির নিম্নাংশে—প্রস্রবণটির জলের শেষ সীমা হতে প্রায় আধ হাত উচ্চে প্রাচীন মন্দিরের অংশবিশেষ দৃষ্ট হয়। ভক্তগণ কর্তৃক দেবীর উদ্দেশে প্রদত্ত ক্ষুদ্র রৌপ্য-পতাকা ও রজত-ছত্রাদি মন্দিরাভ্যন্তরে সজ্জিত। ক্ষীরভবানীর ন্যায় এরূপ রহস্যময়ী প্রস্রবণ ভারতের অন্য কোথাও নাই।

প্রস্রবণটির বৈশিষ্ট্য হল জলের বর্ণ পরিবর্তন। তবে কোন নির্দিষ্ট ক্ষণ বা বিশেষ সময়ে এই পরিবর্তন ঘটে না। জম্মু ও কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌগোলিক শিক্ষা সংসদের সদস্য শ্রীশমসারচাঁদ কাউল বলেন যে, তিনি এই জলের বর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন—;

ইহা কখন গাঢ় রক্তবর্ণ, কখন ঈষৎ রক্তাভ, কখন ফিকে শ্যামবর্ণ, কখন কমলালেবুর মত হরিদ্রাভ, কখন দুগ্ধেব ন্যায় শুভ্র, কখনবা ধূম্রাভ এবং শুভ্ররূপ ধারণ করে। এই জলের রং কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করলে তা অশুভ লক্ষণ সূচিত করে। এতদ্ব্যতীত তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, প্রস্রবণটি হতে ত্রিধারায় বুদ্ধুদ উত্থিত হয় এবং এখানে সেখানে নিখুঁতভাবে উত্থিত হলেও একই সময়ে বলয়াকৃতি ধারণ করে না। প্রত্যেক দেবীর একটি করে যন্ত্র বা চক্র আছে। ক্ষীরভবানী দেবীর যে চক্র বা যন্ত্র আছে তার সাতটি অংশ একে অপরের দ্বারা অবরুদ্ধ। এই অবরুদ্ধ অংশের ষষ্ঠ স্তরে যে ত্রিবলয় আছে উহাই প্রস্রবণটিতে বুদ্বুদাকারে উত্থিত হয়। এই যন্ত্রাকারে নির্মিত প্রস্রবণ মধ্যস্থ বেদি-কোপরি দেবীমূর্তি অধিষ্ঠিতা।

জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লা অষ্টমীব দিন এই দেবীর উদ্দেশে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং বহুলোক ক্ষীর, কিস্‌মিস্‌, নারিকেল প্রভৃতির দ্বারা দেবীর অর্চনা করেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাতি দ্বারা অনেকে প্রস্রবণটির চতুর্দিকে আবাত্রিক করেন এবং প্রার্থনা-মন্ত্রোচ্চারণ দ্ব'রা সমগ্র ভক্তমণ্ডলী সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভক্তিগদগদ চিত্তে দেবীমূর্তির প্রতি একাগ্রচিত্ত হয়ে তাঁব মাধ্যমে মনকে জগৎ-কারণে লয় করার চেষ্টা করেন। এই স্থানটির চতুষ্পার্শ্বস্থ অধিবাসী হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে সকলেই দেবীকে গভীর ভক্তি করে থাকেন। মুসলমানরা শুদ্ধবস্ত্রে নিরামিষাশী হয়ে এই দেবীকে দর্শন করেন। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের অধিকাংশেরই রক্ষাকর্ত্রী দেবী ক্ষীরভবানী।

এ হেন রহস্যময়ী দেবীর অঙ্গণ-চত্বরে প্রবেশকালে মন যেন কেমন ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে মনে এল স্বামী বিবেকানন্দের ক্ষীরভবানী দর্শনের অলৌকিক স্মৃতি। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস—নিবেদিতা সহ কয়েকজন পাশ্চাত্য শিষ্যা সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ কাশ্মীর ও অমরনাথ দর্শনে যাত্রা করেন। ক্ষীরভবানী দর্শনে যাত্রার দিন তিনি কিন্তু তাঁদের সকলকে পশ্চাদনুসরণে নিবৃত্ত করে একাকীই

ক্ষীরভবানীর পবিত্র প্রস্রবণতটে উপস্থিত হলেন এবং প্রত্যহ প্রভাতে এক মণ দুগ্ধের ক্ষীর, আতপান্ন ও বাদাম প্রচুর পরিমাণে জগজ্জননীর উদ্দেশ্য উৎসর্গ করে তপস্যায় ব্রতী হলেন। স্থানীয় জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুমারী কন্যাকে প্রত্যহ শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী পূজা করতে শুরু করলেন। একদিন প্রজ্বলিত হোমাগ্নি সম্মুখে যোগাসনে উপবিষ্ট বিবেকানন্দ মহামায়ার ধ্যানে নিমগ্ন হবেন এমন সময় সম্মুখস্থ ভগ্ন মন্দির দর্শনে তাঁর মনে হল যখন ঐ মন্দির মুসলমানগণ ভগ্ন করেছিল তখন হিন্দুগণ বাহুবলে কি তাদের প্রতিরোধ করতে পারে নাই? আমি উপস্থিত থাকলে প্রাণপণ করেও জননীর মন্দির রক্ষার চেষ্টা করতাম—কোনক্রমেই পবিত্র মন্দির ধ্বংস হতে দিতাম না।

সহসা এক দৈববাণী এল—বিস্ময়বিমূঢ় বিবেকানন্দ উৎকর্ণ হয়ে শ্রবণ করলেন—জগজ্জননী সস্নেহ ভর্ৎসনায় বলছেন:

"যদিই বা মুসলমানগণ আমার মন্দির ধ্বংস করিয়া প্রতিমা অপবিত্র করিয়া থাকে তাহাতে তোর কি?" একি! অপ্রত্যাশিত ঘটনা স্বামীজী ধারণা করতে পারলেন না। পরদিন পুনরায় তাঁর মনে উদিত হল ভিক্ষা করে অর্থসংগ্রহ করে জীর্ণ মন্দির সংস্কার করব। সহসা পুনরায় দৈববাণী "রজোগুণোদৃপ্ত বালক ক্ষান্ত হও! যদি আমার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে কি আমি সপ্ততল স্বর্ণ মন্দির তৈয়ারী করিতে পারি না। আমার ইচ্ছাতেই এই মন্দির ভগ্ন অবস্থায় পতিত রহিয়াছে।"

কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দের রজোগুণের অভ্রভেদী সমুন্নত গরিমা সহসা জগজ্জননীর পদতলে লুণ্ঠিত হ'ল। তাঁর দেবগুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন: "নরেন্দ্রের হৃদয়ে একটা পাতলা অজ্ঞানের আবরণ মা-ই দিয়া রাখিয়াছেন উহার দ্বারা অনেক কর্ম করাইয়া লইবেন বলিয়া"। সে আবরণ ক্ষণিকের জন্য মুক্ত হ'ল। স্বামীজী দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন মহামায়ার বিরাট ইচ্ছায় তিনি যন্ত্রের মত চালিত হচ্ছেন। এই অভিনব অনুভূতি তাঁর মনোরাজ্যে বিচিত্র পরিবর্তন

এনে দিল। প্রাণে অপূর্ব শান্তি ও অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নিয়ে স্বামীজী শ্রীনগরে ফিরে এলেন। পাশ্চাত্য শিষ্যাগণ তাঁর এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে বিস্মিত হলেন। তিনি গম্ভীরভাবে শিষ্যাদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ "আমার কর্মের স্পৃহা, স্বদেশপ্রেম সমস্ত অন্তর্হিত হয়েছে। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী--মা মা, তিনিই সব, তিনিই কর্তা, আমি কে ?" এক বিরাট কর্মময় জীবনের পরিণতির বিস্ময়কর কাহিনী! এই ঘটনার পর স্বামী বিবেকানন্দ স্থূল দেহে জীবিত ছিলেন মাত্র ৩ বৎসর ৯ মাস।

ক্ষীরভবানীর দর্শনপ্রার্থী হয়ে মন্দির-চত্বর অতিক্রম করে যতই নিকটবর্তী হতে লাগলুম ততই যেন মনটা আবেগপ্লুত হয়ে আসতে লাগল। পূজার সামগ্রী-আদি ক্রয় করে দেবীর উদ্দেশ্যে প্রাণের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করে দিলুম। মূল তোরণ-দ্বার হতে নির্ণিমেষ নেত্রে দেবীদর্শন করে দেহমন এক পরমা প্রশান্তিতে ভরে গেল। ১১-১৫ মিনিটে শেষ প্রণাম জানিয়ে শ্রীনগর অভিমুখে রওনা হলুম —ক্ষীরভবানী যাত্রার প্রাক্কালে স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত "Kali the mother" কবিতাটির ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত বঙ্গানুবাদটি আবৃত্তি করতে করতে ঃ

"নিঃশেষে নিবিছে তারাদল, মেঘ আসি আবরিছে মেঘ
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ বায়ুবেগ।
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দীশালা হতে
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে।
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে মেঘ গিরিচূড়া জিনি,
নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী।
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার—মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়—
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে—মৃত্যুরূপা মা আমার আয়।
করালি! করাল নাম তোর—মৃত্যু তোর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
তোর ভীম চরণ নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।

কালী তুই প্রলয়রূপিণী আয় মাগো আয় মোর পাশে
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কাল নৃত্য করে উপভোগ—মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।"

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় এই ক্ষীরভবানী মন্দির বহু প্রাচীন ২৭৫-৭০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে গোপাদিত্যের সময়ের। "এই ভবানী মন্দিরকে কেন্দ্র করেই সমগ্র কাশ্মীরে শৈবাচার প্রচারিত হয়েছিল এককালে। এই শৈবাচার কাশ্মীরের নিজস্ব সম্পদ। তিব্বত হতে কাশ্মীরে সোজা পথে চীনাচার একটা বিশিষ্টরূপে প্রবেশ করে। সে রূপ মধ্য এশিয়ার হিন্দু সংস্কৃতিতে ছিল। এই শৈবাচারের মধ্যে জাতিভেদ ও বর্ণভেদ ছিল না। শিব ছাড়া আর কোন দেবতাকে এরা মানে নি—মানে নি আর কারো পূজা। একেশ্বরবাদ এবং মোক্ষ-পিপাসা সর্বজীবে শিবদর্শন এর উদ্দেশ্য। এই দর্শনতত্ত্ব কাশ্মীরে বহু সন্ন্যাসীর আচরণীয় হয়ে ওঠার ফলে বিশিষ্ট একটা দর্শনতত্ত্ব জন্ম নিল কাশ্মীরে—ত্রিকদর্শন। ত্রিকদর্শনে বহু যোগী সিদ্ধ মহাপুরুষ হয়ে গেছেন। আবার এই ত্রিকদর্শনের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক আছে—কাশ্মীরে ইসলাম প্রচারের সঙ্গে। ভারতবর্ষে একমাত্র কাশ্মীরেই বোধ হয় ইস্‌লাম মিশে গিয়েছে দেশের ধর্ম ও প্রত্যয়ের সঙ্গে। ইস্‌লামের একেশ্বরবাদ, সর্বমানবতাবাদ, সর্বজীবে ভগবদ্দর্শনের প্রয়াস, জাতি, গোত্র ও বর্ণভেদকে অস্বীকার, মোক্ষলাভের প্রয়াস, এসব যেন ত্রিক্‌দর্শনের একটা অধ্যায়।"

ফেরার পথে বৃষ্টি নামল এক পশলা। রৌদ্র আর জলের খেলা শুরু হল। বাতাসে জলকণা উড়ে যেতে লাগল—তার ওপর সূর্যরশ্মি পতিত হয়ে চোখের সামনে রামধনু দেখা গেল। সচরাচর যা আমরা সুদূর আকাশে প্রত্যক্ষ করে থাকি। ১২-৩০ মিনিটে লীওয়ার্ড হোটেলে পৌঁছে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করে সকলে বিশ্রাম নিতে শুরু করলুম। অপরাহ্ণে মোগল উদ্যানগুলি, যথা—চশমাশাহী, নিশাতবাগ, শালামারবাগ ও শ্রীনগরের জলাধার হারওয়ান দর্শনের সফর-সূচী

জানিয়ে অমরবাবু হুঁশিয়ায় করে দিয়ে গেলেন বৈকাল ৩টার মধ্যে প্রস্তুত থাকতে।

॥ চশমাশাহী ॥

ধীরে-মন্থরে সকলের প্রস্তুত হতে ও শিকারা ধরে দাল পেরিয়ে যেতে বেলা প্রায় ৩-৩০ মিনিট হয়ে গেল। সেখান হতে সকলে রওনা হলুম সংরক্ষিত বাসে ৫½ মাইল পথ চশমাশাহী দেখতে। শাজাহানের অপরূপ কীর্তি—১৬৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এই চশমাশাহী। ঘাসের সবুজ আস্তরণে বিভিন্ন মর্‌শুমী ফুলের স্তবকে সজ্জিত হয়ে বিচিত্র শোভা ধারণ করেছে চশমাশাহী। ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে পাচক ও পুষ্টিকর ঝরণার জল পান করছে দলে দলে ছেলেমেয়েরা। এখানে-সেখানে ছড়িয়ে বসে আছে ছেলেমেয়েদের দল। কোথাওবা এক একটি পরিবার, কোথাওবা বন্ধুবান্ধবী পিকনিক করার অছিলায় বাড়ী থেকে তৈরী খাদ্যদ্রব্য এনে বসে বসে গল্পগুজব করছে। আমরা উপরে উঠে ঝরণার জল পান করে তৃপ্ত হলুম। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এই চশমাশাহীর জল পাত্র ভরে যেত দিল্লী আর আগ্রা বাদশাহ-দের তৃষ্ণা-নিবারণার্থে। চশমাশাহীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ ঘেঁষে একটি বাংলো—সেখানেই নাকি শ্যামাপ্রসাদকে অন্তরীণ রাখা হয়েছিল এবং শেষ নিঃশ্বাসও তিনি ত্যাগ করেছিলেন সেখানেই। মনটা বিষাদভারাক্রান্ত হয়ে উঠল তাঁর সেই চক্রান্তজনক মৃত্যুর কথা স্মরণ করে।

॥ শালামার বাগ ॥

চশমাশাহী হতে ৪-৩০ মিনিটের মধ্যেই আমাদের বাসখানি ছুটল শালামার অভিমুখে—দূরত্ব চশমাশাহী হতে ৪ মাইল। নূরজাহানের সাধের স্বপ্ন শালামার—একটি ছোট সংস্করণের রাজভবন। নির্মাণ করান জাহাঙ্গীর ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে। প্রাসাদ, কাছারি, স্নানঘর, সেই

সঙ্গে উদ্যানও তার আনুষঙ্গিক। থরে থরে ফুল আর ধাপে ধাপে ঝরণা নেমে এসেছে নানা ছন্দের সজ্জা সৃষ্টি করে। ঝরণাগুলি এখন আর নেই—শুষ্ক। সমস্ত বাগান ঝরণার জল-তরঙ্গে মুখরিত হতো একদিন। শালামারের সে রূপ-সৌন্দর্য আজ আর নেই—ফোয়ারার অনেকগুলিই গেছে নষ্ট হয়ে। তবু মালীরা সজ্জিত করে রেখেছে প্রাণের সম্পদ দিয়ে গড়া নূরজাহানের এই প্রিয় শালামার বাগকে। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর সানন্দে গ্রীষ্মাবকাশ যাপন করতেন এখানেই নূর-জাহানের সঙ্গে। এখানে প্রথম লেখা হয়ঃ

'অগর ফরদৌস রবরুয়ে জমীনস্ত হমীনস্তো হমীনস্তো হমীনস্ত্।'

—অর্থাৎ "ভূলোকে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে—তাহা এইখানে, তাহা এইখানে, তাহা এইখানে!"

॥ হারওয়ান ॥

শালামার থেকে আরও তু'মাইল এগিয়ে চলে গেলাম হারওয়ান হ্রদ বা জলাধার দেখতে। সমগ্র শ্রীনগর শহরে জলসরবরাহের এটিই উৎস। পশ্চাতেই হারওয়ান (হর্বন) পর্বত—জলে পড়েছে পাহাড়ের ছায়া। তবে হারওয়ান দেখে খুব মুগ্ধ হই নি, বরং এর চেয়ে আনন্দ পেয়েছিলাম মসৌরীতে "তোপ টিব্বা" বা "Gun Hill"-এর উপরে জলাধার দেখে, যেখান হতে সমস্ত মসৌরীতে জল সরবরাহ করা হয়। হারওয়ান-এর সম্মুখে জল বেঁধে চাষ করছেন ট্রাউট মাছের—জম্মু ও কাশ্মীর সরকার। হ্রদ থেকে নীচের সমতলভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে নানা জাতের গাছ, বিশেষ করে সুবৃহৎ চিনার গাছের তো অভাব নাই—তার সঙ্গে আখরোট, এ্যাস, বার্চ, পপলার প্রভৃতি বরফের দেশে যে গাছ দেখা যায় তা সবই। এ্যাস্ গাছ থেকেই ক্রিকেটের ব্যাট প্রস্তুত হয়। বার্চের নাম ভোজগাছ বা ভূর্জপত্র গাছ।

॥ **নিশাতবাগ** ॥

ফেরার পথে দু' মাইলের মধ্যে চলে এলুম সকলে মিলে নিশাতবাগে। নিশাতের সমতলভূমিতে সবুজ ঘাসের আস্তরণে ইংরাজী হরফে ফুল দিয়ে অক্ষর সাজিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন সকল যাত্রীকে কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্মকর্তারা "Kundu Special welcomes you" কথা কয়টি লিখে। এখানেই আমাদের বৈকালিক জলযোগের আসর। সকলে গোল হয়ে বসে চা-জলখাবারের সদ্ব্যবহার করলুম পরম তৃপ্তি সহকারে। অস্তরবির হিরণ্যদ্যুতি সোনা ঢেলে দিয়েছে নিশাতের বুকে। নিশাতের দশটি স্তর স্তবকে স্তবকে ধাপে ধাপে উঠে গিয়েছে। মাঝখানে ফুল- নানা জাতের রং মিলিয়ে তার স্তরগুলির সজ্জা। ধারে ধারে বড় বড় ফুলের গাছ, তারপর নানাজাতীয় লতার বেড়া। দু'ধারে ফলের বাগান। নিশাত কাশ্মীরের সব রকম ফল আর ফুল দিয়ে সজ্জিত। যেন বিচিত্রাভরণা রূপসী দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাচ্ছে অভ্যাগতদের। রঙে রঙে ঝলমল করছে। এত সুন্দর এত মনোরম যে, দু'চোখ ভরে দেখেই তৃপ্তি—বর্ণনায় বৈশিষ্ট্য হয় ক্ষুণ্ণ। কাশ্মীরের তৎকালীন গভর্ণর মমতাজের পিতা—শাজাহানের শ্বশুর আসফ খাঁর অন্তরের সৃষ্টি এই প্রমোদ কানন নিশাতবাগ। শাহাজান তো শ্বশুরকে চেয়েই বসেছিলেন এই নিশাত, তার সৌন্দর্য দেখে—শালামারকেও হার মানিয়েছে জেনে। একটি ভারতসম্রাজ্ঞীর সাধের স্বপ্ন শালামার—অপরটি রাজপরিষদের প্রমোদকানন—নিশাতবাগ। নীচেই দাল হ্রদ। সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এল—দালের বুকে। নেমে এলুম নিশাতের শেষ প্রান্তে অবস্থিত উচ্চ বেদিকা-শীর্ষ হতে—নিশাতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে দালে দৃষ্টি রেখে রূপসী নিশাতের অপরূপ সৌন্দর্য পান করে দু'চোখ ভরে। ফিরে এলুম লীওয়ার্ডে রাত্রি ৮টায়—বাদশাহী আমলের প্রমোদভবন ও প্রমোদকাননের মনোজ্ঞ স্মৃতি নিয়ে।

॥ সোনমার্গ ॥

১৮ই আগষ্ট সকাল ৮-৩০ মিনিটে শ্রীনগর শহরের দিকে—দাল পেরিয়ে বুলেভোর্দে নেহেরু পার্কের সামনে সকলে এসে বাসে উঠলুম। বাস ছুটল উত্তর-পশ্চিমে সোনমার্গ অভিমুখে। শ্রীনগর হতে সোনমার্গের দূরত্ব ৫২ মাইল—উচ্চতা ৮,৫০০´ ফুট।

সাড়ে বারো মাইলের মধ্যেই গন্দরবল হ্রদ—দাল থেকে নৌপথে আসার শেষ সীমা। পর্যটকদের মুকুটমণি। অভিনব সৌন্দর্য এর জলের—বামপার্শ্বে ক্ষীরভবানীর রাস্তা ফেলে চলে এলুম গন্দরবল পার হয়ে। এর পর ধীরে ধীরে চড়াই শুরু। সিন্ধুর জল স্ফীত হয়ে ছুটে চলেছে পাশে পাশে। তরঙ্গে তরঙ্গে উদ্বেল—হরমুখ হিমবাহ হতে হু হু শব্দে নেমে আসছে এই বরফগলা জল। নদীর গতির বিপরীত মুখে চলেছে আমাদের বাসখানি বাঁ-পাশের রাস্তা ধরে। ডাইনে সারি সারি আখরোটের বাগান। এর পরই রুক্ষ বৃক্ষহীন পথ শুরু হল। বাস ক্রমেই এগিয়ে চলেছে। অতিক্রম করে এলুম ২৫ মাইল পথ আর ৭,৫০০´ ফুট উচ্চতা। শ্রীনগর, সোনমার্গ, তিব্বত এসব অতি-প্রাচীন পথ। পঁচিশ মাইল পার হয়ে দেখা যায় একটি উত্তুঙ্গ পর্বতের শীর্ষদেশ—গগনচুম্বী তার শৃঙ্গ। বাঁ-দিকে হরমুখ। হরমুখ পাহাড়ের পর একটা খাড়াই পার হয়ে ওপারে গেলেই অমরনাথ তীর্থ। পাকদণ্ডী পথে দু' দিনের মধ্যেই যাওয়া যায়। বেলা ১২টার মধ্যে পৌঁছে গেলুম সোনমার্গে। এখানকার ডাকবাংলায় বন-ভোজনের আকারে সবুজ ঘাসের আস্তরণে বসে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত হল খিচুড়ী, পাঁপরভাজা ও বেগুনি সহযোগে বেলা ১টার মধ্যেই। ডাকবাংলার প্রায় ১০০´ ফুট নীচে ডাকঘর। পোষ্টমাষ্টার নীরবে ঝিমুচ্ছেন—পোষ্টকার্ড কেনার লোকাভাব—সারিবন্দী লোক নাই দেখে মনটা কেমন উস্‌খুস্‌ করে উঠল পোষ্টকার্ড কেনার জন্য এবং এক টাকার পোষ্টকার্ড ক্রয় করে নিলুম স্বামী সদাত্মানন্দজীর জন্য। ডাকঘর হতে আরও ১ ফার্লং দূরে বয়ে চলেছে সিন্ধুনদী

আপন মনে স্বচ্ছন্দ গতিতে—সেখান হতে কিছু জল নিয়ে এলেন স্বামী কল্যাণানন্দ। সিন্ধুর জল তার একটা মূল্য আছে বৈকি? সিন্ধুর তীরেই সোনমার্গ গ্রাম—নদীটি অর্ধচক্রাকারে গ্রামটিকে বেষ্টন করে ঘুরে গেছে। কথিত আছে প্রাচীনকালে এই সিন্ধু নদীর বালিতে স্বুবর্ণ-কণিকা পাওয়া যেত, তাই এব নাম সোনমার্গ। সোনমার্গের চতুর্দিকেই পার্বত্য সৌন্দর্যরাশি। কাশ্মীরের শেষ সুন্দর স্থান সোনমার্গ। সোনমার্গেব গ্লেসিয়াব ভ্যালি, থাজবাস ও ঝাবার প্রভৃতি চিরতুষারাবৃত পর্বতশ্রেণীর দৃশ্য মনকে তন্ময় করে রাখে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ঘোরাফেরা করতেই চোখে পড়ল সীতেনবাবু মোটব রাস্তাব পাশে একটি মিলিটারী ট্রাকের কাছে দাঁড়িযে ভাবতীয় সেনাবাহিনীর একজন লোকেব সঙ্গে কথা বলছেন। উপস্থিত হলুম সেখানে—কথাপ্রসঙ্গে জানা গেল ভদ্রলোকটি ঐ ট্রাকের চালক এবং বাঙালী, নাম—মনোবঞ্জন মুখার্জি, বাস ছিল যশোরে। কথায় কথায় সীতেনবাবুকে বললেন যে, তিনি আমাদেব ট্রাকে কবে হবমুখ হিমবাহ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন। সোনমার্গ হতে ২ মাইলের মধ্যে হরমুখ (শীর্ষ ১৬,৮৯০´) হিমবাহ। স্ত্রী-পুরুষ মিলে প্রায় ৩০জন যাত্রী ট্রাক ভর্তি হয়ে হরমুখ অভিমুখে চললুম। উঁচু, নীচু বন্ধুর পথে প্রায় ১ মাইল গিয়ে ট্রাকটি থামল—তারপর পয়দলে যাত্রা। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে উঁচু একটি পাথরের ঢিপিতে বসে দেখতে লাগলুম বিরাট হিমানীর চত্বর। জমাট তুষার সমগ্র অববাহিকা আচ্ছন্ন করে দিগন্তে মিশেছে। পর্বতশীর্ষ হতে পাদমূল পর্যন্ত দক্ষিণে, বামে ও সম্মুখে কেবলই শুভ্র তুষার। উপরে ঐ যে হিমবাহ ঐটি অতিক্রম করে, দূরে আরও দূরে দ্রাস বা 'জোজিলা' গিরিপথ। সোনমার্গ থেকে বেলতাল—তারপর দ্রাস নদী বেয়ে সিন্ধু—সেখান থেকে একেবারে 'লে' শহর লাদাকের রাজধানী ১১ হাজার ফুটের মধ্যে। মানসপটে ভেসে উঠল দণ্ডকমণ্ডলুধারী এক পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর পূর্ণাবয়ব মূর্তি। ৪৭ বসৎর পূর্বে (১৯২২) যিনি

গন্দরবল হতে সিন্ধুর তীর বরাবর পায়ে হেঁটে সোনমার্গ হয়ে 'জো-জিলা' অতিক্রম করে লাদাকের রাজধানী 'লে' শহরে পৌঁছেছিলেন; তারপর সেখানে হতে ২৪ মাইল পূর্বে গিয়েছিলেন হিমিস্ মঠে। তৃষিত-নয়নে চেয়ে রইলুম সেই পথের দিকে। রাজনৈতিক বিধানে সে পথ আজ অবরুদ্ধ। সীতেনবাবু সহ ৮।১০জন যাত্রী আরও অগ্রসর হয়ে চলে গেলেন হিমবাহ বা সোনমার্গ গ্লেসিয়ার ভ্যালি দেখতে। "বছর বছর তুষার জমে, বরফ হয়ে হিমবাহ বা গ্লেসিয়ারের সৃষ্টি। অর্থাৎ তুষারকণাগুলি ধীরে ধীরে জমাট হয়ে কাঠের মত দৃঢ় ও মসৃণ হয়ে ওঠে তখন তাকে আর ভাঙা যায় না। প্রাকৃতিক ধর্মে জলের ধারা পাহাড়ের মাথা থেকে নামে ঝরণার আকারে। এই সব ক্ষুদ্র ধারা উপত্যকায় বা ভ্যালিতে নেমে নদীর রূপ নেয়। উপত্যকার নিম্নভূমি ধরে তারা আবার চলে সাগরের উদ্দেশে।

তুষার-শিখরগুলি হতেও তেমনি নামে—স্বভাব-ধর্মে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে—জল নয় রাশি রাশি বরফের স্তূপ। সে সব তুষারধারাও এসে মেলে উপত্যকায়। নদীর আকৃতি নেয়। কিন্তু জলের প্রবাহ নয়, তরঙ্গবেগ নয়, হিমবাহ; বরফের জমাট নদী। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় নিশ্চল, গতিহীন। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে তা নয়। অতি ধীর-মন্থর তার গতি। দেখে বোঝা যায় না, চোখে ধরা পড়ে না। উপর দিয়ে পায়ে হাঁটলেও নয়। যেমন, পৃথিবী মনে হয় অচল, স্থির। হিমবাহ বা গ্লেসিয়ারও তেমনি সারা বছরে হয় তো মাত্র কয়েক শত ফুট এগিয়ে চলে। এমনি এক হিমবাহ সোনমার্গ ভ্যালি। এই গ্লেসিয়ার বা হিমবাহের অন্তর্দেশেও মাঝে মাঝে তুষার পাওয়া যায়। বহু নীচে ভিতরের তাপমাত্রায় বরফ গলে, অলক্ষ্যে হয়তো অন্তঃসলিলা জলধারা বয়ে চলে। উপরের বরফও গতিশীল হয়। দুই পাশের পাহাড়ের গায়ে ঘর্ষণ লাগে। নিম্নগতিরও আকর্ষণ থাকে। ফলে কোথাওবা সেই বরফের বিরাট স্তূপে ফাটল ধরে,—

ভিতরের জলধারাও তখন প্রকাশ পায়। ছোট বড় জলাশয়েরও সৃষ্টি হয়। এই সব তুষার-নদী বা হিমবাহ হাজার হাজার বৎসর একই ভাবে থাকতে থাকতে ঠাণ্ডায় ও চাপে এই বরফ এরূপ কঠিন হয়ে যায় যে, তা আর কোনরূপেই দ্রবীভূত হয় না। এমনকি আগুনের নিকট রাখলেও গলে না। এই সব প্রস্তরীভূত বরফ হতেই স্ফটিক, চশমার পাথর প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।" প্রায় একঘণ্টা পর সকলে একে একে ফিরে এলেন। মে মাস হতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায়ই মাঝে মাঝে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি হয় এখানে -প্রত্যাবর্তন পথে ছোট এক পশলা বৃষ্টিতে ভিজে কন্‌কনে শীত ভোগ করতে করতে ফিরে এলুম বেলা ৩-৪০ মিনিটে সোনমার্গের ডাকবাংলার সম্মুখে—যেখানে বাস দু'খানি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। প্রায় ৪টার সময় বাসে উঠে আপন আপন সীট্ দখল করে রওনা হলুম শ্রীনগর অভিমুখে—সেই উঁচু-নীচু বন্ধুর পথ বেয়ে। পাশে পাশে চলেছে স্ফীতবক্ষা সিন্ধু-নদী। সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে ফিরে এলুম দালের বুলেভোর্দে নেহেরু পার্কের বিপরীত ঘাটে। বড় বেশী সাজান, বড় বেশী বিলাস দালের। এই নীল জল, ভাবতে বিস্ময় লাগে—ফেব্রুয়ারীতে এর ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে পারাপার করবে এখানকার বাসিন্দারা। দালের এ সৌন্দর্য তখন থাকবে না, যাত্রীরাও কেউ ভীড় জমাবে না। শ্রীনগরের বাসিন্দারা শুক্‌নো তরকারী আর মাছ খেয়ে জীবনধারণ করবে। কাঁচা সব্‌জি তখন মিলবে না। এসব ভাবতে ভাবতে ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছি লীওয়ার্ডে যাবার জন্য, কোথায় ছিল মীরমহল্লার বিখ্যাত শালওয়ালা কাস্তোয়ারী ভাই, হঠাৎ ছোঁ মেরে তার মোটরে তুলে নিয়ে চলল সীতেনবাবু, সমর মুখার্জি ও আমাকে তার শাল-আলোয়ানের শো-রুম দেখাতে। সেই সঙ্গে কাশ্মীরী চা (তিব্বতের) আর বাড়ীর তৈরী কাশ্মীরী বিস্কুট জাতীয় খাবার দিয়ে ভুলিয়ে সীতেনবাবু ও আমাকে দিয়ে ক্রয় করিয়ে নিল প্রায় ৮০০৲ টাকার শাল-আলোয়ান আর স্কার্ফ। ওরা ধরেই রেখেছে এখানে যারা

আসে তারা একবারই ঠকে—ছ'চারবার নয়। এজন্য যার কাছে যেমন পারে শোষণ করে নেয়। দাম-দস্তুরের গুণে এখানে সাত টাকা হয় সাত আনা—সতের টাকা হয় আট টাকা। তবে কলকাতায় কাস্তোয়ারী ভাইদের ক্যানিং ষ্ট্রীটে দোকান আছে—এই ভরসায় যা-কিছু ক্রয় করা। রাত্রি ৯টায় লীওয়ার্ডে ফিরে এলুম। নৈশ-ভোজনের পালা শেষ করে পরের দিন ১৯শে আগষ্ট গুলমার্গ যাত্রার সফর-সূচী জেনে ফিরে এলুম আপন আপন কক্ষে। আমরা পাঁচ-জনে গুলমার্গে না যাবার দলেই রায় দিলুম।

১৯শে আগষ্ট বিশ্রাম। বিশ্রাম ঠিক বলা যায় না—সীতেনবাবু, শান্তিবাবু সহ আমরা তিনজন একটি ট্যাক্সি করে গেলুম Govt. Art Emporium-এ কয়েকটি জিনিস কেনার উদ্দেশ্যে। কিন্তু বাৎসরিক হিসাব-নিকাশের জন্য Emporium-টি বন্ধ থাকায় সেখান হতে আমীরা কদল, শ্রীনগরের সেণ্ট্রাল মার্কেট, সুপার বাজার প্রভৃতি ঘুরে কয়েকটি অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করে সেখান হতে একেবারে লালচকে গেলুম। লালচক অঞ্চল শ্রীনগরের অভিজাত পাড়া। ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগলুম, এ অঞ্চলটিতেই বাঙালী মিষ্টির দোকান, মোগলাই খানার দোকান, শাল, আলোয়ান, কাঠের নানাজাতীয় খেলনার দোকান। ফাঁকে ফাঁকে পপ্‌লার আর চিনার গাছ। একধারে যত স্কুল, কলেজ, হাঁসপাতাল, গীর্জা, ক্লাব, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি। কিছুদূর অগ্রসর হয়েই 'সেক্রেটারিয়েট'। এদিক দিয়ে Director of Tourism-এর অফিস যেতে পড়ে করণনগর। তার পূর্বে একটি সুবৃহৎ পার্ক। ছ'পাশে বড় রাস্তা—পাশে পাশে বড় বড় চিনার গাছ। পথিপার্শ্বের দোকানে স্বামী কল্যাণানন্দজীর জন্য প্লাষ্টিকের ওয়াটারপ্রুফ দেখে একেবারে চলে এলুম Director of Tourism-এর অফিসে, Publication Section-এ কাশ্মীরের তথ্যসম্বলিত ছ' একখানি পুস্তক খরিদ করার উদ্দেশ্যে। Publication Section বন্ধ। অগত্যা পুনরায় পায়ে হেঁটে দেড় মাইল পথ অতিক্রম

করে ফিরে এলুম লীওয়ার্ডের ঘাটে দালের তীরে কয়েকটি আপেল ক্রয় করে। দাল পেরিয়ে লীওয়ার্ড পৌঁছলুম তখন প্রায় সন্ধ্যা ৭টা। নিয়মিত চা জলখাবার এসে গেল কুণ্ডু স্পেশ্যালের তরফ হতে। রাত্রি ৮টা—শ্রীনগরের আমেজী শীত সামান্য একটি চাদরেই কাটে। ৯টার মধ্যেই যথারীতি নৈশভোজন শেষ করে দালেব তীরে লীওয়ার্ডের চত্বরের কোচে বসে আলোকমালায় শোভিত চতুর্দিকের লেকগুলির অপরূপ দৃশ্য দেখতে লাগলুম। সামনেই শঙ্করাচার্য পর্বতের উচ্চ চূড়ায় বিজলী বাতি জ্বলছে মিট্ মিট্ করে। কাশ্মীর উপত্যকাব মধ্যে শ্রীনগরের নিকটে এত উঁচু পাহাড় আর নাই। তাই রাত্রির অন্ধকারে অতিদূর হতে পথিকেব দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই বিজলী বাতিটি।

॥ শঙ্করাচার্য পর্বত ॥

এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, ২৬৬৪-২৬৬৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বাজত্ব করেন সন্দীমান। তিনিই এই মন্দির নির্মাণ করেন সর্বপ্রথম। পরবর্তী কালে ৩৭০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে রাজা গোপাদিত্য এটিকে পুনর্নির্মাণ করে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিবমন্দির হতে মসৃণ প্রস্তরের বৃহদায়তন পৈঠা নির্মাণ করান বিতস্তার দক্ষিণ তীব পর্যন্ত। এজন্য এই মন্দিরকে গোপাদ্রি মন্দিরও বলা হয় এবং মুসলমান রাজত্বকালে সপ্তদশ শতাব্দীতে এই প্রস্তরগুলি অপসৃত করে মসজিদ্ প্রস্তুত হয়। ঐতিহাসিকদের মতে এসব প্রাচীন কথা প্রমাণিত হয় নি। এখন এই মন্দিরের আটটি কোণ। মুসলমান স্থাপত্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট। জাহাঙ্গীর এই মন্দির পরবর্তী কালে সংস্কার করান। পূর্বে মন্দিরে মূর্তি ছিল—শিলালিপিতে নাকি তাই উৎকীর্ণ আছে। বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে মন্দির। সামনে অনেকখানি শূন্যস্থান—সেখানে আখরোট ও আপেল গাছ। বর্তমানে মন্দিরের অভ্যন্তরে বাণলিঙ্গ শিব। দৈর্ঘ্যে ১ গজ, প্রস্থ বা পরিধি ২ ফুটের অধিক, একটু চেপ্টা।

শঙ্করাচার্য নাকি অমরনাথ যাত্রার সময় এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে যান ভগ্নমন্দিরে। যাই হোক, এর নাম শঙ্করাচার্য পাহাড়। কারো মতে এটি ভগবান শঙ্করেব মন্দির, এজন্য এর নাম শঙ্করাচার্য পাহাড় বা মন্দির। মুসলমানেবা একে বলে 'তখৎ-ই সোলেমান'। ৬২০০´ ফুট উচ্চ। এর শিখর হতে সমগ্র কাশ্মীরের দৃশ্য অপূর্ব দেখায়—যেন পটে-আঁকা ছবি। কাশ্মীর যে কত উর্বর, উপত্যকা, নদী, নালা সব মিলে কাশ্মীরেব স্থলপথ অপেক্ষা জলপথই যে দীর্ঘতর এসব সুস্পষ্ট হয় এই শঙ্করাচার্য পর্বতে এসে দাঁড়ালে।

২০শে আগষ্ট সকাল ৮-৩০ মিনিটের মধ্যেই শান্তিবাবু, সীতেনবাবু সহ আমরা তিনজনে কাস্তোয়াবী ভাইদের শো-রুমের দিকে চললুম টাঙ্গা ভাড়া কবে স্কার্ফের রং বদলাতে, সেই সঙ্গে সীতেনবাবুর ক্রীত শীতবস্ত্রগুলি আনতে যা ধোলাই-এর জন্য দেওয়া ছিল। সব ব্যবস্থা কবে শ্রীনগরেব আদিম পল্লী মীরমহল্লা হতে পায়ে হেঁটে চলেছি আমরা সেন্ট্রাল মার্কেট অভিমুখে। সেখান থেকে লালচক হয়ে একেবারে Director of Tourism-এর অফিসে উপস্থিত হলুম এবং পুস্তক বিভাগ হতে কাশ্মীর ও ক্ষীরভবানীর তথ্যসম্বলিত দু'খানি পুস্তক খরিদ করে লীওয়ার্ডে ফিরে এলুম বেলা ১২টার মধ্যে। মীর-মহল্লার যাবার পথে সন্নিকটেই দেখা যায় হরিপর্বত।

॥ হরিপর্বত দুর্গ ॥

এককালে হরিপর্বত ছিল প্রসিদ্ধ স্থান। বহু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। দুটি মস্‌জিদও আছে এই পাহাড়ে। মন্দিরের অস্থি দিয়ে মস্‌জিদের দেহ তৈরী হয়েছে। হরিপর্বতের দুর্গ আকবরের মহৎ কীর্তি। দেশে যখন দুর্ভিক্ষ ও অনাহার দেখা দিয়েছিল তখন সেই অভাব মোচনের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয়ে তিনি এই দুর্গ তৈরী করান, যাতে কাশ্মীরী শ্রমিক কিছু উপার্জন করতে পারেন। এ যুগের সরকারী টেস্ট রিলিফগোছের। হরিপর্বতের উচ্চতা হল ৫,৭০০´

ফুট এবং মোগল সম্রাট এটি নির্মাণ করান ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। দুর্গটির বাহির দেওয়ালের দৈর্ঘ্য ৩ মাইল এবং উচ্চতা ২৮´ ফুট। এই দুর্গটির অভ্যন্তরে শারিকা দেবীর মন্দির আছে। পর্যটক অধিকর্তার অনুমতি নিয়ে যে কোন ব্যক্তি দুর্গটি দেখতে পাবেন।

॥ জামা মসজিদ্ ॥

হরিপর্বতের নিকটেই জামা মসজিদ্ কাশ্মীরের বৃহত্তর উপাসনাগার। ১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান সিকন্দর শাহ এই মসজিদ্ নির্মাণ করান। ৩২৭টি স্তম্ভ। ৪০´ ফুট উচ্চ এই মসজিদ্‌টির মীনার ও গম্বুজেব কারুকার্য প্রাচীন স্থাপত্যরীতিকে স্মবণ করিয়ে দেয়। এ হেন মসজিদটি কয়েকবার অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। প্রথম অগ্নিকাণ্ড ঘটে ১৪৬২ খ্রীষ্টাব্দে কিন্তু মহম্মদ শাহ পুনর্নির্মাণ করান এটি ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয়বাবের অগ্নিকাণ্ডেব সন-তারিখ পাওয়া যায় না তৃতীয়বার পুনরায় ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আওবঙ্গজেবের রাজত্বকালে এই মসজিদে অগ্নিকাণ্ড হয়। তিনি এমন সুন্দবভাবে এটি সুনির্মাণ করান যে, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে সামান্য কিছু মেরামত করার পর এটি সুষ্ঠু-ভাবেই আজও বিদ্যমান। কাশ্মীরের এই মসজিদগুলি ভারতেব অন্যান্য স্থানের মসজিদের মত নয়—অনেকটা বৌদ্ধ প্যাগোডার ছাঁচে নির্মিত।

২০শে আগষ্ট বৈকালে জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের পরিবহন যোগে স্বামী কল্যাণানন্দজীকে সঙ্গে নিয়ে আমরা তিনজনে শ্রীনগরের অভিজাত বাজার সেণ্ট্রাল মার্কেট প্রভৃতি ঘুরে কল্যাণানন্দজী ও শান্তিবাবুর জন্য প্লাষ্টিকের ওয়াটারপ্রুফ ক্রয় করে সন্ধ্যার দিকে লালচক হতে সরকারী পরিবহন ধরে ফিরে এলুম আমাদের আস্তানায়।

২১শে আগষ্ট বিশ্রাম। দালের তীরে লীওয়ার্ডের চত্বরে ঘাটের সামনের সকালের কড়ামিঠে রৌদ্রে আরাম করছি সঙ্গে স্বামী

কল্যাণানন্দ। দেখছি ছোট বড় নানা ধরনের সাল্‌তি নিয়ে কাশ্মীরী বালকবালিকাদের চলা-ফেরা নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি নিয়ে। স্বামী কল্যাণানন্দজীর বাল্য ও যৌবনের ক্রীড়া-চপল রঙিন্ দিনগুলির কথা মনের অবচেতন স্তরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তাঁর সখ হ'ল সাল্‌তি বেয়ে কিছুদূর ঘুরে আসতে। সাল্‌তিচালক একটি ছোট বালককে ডেকে তার সাল্‌তি নিয়ে স্বামী কল্যাণানন্দ সহ সেই সাল্‌তিতে উঠে বসলুম। অবশ্য তখনও নির্ভয়-বিশ্বাস ছিল না তাঁর বৈঠা ধরে সাল্‌তি বেয়ে চলার ওপর। কিন্তু তাঁর দু'-একবার বৈঠা চালনা দেখে সাল্‌তির বালকটি যখন আস্থা স্থাপন করল তখন স্বামী কল্যাণানন্দের নৌকা বেয়ে চলার সঙ্গে বেশ একটা আনন্দ হ'ল। সকালের সোনালী রৌদ্রে এইভাবে প্রায় এক মাইল সাল্‌তি বেয়ে দালের আশেপাশে চক্কর দিয়ে ফিরে এলুম পুনরায় যথাস্থানে। খুসী করলুম সাল্‌তির ক্ষুদে মালিককে ৫০ পঃ বক্‌সিস্ দিয়ে। সকালের চা-জলখাবারের ডাক পড়ল। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বেলা ২-৩০ মিনিটের সময় লীওয়ার্ডের চত্বরে রৌদ্রে দেওয়া কাপড় গামছাগুলি তুলতে এসে দেখি হোটেলের মালিক সহ কর্মচারীরা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে! সকলের মধ্যেই একটি চঞ্চলতা—ত্বরিতে একটা মস্ত বড় ছাতা নিয়ে এল হোটেলের একজন কর্মচারী। জিজ্ঞাসা করে জানলুম শেখ আবদুল্লা সাহেব এসেছেন। দীর্ঘ বপু, সুপুরুষ চেহারা, দুধে-আলতা রং। টাঙ্গাওয়ালা একদিন বলেছিল বটে: "ওহি ত শের হ্যায়"। সত্যই শেখ সাহেব—শেখ আবদুল্লা—"শের-ই কাশ্মীরী"। সে আরও বলেছিল: "শেখ সাহেবের এক কথায় আজও কাশ্মীরের লক্ষ লোক মাথা দিতে প্রস্তুত"। এ'কথার সমর্থনও মিলেছিল কাশ্মীরের বিখ্যাত শালব্যবসায়ী শিক্ষিত কাস্তওয়ারী ভাইদের কাছে। তাঁদের উভয়ের কথার ভাবে জেনেছি: আজও যদি শেখ সাহেব বক্তৃতা দেন দাঁড়িয়ে তবে হাজার হাজার কাশ্মীরবাসী, টাঙ্গাওয়ালা, এমনকি বক্সী সাহেবও যাবেন তাঁর বক্তৃতা শুনতে।

অমন হিম্মৎ আর কার এক-দু'বছর নয় বিশ বছর শেরের তাগদ্ নিয়ে লড়ে এসেছেন আজাদীর লড়াই। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাপুষ্ট শেখ সাহেব পুরোপুরি ক্ষমতা হাতে পেয়ে এক সময় তিনি কাশ্মীরকে পৃথক করার চেষ্টা করেন—এমন কি প্রয়োজন বোধে পাকিস্তানে যোগ দিতেও তাঁর কুণ্ঠা ছিল না। ফলে তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ আসন ছেড়ে কুদে অন্তরীণ থাকতে হয়েছিল। এ হেন শেখ সাহেবের আগমনবার্তা তরিৎগতিতে প্রচারিত হওয়া মাত্র হোটেলের স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এসে গেলেন তাঁকে দেখতে। হোটেলকর্তৃপক্ষের কাছে অর্থ সংগ্রহের জন্যই শেখ সাহেবের আগমন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই দাল পেরিয়ে চলে গেলেন। যাই হোক, কাশ্মীরে এসে "শের-ই কাশ্মীরী"কে চাক্ষুষ দেখার সুযোগ ঘটল এই লীওয়ার্ড হোটেলে বসে।

বৈকাল ৫টা। স্বামী সদাত্মানন্দজীর ইচ্ছা শিকারা বেয়ে একবার দালে ঘুরে আসেন। শ্রীনগরে এসে অবধিই এ পরিকল্পনা আমারও ছিল—প্রকাশ করি নি। সদাত্মানন্দজীর ইচ্ছাটি প্রকাশ হয়ে পড়ায় এখন দাল ভ্রমণের জন্য একখানি শিকারা ভাড়া করা হল—৫৲ টাকায় লীওয়ার্ড ঘাট থেকে দাল, নাগিন আর চারচিনার হয়ে দালের লীওয়ার্ড ঘাটে ফিরে আসা পর্যন্ত। সীতেনবাবু ও সমর মুখার্জি গেলেন শঙ্করাচার্য মন্দির দেখতে। স্বামী সদাত্মানন্দ, কল্যাণানন্দ ও শান্তিবাবু সহ আমরা ৪জন চলেছি দালের বুকে ভাসতে ভাসতে। দালের দৈর্ঘ্য ৩·৮৭ মাইল, প্রস্থ ২·৫৮ মাইল সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল ১০ মাইল। দ্বীপ বাদে জলে ঢাকা ক্ষেত্রফল ৭ মাইল। শুধু জল, নৌকা আর কিছুটা ঘোরা এই উদ্দেশ্য নয় দালে বেড়ানর—আশে-পাশে উইলো, পপ্‌লার আর বীচগাছের সারি, মধ্যে মধ্যে ভাসমান উদ্যান প্রভৃতি মিলে চমৎকার দেখাচ্ছে। ভেলার ওপর মাটি ছাড়িয়ে তাতে বীট্, সিম, কড়াইশুটি, টমাটো হয়েছে আর সরু সরু লম্বা লাউ ঝুলছে অগুন্তি। কচ্চিৎ আশেপাশে শ্রীনগরের গ্রামগুলি দেখা

যাচ্ছে। জলের ওপরে তারের বেড়া দিয়ে নিজ নিজ স্থান নির্দিষ্ট করা আছে—সেখানে কোথাও রয়েছে পদ্মবন, কোথাওবা ভাসমান উদ্যান। একের পর এক এসে যাচ্ছে বেতের বন, লতাকুঞ্জ, শত শত প্রস্ফুটিত পদ্ম।

দাল শেষ হতেই তার পশ্চিমে নাগিনে এসে পড়লুম। জল আরও স্বচ্ছ আরও গভীর। জলের নীচে কোন লতাগুল্ম নাই। ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ উঠছে। মাঝে মাঝে হাত দিয়ে জল ছুঁতে বেশ ভাল লাগছে। আকাশে একখণ্ড গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ উঠেছে। দূরে সবুজ পাহাড় দেখা যাচ্ছে। সে যে কি অবর্ণনীয় অনুভূতি তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। নীল পাহাড়, লতাকুঞ্জ, প্রস্ফুটিত পদ্মবন, মেঘমেদুর অম্বর, কান্তকোমল জলস্রোতের সজল নিবেদন—এসব মিলে এক অপূর্ব অনুভূতি। দ্বীপের মত ঐ দূরে দেখা যাচ্ছে 'চার-চিনার'। সুবৃহৎ চারিটি চিনাব গাছ আছে তাই বোধ হয় নাম চার-চিনার—ওখানেই আমাদের গন্তব্যস্থল। চারচিনার-এ পেঁছে গেলুম ২৫ মিনিটের মধ্যেই। ভাসমান পার্ক, ফুলের বাগান, মধ্যে মধ্যে বসবার ব্যবস্থা। শিকারা ভিড়ল চারচিনারের ঘাটে, ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলুম—সামনেই সুসজ্জিত রেস্তোরাঁ। এগিয়ে গিয়ে উত্তরে Swimming Pool, তার পাশেই পোষাক পরিবর্তনের ঘর, সজ্জাঘর ইত্যাদি। উঠে গেলুম Swimming Pool-এর শীর্ষ-দেশে; সেখান হতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের দৃশ্যটি দেখতে লাগলুম। চারি-ধারে সবুজ পাহাড়, শিখরে শিখরে গোলাপী রং, ফাঁকে ফাঁকে বেগুনি রং-এর ছোপ। মাঝে মাঝে গভীর বন—উপদ্বীপের মতো। মেঘের কিনারায় কিনারায় অস্তায়মান সূর্যের হিরণ্যদ্যুতি। সে দ্যুতির ছোঁয়া লাগল নাগিনের বুকে, জলে উঠল ঢেউ—চারচিনার বৃক্ষের গায়ে গায়ে রং বেরং-এর বিজলী বাতিগুলি উঠল জ্বলে। আমাদের শিকারা ভাসল দক্ষিণ-পূর্বে। ফেরার পথে হজরতবল। শ্রীনগরের ৫ মাইল পূর্বে দালের কিনারায়। হজরত মহম্মদের পবিত্র কেশ রক্ষিত এ

মস্‌জিদে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের পরম বস্তু। সম্রাট শাজাহান নির্মিত বিরাট সৌধ এই হজরতবল। এখানে এই কেশ রক্ষিত হওয়ার একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। "বংশপরম্পরায় এই কেশ মদিনার সৈয়দ আবছুল্লার কাছে আসে। দেশের সুলতান এই কেশের জন্য সৈয়দ আবছুল্লাকে তলব করেন। ফলে কেশ নিয়ে তিনি ১০৪৬ হিজরিতে বিজাপুরে আসেন। তেইশ বৎসর তিনি বিজাপুরে বাস করেন। কেশ পান তাঁর ছেলে সৈয়দ হামিদ। কেশ ছাড়া আরও ছুটি মূল্যবান জিনিস ছিল তাঁর কাছে। হজরত আলির ঘোড়ার রেকাব এবং তাঁবই পাগড়ি। ১১০৪ হিজরিতে আওরঙ্গজেব বিজাপুর জয় করার পর হামিদ পালিয়ে যান জাহানাবাদে। সেই ছুঃখ-দৈন্যের সময় এক ধনী ব্যবসায়ী খাজা নুরুদ্দীন অশওয়ারি তাঁকে প্রভূত সাহায্য কবেন। একদিন নুরুদ্দীন হামিদের কাছে ভিক্ষা করেন ঐ তিনটি পূত স্মৃতির একটি। ভিক্ষা তিনি পান না। স্বপ্ন দেখেন হামিদ। স্বয়ং পয়গম্বর তাঁকে বলেন নুরুদ্দীনের ইষ্টপূরণ করতে। পরের দিন হামিদ নুরুদ্দীনকে বলেন তিনটি স্মৃতির মধ্যে যে কোন একটি তিনি বেছে নিতে পারেন। নুরুদ্দীন ঐ কেশটি নেন। কেশ নিয়ে নুরুদ্দীন কাশ্মীরে চলেন। পথে আওরঙ্গজেবের চরেরা তাঁকে ধরে ফেলে ও আওরঙ্গজেব ঐ কেশ জুলুম করে কেড়ে রাখেন আজমীঢ় শরিফে রাখার অভিলাষে। কেশ আজমীঢ়ে চলে যায়। ছুঃখে নুরুদ্দীন প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পুর্বে তিনি অভিলাষ জানালেন যেন তাঁর কবর ঐ কেশের নিকটে দেওয়া হয়। আওরঙ্গজেব আজমীঢ়ে কেশ রাখতে চান। নুরুদ্দীন মারা যান লাহোরে। এই-ভাবে লাহোরের জনসাধারণ চাইল নুরুদ্দীনের কবরের কাছে কেশ রাখতে, আজমীঢ়ের জনসাধারণ চাইল সম্রাটের ইচ্ছা পূরণ করতে আর খাজা নুরুদ্দীনের ছেলে খাজা মদানীশ প্রার্থনা করেন খোদার কাছে। হঠাৎ আওরঙ্গজেব তলব করেন মদানীশকে। বলেন যে, তিনি স্বপ্নাদিষ্ট কেশ মদানীশকে ফিরিয়ে দেবার জন্য। কেশ ও

মুরুদ্দীনের শব কাশ্মীরে প্রেরিত হলো। নক্‌শবন্দের খক্কায় কেশ সংরক্ষিত হলো। এত ভীড় হতো এই কেশ দেখার জন্য যে ভীড়ে বহু লোক মারা যেত। ফলে বড় মসজিদের তল্লাস হতে লাগলো। হজবতবল শাহাজানের নির্মিত বিরাট সৌধ। এই সৌধে কেশ ও মুরুদ্দীনের সমাধি স্থানান্তরিত হলো। সেই থেকে হজরতবল তীর্থ হল।"

সন্ধ্যার প্রাক্কালে এলুম নেহেরু পার্কে। আমাদের এত কাছে তবু দেখা হয়নি এই কয়দিনে। বিজলী বাতিগুলি জ্বলে উঠল পার্কে। আশেপাশে—ফুলেফুলে সজ্জিত পার্ক, উপরে উঠে বেষ্টুরেণ্ট। এই রেষ্টুরেণ্টটির পরিপাটির সুনাম আছে এ অঞ্চলে। ভাসমান এই উদ্যানে সন্ধ্যার পর বেশ কিছু পর্যটক আসেন ভ্রমণ করতে। সব ঘুরে দেখার পর শিকারার মুখ ফিরল লীওয়ার্ডের দিকে। লেকের জলে আলোর ঝিলিক পড়ে তরঙ্গগুলো ঝিক্‌মিক্ করছে—দূরে দেখা যাচ্ছে চারচিনারের চতুর্দিকে নীল লাল বিজলী বাতিগুলো। সামনে গগনচুম্বী শঙ্করাচার্য মন্দিরশীর্ষে জ্বলে উঠেছে বিজলী বাতির ক্ষীণ আলোটি। দালের স্বচ্ছ জলে আলোছায়ার খেলা দেখতে দেখতে লীওয়ার্ডে পৌঁছে গেলুম রাত্রি ৮টায়। নামার সময় আলো-আঁধারি পথে অনেক দুর্ভোগ সহ্য করে ফিরেছেন সীতেনবাবু শঙ্করাচার্য মন্দির হতে সঙ্গে নিয়ে মুখার্জিকে।

॥ শা-হামদান মস্‌জিদ ॥

শ্রীনগর সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা হল—অমরনাথ যাত্রাপথের দর্শনীয় হিসাবে। শেষ করব হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলিত ভাবধারা-পুষ্ট একজন পারসীক ফকিরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত একটি বিখ্যাত মস্‌জিদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করে। এই মস্‌জিদটির নাম হল "শা-হামদানী মস্‌জিদ"। এই হামদানীর পুরো নাম মীর সৈয়দ হমদানী। পারস্যের একটি স্থানের নাম হমদান। হমদান থেকে এই

ফকীব এসেছিলেন বলে পরিবর্তিত আকারে তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল "হমদানী" থেকে "হামদানী" শব্দটি। ইনি কে, কবে, কিভাবে এসেছিলেন তা সত্যই কেউ জানে না। জানার কথাও নয়, কারণ সাধু-সন্ন্যাসীরা প্রথম প্রথম অপরিচিতই থেকে যান, পরে মৃগনাভিব মত তাঁদের সৌবভ পরিব্যাপ্ত হয় চতুর্দিকে!

আসল কথা তখন কাশ্মীরেব সিংহাসনে আসীন একজন বিরাট মহাপ্রাণ পুরুষ। ১৪১১—১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দ কাশ্মীরে জয়নাল আবেদীনের বাজত্ব। মানবদেহে তাঁকে দয়া, ক্ষমা ও শান্তির অবতার বলে গেছেন সবাই। এই জয়নাল আবেদীন যৌবনে ছিলেন প্রমত্ত স্বেচ্ছাচারী, মূর্তিমান হিন্দুবিদ্রোহী। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল পাবস্যের এই সন্ন্যাসী বা ফকীবের—সর্বত্যাগী, সার্বভৌম সন্ন্যাসী। চিত্তে শান্তি, চক্ষে করুণা, ব্যবহাবে অমৃত এই "শিবং সুন্দবং" লোকটি কে? জয়নাল আবেদীন দিন দিন মুগ্ধ হতে লাগলেন এই জ্যোতিষ্মান্ মহাপুরুষের প্রেম-পুলকিত বাণীতে।

তাঁব সম্বন্ধে কিংবদন্তীর অন্ত নাই, কেউ বলে তিনি উড়ে এসে-ছিলেন আকাশপথে, কেউ বলে হিমালয়-কন্দরে সাধন কবেই তিনি জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তৈমুরলঙের হাতে বাঁধা তাবিজে তাঁর পায়ের ধূলা। দেশে ফিরে তৈমুর সে তাবিজ রাগ করে ফেলে দিয়ে মারা গেলেন দেখতে দেখতে। হমদানী, হিন্দুকে হিন্দু বলে স্বীকার করেন নি, মুসলমানকে মুসলমান বলেও মানেন নি, মানুষমাত্রেরই বন্ধু ও গুরু ছিলেন তিনি।

জয়নাল আবেদীন এই ফকীরের পায়ে সর্বস্ব ঢেলে দিয়ে তাঁর অনুশাসন: "প্রকৃত মুসলমান প্রকৃত হিন্দুকে শ্রদ্ধা করবে। হিন্দু যে পাথর পূজা করে সে পাথরে দেবতা নাই কি? কোথায় নেই দেবতার স্পর্শ?" এসব অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। রাজত্বের মধ্যে হিন্দু মুসলমান ভেদ একেবারে মুছে ফেললেন। কাশ্মীরের সুবর্ণযুগ সেটা।

এই জয়নাল আবেদীন শেষ পর্যন্ত বেদান্তশাস্ত্রের তত্ত্বে একেবারে পাগল হয়ে প্রায় সর্বত্যাগী হয়ে রইলেন। শেষ বয়সে যোগবাশিষ্ঠ শুনতে শুনতে চিরনিদ্রায় সমাহিত হন। এ হেন জয়নাল তাঁর গুরুর উদ্দেশে যে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে গেছেন তারই নাম "শা-হামদানী মস্‌জিদ", ৩নং সেতুর নীচে ঝিলমের দক্ষিণ তীরে স্বমহিমায় আজও বিরাজিত।

চার

॥ পাহালগামের পথে ॥

২২শে আগষ্ট মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রাম নিয়ে ১-১৫ মিনিটে কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্মচারী সহ প্রায় ৯০জন যাত্রী রওনা হয়ে গেলুম পাহালগাম অভিমুখে—জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের পরিবহন যোগে। শ্রীনগর হতে যাত্রা করে খানাবল হয়ে আমাদের বাস ত্ব'খানি চলতে শুরু কবেছে পাহালগামের পথে। পথে চলেছি আর ভাবছি কাশ্মীর হতে কি স্মৃতি নিয়ে এলুম। প্রকৃতি তার অফুরন্ত সৌন্দর্যসম্ভার উজাড় করে দিয়ে কাশ্মীরকে ভূস্বর্গে পবিণত করেছে সত্য কিন্তু কাশ্মীরের মানুষেব জীবনে বা চোখে মুখে দেখিনি তার প্রতিচ্ছবি। দেখিনি তাদেব সাবলীল স্বচ্ছন্দগতি--যা দেখেছি অমৃতসরের শিখ-জাতির মধ্যে। নাই তাদের জীবনে অনাবিল আনন্দের উচ্ছলতা। হতাশা, দারিদ্র্য ও শিক্ষাহীনতার নাগপাশে পিষ্ট যেন একটি জাতি। স্বাভাবিক বিকাশ নাই। জীবনছন্দের মধ্যে কোথায় যেন রয়েছে একটা বিচ্যুতি। ইতিমধ্যে পাঁচ হাজার থেকে উঠে এসেছি সাত হাজার ফুটেব মাথায়। ধীবে ধীরে, ধাপে ধাপে, ঘুরপাক খেয়ে বাসটি উঠছে। কিছুদূর উঠেই দেখা গেল লীডারের জলধারা—একধারে পাহাড় উঠে গেছে তার গায়ে চীর আর দেওদারের বন। বন্যরূপা লীডার চলেছে ফেনিলোচ্ছ্বাসে আবর্তের পর আবর্ত সৃষ্টি করে—প্রকৃতির এক উদ্দাম বিকাশ। লীডার শেষে মিশেছে ঝিলমে। বাসখানি মাঝে মাঝে ধূলা উড়িয়ে চলেছে। এইভাবে চলতে চলতে পুরো ৩ ঘণ্টা পর ৪-১৫ মিনিটে পাহালগামে পৌঁছল আমাদের বাসখানি সরকারি পরিবহন অফিসের সামনে, পাহালগাম বাজারের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে। সেখান হতে বাজারের মাঝে বড় রাস্তার উপরে এসে থামল একটি গলিপথের মুখে। এখান হতে ৩ মিনিটের

মধ্যেই "মাউণ্টভিউ" হোটেল লীডারের সামনে। ত্রিতল কাঠের বাড়ী, তারই শেষ তলায় স্বামী সদাত্মানন্দ, কল্যাণানন্দ ও শান্তিবাবু সহ আমাদের চারজনের বাসের ব্যবস্থা। এখানে আমাদের প্রায় ছ'দিন অবস্থিতি। শ্রীনগর হতে পাহালগামের দূরত্ব ৬০ মাইল, উচ্চতা ৭,২০০´ ফুট। আমেজী শীত, শ্রীনগরের তুলনায় বেশী। বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান। সামনেই বয়ে চলেছে লীডার উচ্ছল গতিতে। নদীর পারে সবুজ ঘাসের আস্তরণ। শুধু তাই কেন, পাহালগামের সমতলে সর্বত্রই সবুজ ঘাস। বহু পর্যটক ও যাত্রী প্রভাতী সূর্যের কিরণে গা মেলে বিশ্রাম করছে লীডারের তীরে, কেউবা স্নান করছে। স্বামী কল্যাণানন্দ ও শান্তিবাবু লীডারের জলে স্নান করলেন ছ'দিন। লীডারের ধারে ধারে, পাহালগামের তীরে তীরে ঘন পাইন্‌বন—ছুই পার্শ্বে অসংখ্য তাঁবু পড়েছে—অমরনাথ যাত্রীদের। উর্ধ্বে দৃষ্টি দিলে তুষার-মৌলি গিরিশ্রেণী, আরও উর্ধ্বে নীলাম্বরের গায়ে শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি গোবৎসের মত ছুটাছুটি করছে। পাহাল-গামের দৃশ্য অপূর্ব। কাশ্মীরের প্রকৃতি তার সমস্ত সৌন্দর্যসম্পদ দিয়ে মানুষকে বাঁধতে চায় আসক্তির বাঁধনে। ফুলে ফুলে সজ্জিত বাগান, ফলভরা বৃক্ষ, জলভরা হ্রদ—নরনারীর অপরূপ সৌন্দর্য—সবকিছুই যেন আহ্বান জানায় জীবনপাত্র পূর্ণ করে নিতে কানায় কানায়; রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে। বাদশাহী যুগের ভোগাসক্তির প্রলেপ আজও নিঃশেষে মুছে যায় নি কাশ্মীর হতে। পাহালগামের প্রকৃতি মানুষকে শোনায় বৈরাগ্যের বাণী। লীডারের কলতানে শুনি "চরৈবেতি চরৈবেতি"। উন্মুক্ত উদার অম্বর মন্ত্র শেখায় দেহমনের বন্ধন মোচনের। তরঙ্গায়িত গিরিশ্রেণী হাতছানি দিয়ে ইঙ্গিত জানায় অনন্তের দিশারী হতে। তাই শ্রীনগর অপেক্ষা পাহাল-গামকে ভালবেসেছি। সকাল-বিকাল, মধ্যাহ্ন-অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যায়, কারণ-অকারণে, কোনকিছু ক্রয় করার অছিলায় অথবা শঙ্করমঠের ছড়িদারকে দেখার আশায় ঘুরেছি পাহালগামে। কখন আপেল

কেনার অজুহাতে, কখনওবা সন্ধ্যায় উজ্জ্বল বিজলী বাতির আলোকে অকারণ পুলকে ঘুরেছি দোকানে দোকানে। আবার আশা রেখে এসেছি পাহালগামে যাবার। ফটোগ্রাফারকে সঙ্গে নিয়ে লীডারের তীরে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছি স্বামী সদাত্মানন্দ, কল্যাণানন্দ, শান্তিবাবু ও সীতেনবাবুসহ আমরা ৫জনে—যাত্রাপথের স্মৃতি হিসাবে। শহর হিসাবে পাহালগাম নিতান্তই ছোট। বাজারের বুক চিরে যে পথ চলে গেছে ২-২½ ফার্লং দীর্ঘ তার ছ'পাশে সারি সারি শাল আলোয়ান, কাষ্ঠনির্মিত সৌখীন দ্রব্য হতে শুরু করে আপেল, ন্যাসপাতি, আনারস, মুদিখানা, ডাক্তারখানা ও মনোহারী দোকান। পূর্বদিকে একপ্রান্তে ডাকঘর, মাঝে মাঝে হোটেল, রেস্তোরাঁ, দুধের দোকান, পশ্চিমে পথের শেষে ফটোগ্রাফারদের ষ্টুডিও। পর পর চলেছে শো কেস—রকমারি ছবির সজ্জা। পথের মোড়ে মোড়ে ভুটিয়ারা বিক্রয় করছে সোয়েটার, জামা, কোট ইত্যাদি। যানবাহনবিরল পথ, নিরাপদে অন্যমনস্কভাবেও চলা-ফেরার বাধা নাই। অমরনাথ যাত্রার প্রাক্‌প্রস্তুতিরূপে তরুণ-তরুণীরা ঘোড়ায় চড়ে ছুটাছুটি করছে। ছোট শহর কিন্তু উচ্চমূল্যে সকল প্রয়োজনীয় বস্তুই পাওয়া যায়। অমরনাথ যাত্রাপথে পাহালগামই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করার শেষ স্থান। হরিদ্বারের মত লোহার সূঁচল নাল দেওয়া কাঠের লাঠি বিক্রয় হচ্ছে প্রচুর ৫০।৬০ পয়সায়।

২২শে আগষ্ট হঠাৎ রক্তের চাপ বৃদ্ধির ফলে প্রায় অনিদ্রায় রাত্রি কাটল। ২৩শে আগষ্ট কুণ্ডু স্পেশ্যালের তরুণ ডাক্তার অসীমকুমার ঘোষ পরীক্ষা করে দেখলেন রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৯০।১২০। ডাঃ ঘোষ বয়সে তরুণ হলেও সহানুভূতিশীল ছিলেন সকল যাত্রীর প্রতি। অমরনাথ যাত্রাপথে তাঁবু-বাসকালে তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার দিকে যাত্রীদের প্রতিটি তাঁবুতে গিয়ে কে কেমন আছেন সংবাদ নিয়ে আসতেন। এজন্য আমাদের সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। যাই হোক, ঔষধ ব্যবহারের পরও পরদিন পুনরায় পরীক্ষা করে দেখা

গেল রক্তের চাপ বিশেষ কিছু হ্রাস পায় নি। অমরনাথের পথে হাঁটা শুরু হবে ২৪শে আগষ্ট হতে। সংকল্প করে এসেছি পায়ে হেঁটে যাত্রা করে দর্শন করব অমরনাথজীকে। এভাবে যাওয়া কোনরূপে যদি না হয় তবে এবাবের যাত্রা স্থগিত রাখব—আবার হেঁটে যাওয়া যখন সম্ভব হবে তখন এসে অমরনাথজীকে দর্শন করে যাব। পাহালগামেই থেকে যাব কয়েকদিনের জন্য। আমাদের বিপন্মুক্তির শেষ আশ্রয় গুরুর গুরু পরমগুরু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও মদীয় আচার্যদেব স্বামী অভেদানন্দজীর চরণে প্রার্থনা নিবেদন করলুম। মন দৃঢ় হল—ভাবলুম যৌবন বিগত, প্রৌঢ়ত্বের সীমায় দাঁড়িয়ে—ত্রিশ বৎসর যাবৎ যে আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠায় আনুগত্য স্বীকার করেছি তার ফলশ্রুতি কি লাভ করলুম? শুধুই কি নোঙর ফেলে দাঁড় টানাই সার হল? সাধু নই, সন্ন্যাসী নই সত্য, কিন্তু পশ্চাতে ফিরে চাইবার আকর্ষণইবা কি আছে। কাবো আকর্ষণে আমাকে ফিরতে হবে না—ফেরার জন্য কেউ আমায় আকর্ষণও করবে না। তবে কিসের ভীতি? মৃত্যুভয়! সেতো জীবন হতে জীবনান্তরে যাবার তোরণদ্বার মাত্র। সে রহস্য জীবনে উপলব্ধ সত্য না হলেও বিচার দিয়ে বার বার যাকে জেনেছি তা কি মিথ্যা হয়ে যাবে এই সংকট-মুহূর্তে। সে বিচারের বাস্তব মূল্য কি? অন্তরে শক্তি এল স্মরণ করে স্বামীজীর প্রসিদ্ধ দুটি পংক্তি:

"শোন বলি মরমের কথা জীবনে জেনেছি সত্যসার
তরঙ্গ আকুল ভবঘোর এক তরী করে পারাপার।"

পথ চলা হল শুরু। এখানেই আমাদের গৃহবাস সমাপ্ত। পাহালগাম হতে ১০ মাইল পথ চন্দনবারী। এর পর আরম্ভ হবে তাঁবুবাস চন্দনবারী হতে। পাহালগামেই মালপত্র ওজন করে ঘোড়ার পিঠে দেওয়ার ব্যবস্থা। সেইমত জিনিসপত্রগুলি ওজন করে ঘোড়ার পিঠে দেওয়া হল। অমরনাথ পর্যন্ত যাতায়াতের ভাড়া মালবাহী ঘোড়া ১'৫০ কে. জি. হিসাবে। যাত্রীবাহী ঘোড়া ৭০৲ টাকা। ডাণ্ডী

৩৫০৲ টাকা। সাধারণভাবে হেঁটে গেলে লাগে ৩½ দিন। ফেরার পথে লাগে ২ দিন। ৪০৲ টাকা দিয়ে সাথে সাথে একজন কুলি নিলুম এখান হতেই চলাব পথে নিত্যপ্রয়োজনীয় মালগুলি বহনের জন্য। নাম মস্থুর সিং।

কেদার-বদরী, অমরনাথ ও গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী-গোমুখ যাত্রা-পথে শীতবস্ত্র, শয্যাদি ও অবশ্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি হল : সোয়েটার ২টি (একটি পুরো হাত), মোজা ২ জোড়া (পশমী), দস্তানা ১ জোড়া, কানঢাকা টুপি ১টি, গরম চাদর ১টি, কেড্‌স্ একজোড়া। কাপড় ৪।৫খানি। তবে কাপড় অপেক্ষা ফুল প্যাণ্ট অথবা হাফ্ প্যাণ্ট সহ হাঁটু পর্যন্ত মোজা প'রেই চড়াই-উৎরাই-এ সুবিধা। শয্যাদির মধ্যে প্রয়োজন র‍্যাগ তিনটি, তোষক একটি, বেড্‌কভার ২টি, বালিস ১টি। আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি : মগ একটি, জলের পাত্র (water pot) ১টি, ফ্লাস্ক ১টি, টর্চ ১টি। এতদ্ব্যতীত নিজ নিজ স্বাস্থ্য অনুযায়ী কিছু কিছু ঔষধপত্র সহ বোরোলীন ও ভেস্‌লিন। চন্দনবাড়ী হতেই শীতবস্ত্রাদির প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। সাধারণতঃ পাহালগামেই স্থির করে ফেলতে হয়—ডাণ্ডী, ঘোড়া ও পয়দলের যাত্রীরা কে কিভাবে যাত্রা করবেন। সেই মত ব্যবস্থা করা হয় পাহালগাম হতেই। কারণ, শ্রাবণী-পূর্ণিমায় অমবনাথ দর্শনার্থীদেব জন্য পাহালগামের পর অমরনাথ পর্যন্ত যাতায়াতের মধ্যবর্তী পথে কোন যানবাহনাদি মেলে না, ডাণ্ডী তো নয়ই ; যাবার পথে উচ্চ ভাড়ায় ক্বচিৎ ঘোড়া মিলতে পারে। প্রত্যাবর্তন পথে উক্ত দুটি যানের কোনটিই মেলে না। অমরনাথের পথে কাণ্ডী জাতীয় মনুষ্য-বাহনটির প্রচলন নাই। হয়তো দুর্গমতার জন্যই। এ পথে মানুষ নিজ দেহটি নিয়ে বহন করতেই হিমসিম্ খায় তার ওপর পিঠে আর একজন মানুষের বোঝা! তবু অত্যন্ত দুর্গম ও বন্ধুর চড়াই পথে বৃদ্ধা ও অক্ষমদের কিছুদূর বহন করে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত আছে কিছু সংখ্যক বলিষ্ঠ পার্বত্য যুবক উচ্চ মূল্যের বিনিময়ে। অন্ততঃ

অমরনাথ হতে প্রত্যাবর্তন পথে এ দৃশ্য বিরল নয়। বিশেষ একটি দিনে প্রায় ১০।১২ হাজার পুণ্যার্থী নরনারীর সমাবেশ ঘটায় খাদ্যদ্রব্য ও যানবাহনাদির দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতা দেখা দেয় প্রবলভাবে। কেদার-বদরী পথে কিন্তু এ জাতীয় ঘটনা বিরল। কারণ, সুদীর্ঘ ৩ মাসের মধ্যে (এপ্রিল-জুন) যাত্রীরা স্বেচ্ছায় যে কোন সময় কেদার-বদরী দর্শনে যাত্রা করতে পারেন। পুনরায় সেপ্টেম্বরেও কিছু সংখ্যক যাত্রী দর্শনার্থী হতে পাবেন। এজন্য পথিমধ্যে অন্ততঃ ঘোড়া ও কাণ্ডীর অভাব থাকে না। ডাণ্ডী অবশ্য ইচ্ছামত মেলে না। যাই হোক, অমরনাথ যাত্রাপথে আমাদের কামবাটির ১৪জন যাত্রীর মধ্যে ১০জনেই ঘোড়া ও ডাণ্ডীর আশ্রয় নিলেন। যাঁরা হাঁটা-পথের যাত্রী হতে উৎসুক ছিলেন হরিদ্বার হতে ক্রমাগত যাত্রাপথের দুর্গমতার কথা শ্রবণ করে তাঁরাও অবশেষে ঘোড়ার যাত্রীতে পরিণত হলেন। অবশিষ্ট স্বামী সদাত্মানন্দ, কল্যাণানন্দ, শান্তিবাবু ও সীতেনবাবু সহ আমরা ৫জন। পূর্ব অভিজ্ঞতা হেতু পথের দুর্গমতার বিষয় চিন্তা করে স্বামী কল্যাণানন্দজী (সীতেনবাবু বাদে) আমাদের ৪ জনের জন্য একটি ঘোড়া ভাড়ার ব্যবস্থা করলেন ৭০৲ টাকা দিয়ে। জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের বিধিমতে অশ্বারোহী যাত্রীদের পাহালগাম হতেই অশ্বারোহণে যাত্রার রীতি। সেই মত স্বামী কল্যাণানন্দ পাহালগাম হতেই অশ্বপৃষ্ঠে রওনা হলেন চন্দনবাড়ী অভিমুখে।

॥ চন্দনবাড়ী ॥

২৪শে আগষ্ট বেলা ১১-২০ মিনিটে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর স্বামী সদাত্মানন্দ, শান্তিবাবু ও সীতেনবাবু সহ আমরা ৪জনে পাহালগাম হতে পয়দলে চলা শুরু করলুম চন্দনবাড়ীর পথে, রক্তের চাপ বৃদ্ধিজনিত মস্তিষ্কের অস্বস্তিকর অবস্থা সত্ত্বেও। যাতায়াতের জন্য অবশ্য আমাদের ৪জনের কারো ঘোড়ার প্রয়োজন হয় নি। আমাদের কোচটির অন্য কামরার পায়ে-হাঁটা যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন, বারাসত

হতে আগত ভগ্নিদ্বয় শ্রীমতী মায়ালতা রায় ও শেফালিকা রায়চৌধুরী। মহিষাদল হতে আগত দুটি পরিবার শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি ও শ্রীমতী উষারাণী মাইতি। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সামন্ত ও তৎপত্নী শ্রীমতী সরস্বতী সামন্ত, সঙ্গে শ্রীমান অনুপ সামন্ত—বয়স ৬ বৎসর। কলিকাতার গ্রে ষ্ট্রীট ও পটুয়াটোলা লেন হতে আগত যথাক্রমে শ্রীমতী রমা পাল ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ আচার্য। দমদম স্কুলের শিক্ষক শ্রীঅরূপ দত্ত। এই-সব মিলে ৩৬জনের মধ্যে ১৪জন পায়ে-হাঁটার যাত্রী, তৎসহ কুণ্ডু স্পেশ্যালের ৮।৯জন কর্মচারী। অপর একটি কোচের যাত্রী যাঁরা শ্রীনগরে আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন তাঁদের সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না থাকায় উক্ত কোচের হাঁটা-পথের যাত্রী-সংখ্যাব তালিকা সঠিক জানা না থাকলেও অনুমানে মনে হয় ৮।৯জনের বেশী নয়। এ দু'টি কোচের হাঁটা-পথের যাত্রীদেব মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ৭০ বৎসর বয়স্ক স্বামী সদাত্মানন্দ এবং বয়োকনিষ্ঠ ৬ বৎসব বয়স্ক শ্রীমান অনুপ সামন্ত।

অমরনাথ যাত্রার পথ পৃথিবীর মধ্যে অতি বিচিত্র এবং নয়নরঞ্জক পার্বত্য-পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত। লীডার নদীর এক পাশে ক্রমোন্নত পর্বতগাত্রে "কোলাহয়" হিমবাহ, অন্য পাশে শ্যামল শস্য-সমাবৃত বিশাল তৃণভূমি। পাহালগামে লীডার নদীর প্রবেশ পথে একটি কাঠের সেতু। সেটি অতিক্রম করলেই 'পাহালগাম'-এর সীমা শেষ। বাঁদিকে পথ—ওপারে পাহাড়। নদীর আশেপাশে ক্ষেত, ক্ষেতভরা শাক-সবজী, ধান ও ভুট্টা। আশপাশেব গ্রামগুলি হতে টুক্‌টুকে ছেলেমেয়েদের দল পয়সার জন্য পিছু নিয়েছে—কেউ কিছু দিচ্ছে কেউবা কিছুই না। পিছু পিছু কিছুদূর এসে ফিরে যাচ্ছে তারা। ৩।৪ মাইল পর্যন্ত গ্রাম—মধ্যে মাঝে আখরোট গাছ। পাহালগাম হতে চন্দনবাড়ী প্রায় ছায়াঘেরা দশ মাইল পথ। উচ্চতা ৯,৫০০´ ফুট। চড়াই বিশেষ নেই বললেই চলে। সরকারী-বেসরকারী জীপগাড়ীগুলি চলেছে ধুলা উড়িয়ে। নিয়মিত যাত্রীবাহী

বাস চালু হয়নি এখনও। মনে হয় এক বৎসরের মধ্যেই চলতে শুরু করবে। পথ চলা তাই খুব কষ্টকর নয়। যৌবনোচ্ছলা লীডার চলেছে এঁকেবেঁকে, পাশে পাশে কখন দৃশ্য কখনবা অদৃশ্য হয়ে পাইন্ গাছের অন্তরালে। পথের মাঝে একটি দুর্ঘটনা দেখে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। একজন অশ্বারোহী বৃদ্ধা ভূপাতিত হওয়ায় করুণস্বরে চীৎকার করে উঠলেন। অনেকেই কিছুক্ষণ যাত্রা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বৃদ্ধাটির একটি হাত ভেঙে গেছে। তাঁর সহ-যাত্রীরাও যাত্রা বন্ধ কবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরে সংবাদ নিয়ে জানা গেল চন্দনবাড়ী হতে ফির্তি জীপে তাঁকে পাহালগাম হাসপাতালে ভর্তির জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই-ভাবে চলতে চলতে চন্দনবাড়ীর কাছাকাছি চলে এলুম যেখানে লীডার বা নীলগঙ্গা ভীম গর্জনে ফেনায় ফেনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ছুটে চলেছে। চন্দনবাড়ী ঘাটি একটি ঘনসন্নিবিষ্ট ঝাউবনের মধ্যে অবস্থিত। এখানকার সূর্যাস্ত অতি মনোরম। অস্তরবির রঙীন্ রশ্মি পর্বতগুলির ঢালু গাত্রকে সমুজ্জ্বল করে পর্বতশিখরে তুষার-ঝালরে সোনালী ঢেউ খেলিয়ে দেয়। নীচে দৃষ্টি দিলে সুদূর সমতলভূমির অস্পষ্ট শ্যামলিমা দর্শককে তার অবস্থানের উচ্চতা ও দূরত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়। এমনি করে অপূর্ব দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে দেহের কষ্ট এককালে বিস্মৃত হয়ে বেলা ৪-৩০ মিনিটে চন্দনবাড়ী পৌঁছে গেলুম। পথে আমাদের সাথের কুলি মস্থুর সিং-এর সাক্ষাৎ মিলল না। ফলে সীতেনবাবুকে তাঁর প্রায় ৫ কে. জি. মাল বহন কবতে হল এই দশ মাইল পথ।

আমাদের মধ্যে সর্বাগ্রে পৌঁছেছেন ঘোড়ার যাত্রী স্বামী কল্যাণানন্দ। তারপর স্বামী সদাত্মানন্দ ও শান্তিবাবু। সর্বশেষ সীতেনবাবু ও আমি। মস্থুর সিং আমাদের পূর্বেই পৌঁছে গেছে। হোল্ডল্গুলিও এসে গেছে। কেদারের পথে হোল্ডল্গুলি সাধারণতঃ যাত্রীদের পৌঁছানর পরে পৌঁছে, কারণ ঐ পথে মাল থাকে কুলির

পিঠে—অমবনাথের পথে মাল থাকে ঘোড়ার পিঠে। এই দুর্গম, বন্ধুর ও উত্তুঙ্গ চড়াই পথে কুলিরা সাধারণতঃ ৮।১০ কে. জি.-র অধিক মাল বহন করতে সক্ষম হয় না। ইতিমধ্যে চা-জলখাবার এসে গেল। শ্রান্তদেহ—ক্লান্তপদে এসে তৃপ্তিসহকারে সেগুলির সদ্ব্যবহার করে ও মস্থর সিংকে কিছু অংশ দিয়ে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ১১নং তাঁবুতে সমরেন্দ্র মুখার্জি সহ আমরা ৬জন পবম নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে লাগলুম। মস্থব সিং হোল্ডলগুলি খুলতে শুরু কবল। ৯৫০০´ ফুট উচ্চের কন্‌কনে শীত। তার ওপর হিম-শীতল জলে হাত দেওয়া দুষ্কর। যেখানে আমাদের তাঁবু পড়েছিল তার ৩।৭ মিনিট মধ্যেই একটু নীচে লীডার নদী। সে জলও স্পর্শ করা যায় না, এখান হতেই অল্পবিস্তর গরম জলেব ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। প্রয়োজন বোধে কেউ ব্যবহার করেছেন, কেউবা করছেন না। তবে পানীয় জল গরম ছাড়া ব্যবহার নিষেধ। শৌচাগারের কোন ব্যবস্থা নাই। উন্মুক্ত প্রান্তবে কিংবা লীডার নদীর ঢালে বৃহদায়তন প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবিষ্ট হয়ে শৌচাদি সেরে নিতে হয় এবং স্ত্রী-পুরুষের শৌচে যাওয়ার অবরোধ প্রথা বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ ছাড়া উপায় থাকে না। জীবনে তাঁবু-বাসের এই প্রথম অভিজ্ঞতা, এজন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলুম হয়তোবা নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করতে হবে এই আশঙ্কায়। কিন্তু পথশ্রমের ক্লান্তিতে ও শীতের প্রকোপে রাত্রি ৮টার মধ্যেই নৈশভোজন সমাপ্ত করে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে ঢলে পড়লুম সকলেই। ভোর ৪টার মধ্যেই জেগে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপ্ত করে প্রাতঃকালীন চায়ের আশায় অপেক্ষা করতে লাগলুম। এখান হতেই স্নানাদি একেবারে বন্ধ—প্রচণ্ড শীতে সে কথা মনেও আসে না। সেদিক থেকে স্বামী কল্যাণানন্দ ভাগ্যবান, বিগত পনেরদিনের মধ্যে মাত্র চারদিন স্নান করেই দিব্য আরামে আছেন। পাহালগাম থেকে ঘোড়ার পিঠে এসে তাঁর কুঁচকি বেড়েছে এবং জ্বরভাব। এজন্য এখান হতে তিনি পাকাপাকি ঘোড়ার যাত্রীতে পরিণত হয়ে গেলেন। কুণ্ডু স্পেশ্যালের

নিয়মমত ৭-৩০ মিনিটের মধ্যেই প্রাতঃকালীন জলযোগের ব্যবস্থা সমাপ্ত হল। উচ্চতার জন্য জলে চাল সিদ্ধ না হওয়ায় এখান হতে বাঙালীর চিরাভ্যস্ত প্রিয়খাদ্য অন্নব্যঞ্জনাদির পাট উঠল, তার বদলে স্থান অধিকার করল খিচুরি, বেগুনি, পাঁপড়ভাজা ও আলু-চচ্চরি। রাত্রে রুটি কিংবা লুচি। ষ্টোভে রুটি সেঁকা সুবিধামত হয় না। ডাক্তারের উপদেশে তাই চিবিয়ে খেতে হচ্ছে আমাকে! মধ্যাহ্ন ভোজনের পর্ব সকাল ৯টার মধ্যে সমাপ্ত করে এক রাত্রির পাতা সংসার গুটিয়ে সকলে অপেক্ষা করতে লাগলুম পরবর্তী ঘাটি শেষনাগ অভিমুখে যাত্রার জন্য। এখান হতেই শুরু হল প্রতিদিন তল্পিখোলা ও তল্পিগোটানর প্রাণান্তকর পর্ব।

॥ শেষনাগ ॥

২৫শে আগষ্ট বেলা ৯-৩৫ মিনিটে চন্দনবাড়ী হতে রওনা হয়ে শেষনাগ অভিমুখে চলা শুরু করেছি। রক্তের চাপবৃদ্ধিজনিত যন্ত্রণার উপশম ঘটেছে। ফলে চলার গতিবেগ বেড়েছে। দেড় মাইল অতিক্রম করার পরই আসবে পিশুঘাটির দুর্লঙ্ঘ্য চড়াই। অমরনাথের পথে পিশুঘাটির চড়াই সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে লোকের মুখে মুখে আর ভ্রমণকাহিনীগুলিতে। হরিদ্বারের পর হতেই কুণ্ডু স্পেশ্যালের ম্যানেজার, এ্যাসিষ্টেন্ট ম্যানেজার ও কর্মচারিদের মুখে শুনে আসছি এর ভয়াবহ দুর্লঙ্ঘ্যতার কথা। কেদারপথে চড়াই-এর সঙ্গে এর নাকি কোন তুলনাই হয় না। দেখতে দেখতে দেড় মাইল পথ অতিক্রম করে চলে এলুম পিশুঘাটির পাদদেশে। মালবাহী ঘোড়াগুলি চলেছে শ'য়ে শ'য়ে —তাদেরই আগে-পিছে বা আশেপাশে হেঁটে যেতে হবে আমাদের। কখনোবা অপেক্ষা করতে হবে পিছনে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ না দলে দলে ঘোড়াগুলি অবরুদ্ধ পথ মুক্ত করে অগ্রসর হচ্ছে সামনের দিকে। এ এক অভিনব দুর্ভোগ যা কেদারের পথে ভোগ করতে হয় নি।

গাছপালা ক্রমেই গভীর হচ্ছে—পথ হচ্ছে সংকীর্ণতর। দুর্গম,

বন্ধুর ও দুর্লঙ্ঘ্য চড়াই পিশুঘাটির। এই ঘাটির মত বিশ্রী ঘাটি নাকি হিমালয় তীর্থমালায় বিশেষ নাই। গোমুখ ও কৈলাস-মানস প্রত্যাবৃত সহযাত্রী কল্যাণানন্দজীর অভিজ্ঞতা হতেও জেনেছি যে, এত দীর্ঘ খাড়াই ছায়ালেশহীন পথ কৈলাস-মানস এবং গোমুখেও বিরল। ওসব পথে দুর্গমতা আছে সত্য কিন্তু চড়াই-এর সীমা এত দীর্ঘ নয়। একেবারে সোজা আড়াই মাইল—দু'হাজার ফুট খাড়াই। বড় বড় পাথরের ঢিবি, মাঝে মাঝে ছোটবড় আকারের নুড়ি চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। ঢিবির পর ঢিবি উঠে গেছে—দু'পাশে পাহাড়ী অঞ্চলেব শক্ত ডালযুক্ত ছোট ছোট গাছ—গায়ে পায়ে জড়িয়ে চড়াই পথে চলা আবও দুর্গম করে তুলেছে। মাঝে মাঝে কাপড় ডালে আটকে যাচ্ছে—তাবই মাঝ দিয়ে আঁকা-বাঁকা সংকীর্ণ বন্ধুর পথে চলেছি—আগে আগে সাথের কুলি মস্থুব সিং। ঘোড়ার রাস্তা বা সাধারণ মানুষের চলা-পথ পরিত্যাগ কবে মস্থুব সিংকে অনুসবণ কবে চলেছি। সে এ পথের নির্ভুল দিশাবী। সোজা খাড়াই পথে ক্রমাগতই চলেছি—শেষ কোথায় চিন্তা না করেই। কারণ সে চিন্তা মনে এলে আর পথচলা হবে না। সকলেই দম নিচ্ছি, হাঁপাচ্ছি আবার চলেছি। নীচের মানুষগুলি পুতুলের সারির মত উপরের দিকে আসছে। বৃক্ষহীন অতি কঠিন চড়াই। এই শ্রান্তিকর পথ সূর্যকিরণে আরও কষ্টকর হয়ে উঠেছে। আঁকা-বাঁকা পথের মাঝে মাঝে ষ্টীলের ফলকে কোথাও লেখা Don't lose your breath (দম নষ্ট করো না), Don't make cut short (পথ সংক্ষেপের চেষ্টা করো না) কিংবা Top ahead (পর্বতশীর্ষ সন্নিকট)। অথচ এগুলি পদে পদে লঙ্ঘিত হচ্ছে। পায়ে-চলা সাধারণ পথ বা ঘোড়ার পথ পরিত্যাগ করে "পথ সংক্ষেপ" করেই চলেছি। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ হচ্ছে—পাকদণ্ডী পথে চলার দরুণ। তবে Top ahead (শীর্ষদেশ সন্নিকট) লেখাটি যখন দৃষ্ট হচ্ছে তখন আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে যে, শীর্ষদেশে পৌঁছানর আর বিলম্ব নাই। পিশুঘাটির পাদদেশ

হতে শীর্ষদেশ পর্যন্ত মাঝে মাঝে এক একটি করে অস্থায়ী প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের পক্ষ হতে। একটি বৃদ্ধা ও কিশোরী কিছুদূর অতিক্রম ক'রে মধ্যপথে থেমে গেছে—দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে তাদের পক্ষে চড়াই ওঠা। অসহায় দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। কিশোরীটির আত্মীয়ারা বহু কষ্টে আমাদের সঙ্গে উপরে উঠে এসেছেন। সুবিধার মধ্যে সৈন্যবিভাগের কিছু শান্ত্রী বা প্রহরী পিশুঘাটির চড়াই-এ বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে দুর্লঙ্ঘ্য স্থানগুলিতে—চড়াই উত্তরণে বৃদ্ধা ও অক্ষম ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে। এদের একজনকে ভাঙা হিন্দিতে অনুরোধ জানালুম বৃদ্ধা ও কিশোরীটিকে উপরে ওঠার জন্য সাহায্য করতে। প্রহরীটি প্রথমে বৃদ্ধা ও পরে কিশোরীটিকে হাত ধরে টেনে উপরে নিয়ে এল এবং সেও আমাদের সঙ্গে পিশুঘাটির চড়াই-এ চলতে শুরু করল। অনতিদূরেই একটি বৃক্ষ- সেটিকে লক্ষ্য করেই চলেছি আশ্রয়ের আশায়। সাথের কুলি মস্থুর সিং ততক্ষণে দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেছে মালপত্র নিয়ে। মাঝে মাঝে লজেন্স মুখে দিচ্ছি আর চলেছি। নীচের দিকে চেয়ে দেখি স্বামী সদাত্মানন্দজী, কল্যাণানন্দ ও শান্তি-বাবু তখনও প্রায় ১ মাইল দূরে। সীতেনবাবু আমার সন্নিকটে চলে এসেছেন। কল্যাণানন্দজী কখন ঘোড়ায় কখনওবা পয়দলে আসছেন। এইভাবে পোঁছে গেলুম পিশুঘাটির শেষ সীমায়—যেখানে একটি ভূর্জগাছ ঘাঁটির অতন্দ্র প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান—বৃক্ষজগতের শেষ অস্তিত্ব ঘোষণা করে। এরপর আর কোন বৃক্ষাদি প্রায় দৃষ্ট হয় না—শুধু শ্যামল তৃণ। এই গাছটির নীচে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় চলতে শুরু করলুম। এরপরই পিশুঘাটির মালভূমি। শ্রান্ত-ক্লান্ত যাত্রীগণ এখানে পোঁছেই বিশ্রাম নিতে শুরু করেছেন, কেউ বসে কেউবা অর্ধশায়িত অবস্থায়। অস্থায়ী চা-বিস্কুট ও পরোটার দোকান—সেখানে অনেকেই জলযোগ সেরে নিচ্ছেন। মস্থুর সিং পূর্বেই পোঁছে গেছে। তাকে জলযোগের জন্য ১৲ টাকা দিতেই সে

খুসী হয়ে চলে গেল। ঘোড়ার মালিকগণ ঘোড়াগুলি ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম নিচ্ছে। আমাদের সহযাত্রীরা সকলে এসে পৌঁছাননি এখনও। সাক্ষাৎ হল অশ্বারোহী যাত্রী স্বামী কল্যাণানন্দের সঙ্গে। আপেল-কিস্‌মিস্‌-কাজু ও ফ্লাস্ক থেকে এক কাপ বোর্ণভিটা বেব করে সংক্ষেপে জলযোগ সেরে নিলুম। এবার উৎরাই পথে চলাব পালা। এ পথের এই রীতি। চড়াই পথে আরোহণের পর অবতরণ করতে হয় উৎরাই পথে। এ ভাবে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে যাত্রা করতে হয় হিমালয় তীর্থগুলি দর্শনে। পিশুঘাটিব পথে এবার উৎরাই শুরু হল। এক মাইলেব মধ্যেই কিছুটা সমতল। যাত্রীদেব বিশ্রাম স্থান। চা-বিস্কুট ও দাল, রুটি, পবোটার ছুটি দোকান। দলে দলে যাত্রীরা ভীড় জমিয়েছে সেখানে। স্থানাভাব হেতু একটি বৃহদায়তন প্রস্তরখণ্ডে উপবিষ্ট হয়ে চা-এব পাত্রে চুমুক দিতেই সীতেনবাবু এসে গেলেন। কিছুক্ষণেব মধ্যেই এসে গেলেন স্বামী সদাত্মানন্দ ও শান্তিবাবু। স্বামী কল্যাণানন্দ অতিক্রম করে চলে গেলেন। স্থানটির নাম যোজপল বা যোজিপল। এখানে ১৫।২০ মিনিট বিশ্রামেব পর যাত্রা শুরু হল আমাদের চারজনের একসঙ্গে। আবার নীচু থেকে ওপরে ওঠা। এখান থেকে শেষনাগ ৩ মাইল পথ। গাছেব রাজত্ব শেষ হয়েছে। মাঝে মাঝে সবুজ ঘাস আব বরফ। চলেছি বাঁদিক ঘেঁষে, ডানদিকে ১ হাজার ফুট নীচে কখন বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড কখনবা বরফের গহ্বরের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে লীডার। ৬০০০´ হাজার ফুটের উচ্চে যতই ওঠা যায় ততই শস্য ও বৃক্ষাদির বংশপরম্পরার একটি পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কাশ্মীরের সমতলে চিনারবৃক্ষ ও ধানের ক্ষেত্র। তারপর সাত হাজার ফুট উচ্চে আখরোট ও খোবানী গাছ, সেই সঙ্গে ক্ষেতী-ফসল ভুট্টা ও জোয়ার। ধান আর চিনার তখন অন্তর্হিত। তার স্থান দখল করেছে জনার আর তিব্বতী যব। দশ হাজার ফুট উচ্চে ভূর্জ-গাছ। ১২০০০´ হাজার ফুটের মাথায় হিমানী—আর মাঝে মাঝে

ঘাস। ছাগল-ভেড়া চড়ান দেশ। তারপর তুষারে তুষারে সব আচ্ছন্ন। পশু-পক্ষী, গাছপালা কিছুই নেই।

যোজপল হতে এক মাইলের মধ্যেই চড়াই শুরু হয়েছে—তবে দুর্গম বা দুর্লঙ্ঘ্য নয়। উঠে চলেছি ধীর পদক্ষেপে। লীডারের উত্তাল জলরাশি উপর হতে সমতলে পতিত হচ্ছে—সরবে। বয়ে চলেছে যোজপল অভিমুখে। মাঝে মাঝে পর্বতগাত্র হতে জল বেয়ে পড়ছে নির্ঝরিণী আকারে। ৯০০০´ ফুট থেকেই এ দৃশ্য দৃষ্ট হয়। বড় বড় পাথরের ঢিপি ছড়িয়ে আছে একের পর এক বিশৃঙ্খলভাবে। পাথরের পথ সংকীর্ণ হতে শুরু করেছে। পাথরের ঢিপির ওপরে পা ফেলে চলেছি। মালবাহী অশ্বগুলি প্রাণান্ত পরিশ্রমে সংকীর্ণ পাথুরে পথে উঠতে পারছে না—পিঠের মালগুলিও ফেলে দিচ্ছে। সৈন্যবিভাগের প্রহরীগণ মালিকদের গালাগালি দিচ্ছে পয়সার লোভে—সরকারী বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে অশ্বপৃষ্ঠে অতিরিক্ত মাল বোঝাই-এর অভিযোগে। সীতেনবাবু ও আমি ঐ দৃশ্য দেখে তাদের অতিক্রম করে অন্য পথে চলে এলুম। শেষনাগ প্রবেশের ১ মাইল পূর্বে সাক্ষাৎ হল জনৈক অমরনাথ-যাত্রীর সঙ্গে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আমাদের অনুরোধ জানালেন শেষনাগ পৌঁছে একটি ষ্ট্রেচার পাঠানর ব্যবস্থা করতে।

চন্দনবাড়ী হতে ৮ মাইল পথ অতিক্রম করে সন্ধ্যার প্রাক্কালে পৌঁছে গেলুম শেষনাগ হ্রদের তীরে। এখান হতে অর্ধবৃত্তাকারে যে পথটি এগিয়ে গেছে সমতলের দিকে, প্রায় ১৫ মিনিটের মধ্যে সেখানেই আমাদের তাঁবু। সে পথ ধরেই এগিয়ে চলেছি আর দেখছি শেষনাগ হ্রদের অপরূপ দৃশ্য। প্রায় দুই মাইল বৃত্তাকারে পড়ে আছে গভীর সবুজ জলপূর্ণ একটি হ্রদ—তীর হতে প্রায় ৫০০´ ফুট নীচে। অপূর্ব জলের বর্ণ—সে বর্ণের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। হ্রদের তিনদিকের তুষার-কিরীট শৃঙ্গাবলী ও "কোহেনহর" হিমবাহের ক্রমোন্নত সমাবেশ এক অপরূপ সৌন্দর্যময় পটভূমির সৃষ্টি করেছে।

পূর্বদিকের হিমবাহের দ্রবীভূত তুষারস্রাব দ্বারা হ্রদটি পুষ্ট হচ্ছে। মনে হয় এক বর্গ মাইলব্যাপী—যেন একটি সবুজ আস্তরণ বিস্তৃত। রজত-শুভ্র তুষারস্রাব সবুজ জলের বুকে পতিত হয়ে হ্রদটির দৃশ্য অতি চমকপ্রদ ও মহিমময় করে তুলেছে। প্রান্ত দেশের উপচীয়মান বারিরাশি নয়নরঞ্জন প্রপাতরূপে নির্গত হয়ে লীডার নদী সৃষ্টি করছে। এই শেষনাগ হ্রদ! পরম রমণীয়, নিস্তরঙ্গ, নিঃশব্দ—রোমাঞ্চকর এর দর্শন। দেখে দেখে অতৃপ্ত রয়ে যায় বাসনা। চারিদিকে বিরাজিত অপূর্ব মহামৌন। যে কোন তুচ্ছ শব্দে ভঙ্গ হয় এর স্তব্ধতা। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, হ্রদটির পারিপার্শ্বিক আধ্যাত্মিক পরিকম্পন অমরনাথ হতেও উচ্চাঙ্গের। সন্ধ্যার কৃষ্ণছায়া ধীরে ধীরে নেমে এল হ্রদের বুকে—এগিয়ে চললুম বিশ্রামের তাগিদে তাঁবুর দিকে। সাড়ে ন'ঘণ্টা চলার পর আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ১১নং তাঁবুতে পৌঁছে গেলুম সন্ধ্যা ৭টায়। কুণ্ডু স্পেশ্যালের ব্যবস্থামত চা-জলখাবার এসে গেল। পরিতৃপ্তি সহকারে সেগুলি শেষ করে বিশ্রামের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলুম। স্বামী কল্যাণানন্দ, সমর মুখার্জী ও সাথের কুলি মঙ্গুর সিং এসে পৌঁছে গেছে এবং আমাদের জন্য নির্দিষ্ট খাট-গুলিতে হোল্ড-অল্‌গুলি একটি একটি করে সাজিয়ে রেখেছে। সীতেনবাবু ও আমি পৌঁছে গেছি একই সঙ্গে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন স্বামী সদাত্মানন্দ ও শান্তিবাবু। কাপে করে জল-মিশ্রিত কিছু ব্র্যাণ্ডি দিয়ে গেলেন কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্তৃপক্ষ। হোল্ড-অল্ খুলে সকলে বিশ্রাম নিতে লাগলুম। ১২০০০´ ফুট উচ্চের শীত—বিশেষ করে তিনদিকে হিমানী পর্বত খাড়া দাঁড়িয়ে, তারই সামান্য একটু উপত্যকায় আমাদের তাঁবু। শেষনাগের শীত স্মরণযোগ্য। চন্দনবাড়ী পর্যন্ত দুখানি র‍্যাগেই শীত নিবারণ হয়েছে। এখানে এসে অমৃতসরে কেনা র‍্যাগটিও কাজে লাগাতে হল। এতেও মনে হয় কোন্ ছিদ্রপথে যেন শীত প্রবেশ করছে। রাত্রি ৮টার মধ্যে নৈশভোজন সমাপ্ত করে সকলে নিঃশব্দে শুয়ে পড়লুম। রীতিমত

গরম জল ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে। নিশাপানের অভ্যাস থাকায় আমি অবশ্য চন্দনবাড়ী হতেই ফ্লাস্কে গরম জল রাখা শুরু করে দিয়েছি। ঐতিহাসিকদের মতে শেষনাগের নামকরণের মূল কারণ হল ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে দুর্লভ নামে একজন নাগবংশীয় রাজা কাশ্মীরে রাজত্ব আরম্ভ করেন। এই বংশেরই সুশ্রব নামে এক ব্যক্তি এই হ্রদের তীরে কঠোর তপস্যা করে এটিকে তীর্থে পরিণত করে যান, তাঁরই নামানুসারে এই হ্রদের নাম সুশ্রবনাগতীর্থ বা শেষনাগ। মতান্তরে তুষারস্রাবগুলি সরীসৃপ বা নাগের গতিতে হ্রদটিতে পতিত হচ্ছে বা শেষ হচ্ছে—এজন্য এর নাম শেষনাগ। যাই হোক, বিতর্কমূলক প্রশ্নের স্থান এটি নয়। ভোর ৫টায় উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করে—ভোরের চা-পান শেষ করে—রজনীর আতিথ্য শেষে —হোল্ড-অল্ গোটানর পালা এল। সকাল ৭-৩০ মিনিটে জলযোগ ব্যবস্থাও শেষ হল। উচ্চতার তারতম্যে শৈল-পীড়া আরম্ভ হয়েছে অনেকেরই; সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের উপর স্পৃহা ক্রমেই কমে আসছে। শুষ্ক বা টিনজাত খাদ্যদ্রব্য কিংবা জ্যাম, জেলিজাতীয় মুখরোচক খাদ্যের প্রতি লোলুপতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্তৃপক্ষ সে বিষয়ে উদাসীন। তাঁরা যাত্রীদের সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা না করেই তাঁদের প্রথামত খাদ্যসরবরাহ ব্যবস্থা চালু রেখেছেন। ফলে অপচয় হচ্ছে প্রচুর মধ্যাহ্ন ভোজনের খাদ্যদ্রব্যগুলি। পরবর্তী কালে অন্ততঃ শেষনাগ হতে তাঁদের পদ্ধতিগত খাদ্যসূচীর পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। এতে কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্তৃপক্ষ ও যাত্রীসাধারণ উভয় পক্ষই হবেন উপকৃত। যাই হোক, ৮-৪০ মিনিটের মধ্যে খিচুড়ি, পাঁপর ভাজা সহ আলু-চচ্চড়ি ও সেই সঙ্গে স্বামী সদাত্মানন্দজী আনীত আনারসের জেলি কিছু মুখে দিয়ে পঞ্চতরণীর পথে যাত্রার উদ্যোগ শুরু হল।

॥ **পঞ্চতরণী** ॥

২৬শে আগষ্ট ৯-৪০ মিনিটে শেষনাগ হতে রওনা হয়ে পঞ্চতরণী অভি-মুখে ধীরে-মন্থরে হাঁটতে শুরু করেছি স্বামী সদাত্মানন্দ, শান্তি-বাবু ও সীতেনবাবু সহ আমরা চারজনে। শেষনাগ হতে পঞ্চতরণীর দূরত্ব ৮ মাইল, উচ্চতা ১২২৩০´ ফুট। মস্থুর সিং হাতেব মালগুলি নিয়ে পূর্বেই রওনা হয়ে গেছে। দেড় মাইল সাধারণ চড়াই উত্তরণের পর ওয়াভজান ঘাঁটি অতিক্রম করে চলে এলুম।

এখান থেকে সর্বত্রই জ্বালানী কাঠের অভাব। জুনিপার নামে এক প্রকার সহজদাহ্য বৃক্ষগুলিই জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয় এবং কাঁচা অবস্থাতেও জ্বলে। ১২০০০´ ফুটেরও অধিক উচ্চতা হেতু ও চতুষ্পার্শ্বে কোন পর্বতাদির অন্তরাল না থাকায় এখানে বায়ুপ্রবাহ অত্যন্ত বেগ-বান ; এজন্য এর নাম বায়ুজান। আগে-পিছে অশ্বগুলি সারি সারি চলেছে, তাদের ফাঁকে ফাঁকে আমরাও চলেছি। কিছুক্ষণ চলার পর শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হল। কারণ এক মাইল পর চতুর্দিক পর্বত-বেষ্টিত ; তারই মাঝে ক্রমনিম্নভূমির উপর দিয়ে পথ ক্রমশই নীচের দিকে নেমে গেছে। কিছুক্ষণ চলার পর সাক্ষাৎ হল ছয় বৎসর বয়স্ক অনুপ সামন্তের সঙ্গে—তার মাতা-পিতার সঙ্গে হাসিমুখে চলেছে পরম নিশ্চিন্তে। অক্সিজেন্ ক্রমেই কমে আসছে ফলে শ্বাসকষ্ট অনুভূত হচ্ছে। মাঝে মাঝে এ্যাসিড্ ড্রপ লজেন্স মুখে দিচ্ছি ও চলেছি। সামনেই মহাগুণাস্ গিরিসংকটের ভীষণ চড়াই। চওড়া দুটি পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে উঠতে হচ্ছে—যেন বুক বেয়ে ওঠা। এই গিরিসংকটে পৌঁছিবার পূর্বে মাঝে মাঝে তুষারের ওপর চলতে হয়। চড়াইটা ১½ মাইল। এর পর একটা বাঁক—তারপর একটা বিরাট পাহাড় ; তার বুকের ওপর দিয়ে পথ—সকলেই কিছুদূর যাচ্ছি, হাঁপাচ্ছি, বিশ্রাম নিচ্ছি আবার যাচ্ছি। পথের যেন শেষ নাই। চলতে অক্ষম ব্যক্তি ও বৃদ্ধারা অনেকেই ধ্বনি দিচ্ছে "জয় বাবা অমরনাথজী কি জয়"। একেবারে উঠতে অক্ষম একজন বৃদ্ধা পথের মাঝে দাঁড়িয়েই করযোড়ে

দুহাত তুলে আবেদন জানাচ্ছেন, "বাবা তুমিই ত পথে বের করেছ, তুমিই নিয়ে যাবে—একি আমাদের শক্তিতে সম্ভব?" সেই আকুল আবেদন শ্রবণে অনেকেই যাত্রা-বিরতি দিয়ে বিশ্রামের অছিলায় দাঁড়িয়ে পড়লুম কিছুক্ষণের জন্য। মনে হল, এ শুধু বৃদ্ধারই আবেদন নয়। দুর্গম যাত্রাপথের সকল যাত্রীরই এটি প্রাণের আকুতি—যা বৃদ্ধাটি সকলের পক্ষ হতে প্রতিনিধিরূপে অমরনাথজীর চরণে পৌঁছে দিচ্ছে। চেয়ে দেখি পিশুঘাটিব সেই গেরুয়া পরা বৃদ্ধাটি। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার তিনি চলতে লাগলেন। ভারতের প্রতিটি অঞ্চল হতে আসেন বিভিন্ন বিচিত্র চরিত্রের মানুষ এই শ্রাবণী-পূর্ণিমায় অমরনাথজীকে দর্শনের আশায়। পথ চলতে এমনিতর কত যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয় তা ভাষায় প্রকাশের অবকাশ থাকে না। মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত হয়ে থাকে অক্ষয় স্মৃতিরূপে। পশ্চাদ্দেশে দুটি চাকা বেঁধে জনৈক পঙ্গু চড়াই-উৎবাই করে চলেছে সারা পথ। কখন স্বচেষ্টায় কখনবা সৈন্যবিভাগের প্রহরীদের সহায়তায় তার ঈপ্সিত দেবতার চরণে প্রাণের আকুতি নিবেদন করতে। এগিয়ে চলেছি মহাগুণাসের দিকে। উচ্চতার তারতম্যে ক্রমেই অক্সিজেন্ কমে আসছে, শ্বাস-প্রশ্বাসে বিশেষ কষ্ট অনুভূত হচ্ছে। ১০।১৫ মিনিট অন্তর লাঠিতে ভর দিয়ে বিশ্রাম নিয়ে আবার চলতে হচ্ছে।—এ পথের এই রীতি। ক্লান্তিও আসে যেমন সত্বর অন্তর্হিতও হয় সামান্য বিশ্রামেই। আবার পথ চলা হয় শুরু। কারো প্রতি কারো হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, কোন প্রতিযোগিতার ভাব নাই, যে যতটুকু পথ অতিক্রম করতে পারছি, সেটিই লাভ। পরস্পরের সহানুভূতি নিয়ে যার যতটুকু সামর্থ্য অপরকে দিয়ে, পথের সাথীকে আপনজন করে নিয়ে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই চলেছি—এক মন, এক প্রাণ হয়ে, একই প্রার্থিত দেবতার চরণে সমর্পিত-চিত্ত হয়ে। দূরে একটা গিরিশৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে মন্দিরের মত, কিছুটা পিরামিডের আকার—ঢালু হয়ে চলে গেছে মাইলখানেক—একটা পাহাড়ের গাত্রদেশ। সেই ঢালুর গায়ে নীলের

ফলকে লেখা "Top ahead"—সম্মুখে শীর্ষদেশ। মনে একটু স্বস্তিবোধ এল—এই ভেবে যে, শীঘ্রই সমাপ্তি ঘটবে এই প্রাণান্তকর চড়াই উত্তরণ পর্বের। গাছপালা, পশু-পক্ষী কিছুই নাই—কেবল উপরের দিকে চলেছে ধীরে ধীরে মানুষের সারি ও ঘোড়াব দল। পৌঁছে গেলুম ১৪০০০´ ফুট উচ্চ মহাগুণাস্ গিরিসংকটে। এখানে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে অক্সিজেন্ ও স্মেলিং সল্টের আঘ্রাণ নিয়ে এগিয়ে গেলেন অনেকেই। অক্সিজেনের অভাব হেতু এখানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করা সমীচীন নয়। অমরনাথেব পথে সর্বোচ্চ গিরিশিখর এই মহাগুণাস্। শিখরদেশে সমভূমিতে ষ্টীল ফলকে ইংরাজী হরফে লেখা "Mahagunas—14000 ft."—মহাগুণাস্—১৪০০০´ হাজাব ফুট। পায়ে হেঁটে ১৪০০০´ হাজার ফুট অতিক্রম কবাব সামর্থ্যে মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

বিচিত্র বর্ণের ছোট বড় প্রস্তরখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। চতুর্দিকের দৃশ্য অতি রোমাঞ্চকর। এই মহান্ দৃশ্য সমতলবাসীদেব চমক লাগিয়ে দেয়। শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ উঁচু হয়ে উঠেছে—তুষারে তুষারে আচ্ছন্ন। তার ওপর সৌরকিরণ প্রতিফলিত হয়ে দর্শকচিত্তে এক অনন্তলোকের রহস্য উন্মোচন কবে দেয়। ৫।৬ মিনিট বিশ্রামের পর ঢালুপথে উৎরাই শুরু হল। মহাগুণাস্ থেকে পঞ্চতরণী পর্যন্ত নেমে গেছে উৎরাই পথ; তন্মধ্যে "কইল" নদের তট পর্যন্ত ১½ মাইল দীর্ঘ ঢালু পথ—তরঙ্গে তরঙ্গে ভূমিভাগের নতোন্নতার সীমার ইঙ্গিত জানিয়ে নেমে গেছে গভীর হতে গভীরে। কেন জানি না, উৎরাই পথে অব-তরণের একটি ক্ষিপ্রতা আছে আমার। ভীষণ ঢালু পথে কখন বড় বড় পাথরের ওপর পা ফেলে কখনবা পিচ্ছিল মৃত্তিকা পথে পা ফেলে দ্রুত নামতে লাগলুম। সহযাত্রী সীতেনবাবু, সদাত্মানন্দজী ও শান্তি-বাবু এঁরা প্রায় ১½ মাইল পশ্চাতে রয়ে গেছেন। একেবারে ১½ মাইল উৎরাই পথ অবতরণ করে কইল নদের তটে একটি সমতলে এসে বিশ্রাম নিতে লাগলুম। অমরনাথের পথে চড়াই-এর দিক থেকে

"পিশুঘাটি" আর উৎবাই-এর দিক হতে "মহাগুণাসের" উৎরাই চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সাথের ফ্লাস্কটি হতে কিঞ্চিৎ বোর্ণভিটা বের ক'রে চুমুক দিয়ে শ্রান্তি অপনোদন করলুম। আধ ঘণ্টা বিশ্রামের পর সীতেনবাবুও কিছুক্ষণের মধ্যে স্বামী সদাত্মানন্দ ও শান্তিবাবু এসে গেলেন। সাধু-সন্ন্যাসী ও বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়েদের দল এখানে-সেখানে ছড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। পাশেই একজন সাধু জ্বরে কাতরাচ্ছে। চারজনে মিলে তক্তার সেতু পার হয়ে কিছুদূর অগ্রসর হতেই দেখা হ'ল পিশুঘাটির কিশোরীটির সঙ্গে, বাপের সঙ্গে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। কইল নদী হতে পঞ্চতরণী ৩½ মাইল পথ। এ পথে আর বিশেষ চড়াই নাই। এঁকেবেঁকে পঞ্চতরণীর শাখানদীগুলি তিনবার অতিক্রম করে কখন দক্ষিণ তীর কখন বাম তীর ধরে অগ্রসর হয়ে চলেছি পঞ্চতরণীর ঘাঁটির দিকে। কইল নদ হতে দু' মাইল নগরপাল ও সেখানে হতে আরও ১½ মাইল পথ অতিক্রম করে বৈকাল ৪-১৫ মিনিটে পঞ্চতরণীর উপলবিস্তৃত নদীশয্যায় যেখানে তাঁবুগুলি খাটান হয়েছিল সেখানে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ১১ নং তাঁবুর সন্নিকটে উপস্থিত হলুম।

পঞ্চতরণীতে পাঁচটি নদীর ধারা এক হয়ে মিশেছে। খুব উঁচু পাহাড়ের ঘাঁটিতে ভরা। নদীশয্যা হতে পাহাড়গুলি খাড়া উঁচু হয়ে আছে—তারই উত্তর-পশ্চিমদিকের একটি পাহাড় হতে নেমে আসতে হয় এই নদীর বুকে। এই পঞ্চতরণী হতেই দৃষ্ট হয় সোজা উত্তরে একটা খাড়া পাহাড়—ঐ পাহাড়টিই এককালের অমরনাথ যাত্রার পথ বুকে ধরে রেখেছে। ঐ প্রাচীন পথেই স্বামী বিবেকানন্দ অমরনাথ যাত্রা করেছিলেন। এখন ঐ পথটি তার ভয়াবহতার জন্য পরিত্যক্ত। তাতে খাড়াইএর ভয়াবহতা কিছুটা লাঘব হয়েছে বটে। তবে পথের সংকীর্ণতা ও ভয়ালতা কমেনি। কারণ, মানুষ, অশ্বারোহী যাত্রী এবং অশ্ব এ পথে আজও গড়িয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অমরনাথ যাত্রার সমগ্র পথটি যদি মানুষ চোখে দেখতে পেত তাহলে এই দুঃসাহসিক

অভিযানে অনেকেই অংশ গ্রহণ করতে সাহসী হত না। মুখার্জি সহ আমরা ছ'জনেই তাঁবুতে আপন আপন সুবিধামত খাটের ওপর স্থান করে নিয়েছি। মুখার্জি আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে স্বামী কল্যাণানন্দজীও এসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। সীতেনবাবু, সদাত্মানন্দ ও শান্তিবাবু সহ আমরা চারজন এসে তাঁবুতে বিশ্রাম নিতে শুরু করলুম। ইতিমধ্যে বৈকালিক চা জলখাবার এসে গেল—গতানুগতিক খাদ্যদ্রব্যে বিশেষ স্পৃহা না থাকায়, মস্তুর সিংকে তার কিছু অংশ দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যৎকিঞ্চিৎ মুখে দিলুম। সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এল পঞ্চতরণীর বুকে—সঙ্গে সঙ্গে কন্‌কনে শীতের প্রকোপ বাড়তে লাগল। তবে কেদার-বদরীতে অক্সিজেন্ অভাবে সূর্যাস্তের পর রাত্রে শ্বাসকষ্টজনিত নিদ্রার যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছিল এখানে সেরূপ বিশেষ কিছু অনুভূত হয়নি। এই পঞ্চতরণীর নদীশয্যা হতে এক মাইল পথ অতিক্রম করে যে দিকটায় নদীগুলি সঙ্গম সৃষ্টি করে প্রবল স্রোতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে তারই তীরে গড়ে উঠেছে একটি অস্থায়ী ছোট শহর শ্রাবণী-পূর্ণিমা উপলক্ষে। হোটেল, রেস্তোরাঁ, পোষ্ট অফিস, টেলিগ্রাফ অফিস সহ ছোটখাট অনেক দোকান। আমাদের তাঁবুগুলি তারই ঠিক বিপরীত দিকে।

শ্রাবণী-পূর্ণিমায় প্রায় ১০।১২ হাজার যাত্রীর তাঁবু পড়ে এই পঞ্চতরণীর উভয় তটে। এই সময়ে পঞ্চতরণীকে সমগ্র ভারতের একীভূত ক্ষুদ্র মূর্তি বলে মনে হয়। ভাষায়, পরিচ্ছদে ও আচার-ব্যবহারে বিভিন্নতা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যের ঐক্য সর্বভারতীয় ঐক্যের কল্পনাকে বাস্তবে সার্থকতা প্রদান করে। রাজনৈতিক নেতারা আজও যা বহু বক্তৃতাদির মাধ্যমেও সম্ভব করে তুলতে সক্ষম হননি। রাত্রি ৮টার মধ্যে নৈশভোজন সমাপ্ত করে যে যার খাটিয়ায় যার যা সম্বল সব জড়িয়ে শুয়ে পড়লুম। রাত্রে একবার তাঁবুর বাইরে এসে কোনরূপে ভিতরে প্রবেশ করে তিনটি র‍্যাগের নীচেও শীতের প্রকোপে নিজের বুকের দুর্ দুর্ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে

ওপারের লাউড স্পীকার হতে শোনা যাচ্ছে "ছড়িদার রাত্রি ৪টায় অমরনাথ যাত্রা করবেন"। আমাদের তাঁবুর দিকটা বেশ নির্জন ও নিরিবিলি। কুণ্ডু স্পেশ্যালের ম্যানেজার বাদলবাবু বলছিলেন এবার শ্রাবণী-পূর্ণিমায় দর্শনার্থীর সংখ্যা কম। কারণ ওপারের তাঁবু হতে কলরবের তারতম্যে সেটি বোঝা যায়। তুলনামূলকভাবে এবার উক্ত কলরব কম।

শ্রাবণী-পূর্ণিমায় অমরনাথ দর্শনার্থীদের শেষ শিবির এই পঞ্চতরণী। সুতরাং মোট দর্শনার্থীব সংখ্যা এখানে সহজেই অনুমেয়। ছড়িদারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রওনা হয়ে গেলে দর্শনেব সুবিধা এতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই হাড়-কাঁপানো শীতে, অজানা পার্বত্যপথে আলো-আঁধাবের মাঝে চড়াই-উৎরাই ও ৩ মাইল তুষারপথ অতিক্রম ক'রে অন্ততঃ কুণ্ডু স্পেশ্যালেব কর্তৃপক্ষ ও যাত্রীদেব কেউ হুঁসিয়ার হয়ে এই দুস্তর পারাবার লঙ্ঘনের জন্য শক্ত মুঠোয় হাল ধরতে রাজী হলেন না। তারায় তারায় ভবা, চন্দ্রালোকবিধৌত, শীতজর্জরিত পঞ্চতরণীব রাত্রির অবসান হল। শেষ বাত্রির কিবণস্নাত সুনির্মল আকাশে একটা উদার ছন্দ। বরফ-ছাওয়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে হিমাংশুতে হিমানীতে নিবিড় আলিঙ্গন।

॥ **অমরনাথ** ॥

অতি প্রত্যূষেই অমরনাথ দর্শনে যাত্রাব কথা। কিন্তু প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে পাঁচজনে একত্রে মিলিত হয়ে রওনা হতে বিলম্ব হল। ২৭শে আগষ্ট ৬-৪০ মিনিটে অমরনাথেব পথে পা বাড়ালুম। সবুজ ঘাসের ওপর সরের মত পাতলা বরফের আস্তরণ। তার ওপর প্রভাতী সূর্যের কিরণ মুক্তার ঝালরের মত ঝলমল করছে। এগিয়ে চলেছি হাতের লাঠিটি নিয়ে পঞ্চতরণীর নদীশয্যার ওপর দিয়ে। ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতীগুলি চলেছে অমরগঙ্গায় আত্মসমর্পণ করে সার্থক হতে—যে গঙ্গার উৎপত্তি অমরনাথের শীর্ষদেশে জ্ঞানসর হতে। প্রায়

১ মাইল পথ অতিক্রম করে উত্তরমুখে চলেছি নদীর দক্ষিণ তীর ঘেঁষে। এরই পূর্ব তীরে গড়ে উঠেছে অস্থায়ী শহব শ্রাবণী-পূর্ণিমা উপলক্ষে। এ দিকটায় নদীর গতিবেগ প্রবল। যে পথ ধরে চলেছি তার নাম হল "সন্ত সিং মার্গ"। প্রাচীন পথ ছিল ভৈবব ঘাটি হয়ে। বণজিৎ সিংহের আত্মীয় সন্ত সিং এ পথেই অমবনাথ যাত্রা করেছিলেন প্রাচীন পথ পরিত্যাগ করে। তাঁর নামানুসারেই এ পথেব নাম "সন্ত সিং মার্গ"। পরবর্তী কালে যাত্রীসাধারণেব সুবিধার্থে পথটিকে আরও সুগম কবে তোলা হয়েছে। এখন এ পথেই সকলে অমরনাথ-গুহা যাত্রা করে থাকেন। এবপব একটা ববফের পাহাড়েব গা ঘেঁষে নদীব ধারে ধারে দশ মিনিট চলাব পবই আবম্ভ হল ভীষণ চড়াই। পথ সংকীর্ণ, ঘাসে ঘাসে ও পাহাড়ীফুলে শোভমান। নীচে থেকে উপবেব লোকগুলি দেখতে বেশ লাগছে—যেন পুতুলের সারি, পিল-পিল করে চলেছে। এ পথে এখন অশ্বাবোহী যাত্রী নাই। নিয়মমত অমবনাথ দর্শনের প্রথম সুযোগ লাভ করেন ছড়িদার। তাবপবই দর্শন শুরু হয় পায়ে-হাঁটা যাত্রীদেব। বেলা ১০টাব পর অশ্বারোহী যাত্রী ও ডাণ্ডীর যাত্রীরা সুযোগ পাবেন দর্শনের। ধীরে ধীবে উঠে চলেছি। পাহাড়টির উচ্চতা দেখে প্রথমে মনে হয় যেন ওঠা আর যাবে না। কিন্তু তাও সম্ভব হয়। পাহাড়টা ওঠার পব বেড় দিয়ে নামা শুরু হল। ওঠাব সময় বিকট শব্দে একটা তুষার ধ্বস পড়ল নীচের নদীতে, তার প্রতি-শব্দ ছড়িয়ে পড়ল তরঙ্গে তরঙ্গে পর্বতের শীর্ষে শীর্ষে। হেঁটে চলেছি দ্রুতপদে। এই পথই গিয়ে নেমেছে অমরগঙ্গায়। পথে পরিচিত অনেক যাত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে লাগল। বহু অগ্রগামী যাত্রীও পশ্চাতে রয়ে গেলেন। অপেক্ষাকৃত স্থূল ব্যক্তিগণ ব্যতীত সকলেই এই কয় মাইল পথ পয়দলে চলেছেন। আমাদের কোচটিরও অনেকেই চলেছেন পায়ে হেঁটে। তবে পাহালগাম হতে দীর্ঘ পথ যাঁরা অশ্বারোহী যাত্রীরূপে বা ডাণ্ডীতে এসেছেন তাঁদের পক্ষে প্রথম এই চড়াই পথে চলা হয়ে উঠেছে দুষ্কর। বরাবর হাঁটা-পথের যাত্রীরা দ্রুতপদে

অতিক্রম কবে চলেছেন এই চড়াই পথটুকু। কারণ কয়েকদিন অবিরত চড়াই-উৎরাই-এর ফলে তাঁদের সাবলীলতা এসেছে এ ধরনের পথ চলায়। সঙ্গে চলেছে মন্সুর সিং। প্রায় ১ মাইল পথ এগিয়ে এসেছি অন্যান্য যাত্রীদের তুলনায়। চড়াই শেষ—নামছি এঁকেবেঁকে উৎরাই পথে। এ পথে আর কোন চড়াই নেই। সবই প্রায় উৎরাই। কেবল গুহামুখে সামান্য একটু চড়াই। পাহাড়টি অতিক্রম করার কিছুক্ষণের মধ্যেই তুষার পথে চলা শুরু হল। এ অভিজ্ঞতা নূতন নয়। কেদারের পথে ১ মাইলেরও অধিক তুষার পথ অতিক্রম করেছি এক সময় তাই বিস্ময়ের কিছুই নাই। তবে এখানে তিন মাইলের মত পথ তুষারের ওপর দিয়ে চলতে হবে। অন্য বৎসর শ্রাবণী-পূর্ণিমায় এটিই হাঁটতে হয় ৪ মাইলের কিছু অধিক। এ বৎসর ভাদ্র মাসে শ্রাবণী-পূর্ণিমা, তাই অনেকটা পথ তুষারমুক্ত। কেউ কারো জন্য চিন্তা না করে হেঁটে চলেছি মনের আনন্দে—পিছন ফিরে না চেয়ে। দৃষ্টি শুধু সামনের দিকে। গতানুগতিক চলার পথ পরিত্যাগ করে মন্সুর সিংকে অনুসবণ কবে চলেছি – তুষার পথে। কারণ যে তুষার পথে ক্রমাগত ঘোড়া ও মানুষ চলাচল কবে তা হয়ে ওঠে পিচ্ছিল, ফলে পা পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা অধিক। স্তব্ধ হিমানীর ওপর সৌরকিরণ প্রতিফলিত হয়ে শত বর্ণে ঝলকে উঠে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। পকেট থেকে গগল্‌সটি বের করে চোখে দিয়ে পথ চলতে লাগলুম, মশ্‌মশ্‌ শব্দে তুষার ভাঙতে ভাঙতে। হাতের লাঠির সূচাল নালটি মাঝে মাঝে গেঁথে যাচ্ছে জমাট তুষারে। মন্সুর সিং দ্রুত এগিয়ে গিয়ে অমরগঙ্গার তীরে বিশ্রাম নিচ্ছে। বহু পুণ্যার্থী নরনারী স্নান সেরে নিচ্ছেন অমরগঙ্গার তুহিন্‌-শীতল জলে। প্রতিটি যাত্রীর মনে আনন্দের একটি স্ফুরণ। অদূরে দেখা যাচ্ছে অমরনাথের গুহামুখ। সকলেই “জয় অমরনাথজী কি জয়” বলে ধ্বনি দিচ্ছেন। অনাস্বাদিত পুলকে দেহমনে শিহরণ জাগে।

ঐখানে—ঐ গুহামুখেই প্রবেশ করতে হবে সকলকে। এখানে

অমরগঙ্গা যেমন খরস্রোতা তেমনি হিমশীতল তার জল। সদ্য-বিগলিত তুষার, নদীর আকারে নেমে আসছে অমরগুহার উপরিস্থ জ্ঞানসর হতে। অমরগঙ্গার পাশে সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে বসে বিশ্রাম নিতে লাগলুম। আমাদের সাথের কুলি মস্থুর সিং তার গাত্রাবরণ উন্মোচন করে মাত্র একটি অন্তর্বাস পরিধান কবে সেই তুহিন-শীতল জলে স্নান সেরে নিল। আমারও লোভ হচ্ছিল ঐভাবে স্নান করে নিতে। কিন্তু পূর্ব প্রস্তুতি না থাকায় অমরগঙ্গার পুণ্যবাবি দিয়ে মস্তকটি বেশ কবে ধৌত করেই সন্তুষ্ট থাকতে হল। সঙ্গে ছোট শিশিতে অমরগঙ্গাব জল ভর্তি করে পুনবায় চলতে লাগলুম। এ পথটুকু তুষারমুক্ত। এভাবে প্রায় আবও ২০ মিনিট চলার পর ১২৭২৯´ ফুট উচ্চ অমবনাথ গুহার পাদদেশে পৌছে গেলুম বেলা ৯-৪৫ মিনিটে পঞ্চতরণী হতে ৪ মাইল তুষার পথ অতিক্রম করে। এখানেই কুণ্ডু স্পেশ্যালের একটি ছোট শিবির পড়েছে। লাল শালুতে বড় বড় হরফে লেখা "কুণ্ডু স্পেশ্যাল"। এর পরেই গুহাভিমুখে যাত্রার জন্য চড়াই শুরু হল। গুহাটির পাদদেশ হতে গুহামুখ প্রায় ৬০০´ ফুট উচ্চ। এখান হতেই দর্শনার্থীগণ দলে দলে সাবি দিয়ে দাঁড়িয়ে। বড় বড় পাথরের উপর পা ফেলে কিছুদূব গিয়ে সোজা সারি দিয়ে উঠতে হল গুহামুখে। হাজাব হাজার নরনারী সাবি দিয়ে দাঁড়িয়ে গুহামুখ অবধি। মস্থুর সিং কিছুটা বিপথে নিয়ে গিয়ে গুহাটির স্বল্প দূরে সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে যেতে বলল। সে আরও চড়াই পথে উঠে গুহামুখের সন্নিকটে পেঁাছে গেল। সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি—সহযাত্রীদের কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই। একদিনের জন্য কোলাহল মুখরিত হয়ে উঠেছে নির্জন, নিস্তব্ধ এই গিরিপথ। শিখরদেশের তুষারস্তূপ অকলঙ্ক নগ্ন শুভ্রতায় ঝলমল করছে—তার উপর রৌদ্র-স্রোত সহস্রধারায় ক্ষরিত। উন্মুখ প্রতীক্ষায় সকলেই দণ্ডায়মান—কখন লোহার রেলিং ঘেরা দরজাটি উন্মুক্ত হবে তারই আশায়। প্রবেশ পথের রেলিং দেওয়া দরজাটি ১০।১৫ মিনিট অন্তর উন্মুক্ত হচ্ছে—

আর জলস্রোতের মত জনপ্রবাহ প্রবেশের জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে। দুজন করে সৈন্যবিভাগের প্রহরী প্রবল জনস্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হচ্ছে না। ফলে একটা চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে প্রবেশ পথে। পঞ্চাশ ফুট উঁচু হতে টুপটাপ করে পড়ছে হিমশীতল জলবিন্দু—গায়ে মাথায়। দর্শনার্থীদের অনেকেই দুটি পারাবত দর্শনের আশায় গুহা-মধ্যস্থ উচ্চতার দিকে উৎকণ্ঠ হয়ে চেয়ে আছেন। কেউবা মাঝে মাঝে হাতে তালি দিচ্ছেন। আসলে কিন্তু কতকগুলি তুষার-পারাবত (এরা তুষার অঞ্চলেই বাস করে) চিরদিনই এই গুহাটিতে বাস করে। শ্রাবণী-পূর্ণিমার জনসমাগমে মাঝে মাঝে তারা এই নির্জনবাস ত্যাগ করে ভিতর-বাহির করতে থাকে। সাধারণ দর্শনার্থীরা এগুলি দেখেই শিবদর্শনের ফল লাভ হল বলে সন্তুষ্ট থাকে। যেহেতু এরূপ একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে স্মরণাতীতকাল হতে। সারিতে দাঁড়িয়ে দেখি সামনেই আমাদের এ্যাসিষ্টেন্ট ম্যানেজার অমরবাবু। তাঁর সঙ্গে গল্পের অবকাশে সময়াতিবাহিত করছি। পশ্চাতেই কয়েক হাত দূরে সীতেনবাবু। প্রবেশ পথের দ্বার উন্মুক্ত হল—জনতার প্রবল চাপে তিনজনেই ছিট্‌কে পড়লুম। কে কোথায় রয়েছি দেখার অবকাশ নাই। কিছুক্ষণ পর চেয়ে দেখি অমরবাবু কয়েক ফুট এগিয়ে গেছেন জনতার প্রবল চাপে। সীতেনবাবুর সাক্ষাৎ মিলল না শ্রাবণী-পূর্ণিমার দর্শনার্থী নিয়ন্ত্রণে জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের নিদারুণ ব্যর্থতায় মন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেও দর্শনের আশায় যাত্রীরা এগিয়ে চলেছেন সামনের দিকে। ভীড়ের চাপে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে। অথচ সৈন্যবিভাগের বেশ কিছু সংখ্যক প্রহরী নিযুক্ত করে এই প্রাণান্তকর অবস্থার সুষ্ঠু সমাধান মোটেই অসম্ভব ছিল না জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের পক্ষে। কেবলমাত্র কয়েকজন প্রহরী প্রবেশ ও বাহির পথের রেলিংঘেরা দরজাটি উন্মুক্ত ও বন্ধ করার কাজে নিযুক্ত থাকায় এবং অবৈধভাবে বাহির পথের দরজা দিয়ে সুবিধাবাদী দর্শনার্থীদের প্রবেশাধিকার দান করায় প্রবেশ পথের দরজাটি

স্বভাবতই উন্মুক্ত হতে অযথা বিলম্ব হচ্ছে এবং দরজাটি উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলস্রোতের ন্যায় বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থী রেলিংএর অভ্যন্তরে প্রবেশলাভের জন্য সচেষ্ট হওয়ায় অপেক্ষাকৃত বলহীন ব্যক্তি ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণ ভীড়ের চাপে পদতলে পিষ্ট হয়ে কাতরোক্তি করছেন। এই অভূতপূর্ব অবস্থা দৃষ্টে বিস্মিত ও বিমূঢ় হয়ে পড়লুম। বিশেষ করে অমরনাথের মত একটি দুর্গম তীর্থে এসে শান্ত ও আনন্দময় পরিবেশে অমরনাথজীর দর্শন না হওয়ায় অনেকেই জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের এই অব্যবস্থার জন্য মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগলেন। যাই হোক, এরূপ অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মধ্যে তৃতীয়বার দ্বারটি উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু কষ্টে রেলিংএর বাঁ পাশ দিয়ে চত্বরে প্রবেশ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। গুহাটির দৈর্ঘ-প্রস্থ প্রায় ১৫০´ ফুট এবং গভীরতা প্রায় ২০´ ফুট। গুহাটি দেখে মনে হয় যেন কোন নিপুণ শিল্পীর হস্তাবলেপ রয়েছে এর নির্মাণকার্যে। কিন্তু এটি প্রকৃতির এক বিচিত্র অবদান—এর পশ্চাতে নাই কোন শিল্পীর নির্মাণচাতুর্য। প্রবেশ পথে উত্তরদিকের দেওয়ালের নিকট প্রায় মধ্যস্থলে একটি বেদী—তার উপর লিঙ্গমূর্তি। এ বৎসর শ্রাবণী-পূর্ণিমা ভাদ্র মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়ায় লিঙ্গমূর্তির অধিকাংশ দ্রবীভূত হয়ে স্বল্পই অবশিষ্ট ছিল। শ্রাবণী-পূর্ণিমা যে বৎসর শ্রাবণ মাসে পড়ে তখন লিঙ্গমূর্তিটির আকার প্রায় ৭½´—৮´ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। নিশাপতির হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে এই লিঙ্গমূর্তিটিরও যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে বলে কিংবদন্তী আছে তা সর্বৈব মিথ্যা। স্বামী প্রণবানন্দ দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থানের পর এই সত্যে উপনীত হয়েছিলেন যে, আষাঢ় এবং শ্রাবণ মাসে লিঙ্গটি তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট হয় এবং ভাদ্র মাসে সেটি ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হয়ে স্বল্পই অবশিষ্ট থাকে। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অমরনাথের তুষারলিঙ্গ অন্যান্য তুষারস্তূপের মতই শীতকালে গড়ে ওঠে এবং গ্রীষ্মে দ্রবীভূত হয়ে থাকে। পার্শ্বের গহ্বরে রাশি রাশি পাথরের সাদা গুঁড়া ; অমরনাথের

বিভূতি বলে যাত্রীরা মুঠো-মুঠো সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে। এই লিঙ্গের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে আরও দুটি তুষারস্তূপ গড়ে ওঠে—একটির নাম গণেশ ও অপবটির নাম পার্বতী। আমাদের দর্শনকালে এ দুটির আকারও ক্ষুদ্র ছিল। বামদিকে একটু স্থান ব্যতীত সর্বত্রই জল পড়ছে চুঁইয়ে। লিঙ্গমূর্তির সামনে ও মস্তকেও পড়ছে কিন্তু এ সময়ে জলবিন্দুগুলি বরফের আকারে পরিণত হতে দেখিনি।

তবে যাঁরা অমবনাথের পূর্ণাবয়ব মূর্তি শ্রাবণ মাসে বা তৎপূর্বে চাক্ষুষ করেছেন তাঁদের মতে এই মূর্তির বিচিত্রতা হল ঃ

"এই তুষারলিঙ্গের সংগঠন। এক ফোঁটা জল ডাইনে বামে পড়ে লিঙ্গাকার হচ্ছে না কেন বোঝা যায় না। লিঙ্গের সামনে যে বিন্দুটি পড়ছে তা স্তূপে পরিণত না হয়ে গহ্ববাকারে পরিণত হচ্ছে। জলকে শিলীভূত না করে দ্রবাবস্থায় ধাবণ করছে। লিঙ্গের তুষার এত স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল আব তার গঠন এমন দৃঢ় যে, সামান্য চন্দ্রালোকেও তা জ্বল্ জ্বল্ করে। বুঝতে পারি না অমরনাথেব লিঙ্গমূর্তির ভিতরে ঐ ভাস্বরতা কেমন কবে সম্ভব। বরফ এমনি শুভ্র, মসৃণ কিন্তু অমরনাথ লিঙ্গের জমাট বরফ দেখলে মনে হয় যেন স্ফটিক বা ফিট্‌কারীর ক্রিষ্ট্যাল। ভিতর থেকে যেন প্রভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পাণ্ডারা বলে 'মহিমা'।" হয়তো বা তাই।

রেলিং পার হয়ে চত্বরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সব ক্ষোভ, সমস্ত ক্লান্তি মুহূর্তের মধ্যেই অন্তর্হিত হল দেহ মন থেকে। সমস্ত অঙ্গনটি পরিক্রমা করে দর্শন করলুম—গণেশ, পার্বতী ও সর্বশেষে অমরনাথজীর দ্রবমান লিঙ্গমূর্তিটি। পাণ্ডাকে ১০৲ টাকা প্রণামী দিয়ে অনুমতি নিয়ে স্পর্শ করলুম সেই স্বয়ম্ভুরূপকে। সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা জানালুম ঃ—

"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মা পাহি নিত্যম্"

অমরনাথজীর পূর্ণাবয়ব মূর্তির অদর্শনজনিত কোন দুঃখ বা হতাশা ছিল না মনে—কারণ এসব যাত্রার উদ্দেশ্যই হল সাধনা, নিজের শক্তিকে পরিমাপের সাধনা। নিজের মধ্যে অসীমের আস্বাদ গ্রহণের

সাধনা। জীবন দিয়ে জীবনেব মূল্যকে যাচাই করার সাধনা। ভারতের প্রতিটি অঞ্চল হতে আগত হাজার হাজার নরনারীর সুচির-সঞ্চিত সম্মিলিত সাধনার বাস্তব রূপায়ণ এই শ্রাবণী-পূর্ণিমার একটি দিনেব দর্শন—তা পূর্ণ মূর্তি বা দ্রবমান মূর্তিতে যেভাবেই হোক না কেন তাতে কাবো আনন্দের বা অর্ঘ্য নিবেদনের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় না। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই, হিন্দু ও মুসলমান একত্রে এই দিনটিতে অমরনাথজীকে দর্শন কবে প্রণাম নিবেদন করলেন। *"সত্যই ভাবতে ভাল লাগে যে, ভাবতে এমন তীর্থও* আছে যেখানে হিন্দু মুসলমান এক হয়ে দেবতাব চরণে প্রণতি জানায়। মানুষেব মনে শুচিতাবোধেব সঙ্গে পবমার্থ বোধ থাকবেই—সেখানে হিন্দু মুসলমান সকলেই এক। হয়ত অমরনাথের অনেক বিভূতি আছে সত্য কিন্তু হিন্দু মুসলমান এক হয়ে যেখানে তাঁকে আকুতি নিবেদন কবছে এই বিভূতিই সবার সেরা—সব বিভূতির শ্রেষ্ঠ বিভূতি।" শিবপুরাণে বা অন্য কোন পুবাণে অমবনাথ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। কাশ্মীবের অন্যতম প্রাচীন পুবাণ নীলামত পুরাণ বা নীল পুরাণেও কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না এই অমবনাথ প্রসঙ্গে। কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বা ইতিহাসেও অমরনাথেব উল্লেখ নাই। তবু এই অমবনাথের পূজা সম্বন্ধে একটা কিম্বদন্তী আছে। অমরনাথ লিঙ্গ হয়তো প্রাচীন। সিদ্ধাচার্যদের নিকট এঁর মহিমা হয়ত পুরাবিদিত। কিন্তু সাধাবণে এই স্বয়ম্ভুর প্রকাশ প্রাচীন নয়, অর্বাচীন। অন্ততঃ কাশ্মীরে মুসলমান আগমনের পর। একদা পথভ্রষ্ট গুজ্জর বালক রাত্রিকালে সম্মুখের পাহাড় থেকে দেখতে পায় বিরাট গুহার মুখ, আর তার মধ্যে জ্বলন্ত এক প্রভা। দুরন্ত শীতের মধ্যে ঘনঘটা করে শিলাবৃষ্টি শুরু হল। সঙ্গে তার একপাল মেষ। সামনে গুহার আশ্রয় তাকে আকৃষ্ট করলো—এনে দিল দুঃসাহস। পাহাড় বেয়ে নেমে পার হলো সে অমরগঙ্গা। তারপর প্রবেশ করলো গুহায়। প্রশস্ত গুহার মধ্যে সমস্ত মেষ নিয়ে রাত্রি

যাপন করলো নির্ভয়ে। প্রভাতে দলের সকলে এসে সন্ধান পেলো সেই বালকের এই গুহায়। আবিষ্কার করলো গুহা মধ্যে দেবতাকে। বারংবার দেবতার পায়ে তারা মাথা খুঁড়লো—প্রতিজ্ঞা করলো "যতদিন গুজ্জব, যতদিন এই পথ ততদিন তোমার পূজা"। আজও তারা শ্রাবণী-পূর্ণিমার পুর্বে এই পথ পরিষ্কাব করে রাখে, যদিও তারা ইস্‌লাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে। পাহালগাম হতে ৬ মাইল পূর্বে বটকুট গ্রামে এদের বাস। আজও অমরনাথ গুহায় যাত্রীরা পূজা-নৈবেদ্য যা-কিছু দান করেন তাব এক-তৃতীয়াংশ পায় এই বটকুটবাসী মুসলমানগণ। একাংশ পায় পূজারীরা, বাকী একাংশ পান শ্রীনগরের শ্রীশঙ্করাচার্য মঠের মঠাধীশ।

বেলা ১১-১৫ মিনিট। চতুর্দিক সৌরকিরণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গুহা হতে প্রত্যাবর্তন পথে সাক্ষাৎ হল স্বামী সদাত্মানন্দ, কল্যাণানন্দ ও শান্তিবাবুর সঙ্গে—তাঁরা তখনই গুহার পাদদেশ বেয়ে কেবল ওঠা শুরু কবেছেন। নীচে কুণ্ডু স্পেশ্যালের তাঁবুতে এসে লুচি, আলুর দম ও বঁদে সহযোগে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে সাথের কুলি মস্থর সিং-এর সঙ্গে আলাপ করছি—এমন সময় কুণ্ডু স্পেশ্যালের কয়েকজন কর্মচারী রওনা হয়ে যেতে বলল পঞ্চতরণী অভিমুখে—যাঁরা দর্শন সমাপ্ত করে এসেছেন তাঁদের। কারণ এখানে যে কোন সময় মেঘ জমে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা—ফলে তুষারের পিচ্ছিল পথ আরও পিচ্ছিল হয়ে চড়াই-উৎরাই হয়ে উঠবে প্রাণান্তকর। তাদের কথামত রওনা হয়ে গেলুম পঞ্চতরণী অভিমুখে, পশ্চাতে বারাসত হতে আগত ভগ্নিদ্বয় শ্রীমতী মায়ালতা রায় ও শেফালিকা রায়চৌধুরী। বেলা ১২টা। শীতের দেশের রৌদ্র বেশ ভালই লাগছে। পথে আর বিশেষ কষ্ট নেই। দর্শনান্তে আনন্দেই চলেছি। দুটি ভগ্নিতে বেশ পাশাপাশি চলেছেন। পথিমধ্যে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ হতে লাগল কুণ্ডু স্পেশ্যালের ডাণ্ডীর যাত্রীদের সঙ্গে। কঠিন চড়াইগুলি এখন উৎরাই-এ পরিণত। মাঝে মাঝে চলতে অক্ষম বৃদ্ধাদের পাহাড়ী যুবকরা

মোটা অর্থের বিনিময়ে পিঠে করে দুর্গম পথটুকু পার করে দিচ্ছে। এমনি করে কিছুদূর চলার পর দেখি সামনের পথ অবরুদ্ধ। এটি একমুখো পথ (one way)। কিছু দূরে একটি যাত্রীসহ অশ্ব নীচে পতিত হওয়ায় বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল আমাদের। প্রায় আধ ঘণ্টা পর পুনরায় চলা শুরু হল। কুণ্ডু স্পেশ্যালের ডাণ্ডীর যাত্রীদের পরিচিত মুখগুলি আবার দেখতে পেলুম। বাহকরা ডাণ্ডী নামিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। সারি সারি ঘোড়ার যাত্রীরা অগ্রে চলেছে। তাদের সারির পর ডাণ্ডী। অনেকে কাতরকণ্ঠে আমাদের জিজ্ঞাসা করছেন: "দর্শন হবে ত বাবা?" সম্মতিসূচক আশ্বাস জানিয়ে পুনরায় চলা শুরু করেছি। সামনেই দেখা হল কুণ্ডু স্পেশ্যালের ম্যানেজার সৌম্যেনবাবুর সঙ্গে। জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের অব্যবস্থার জন্য তিনিও ক্ষুব্ধচিত্তে সরকারকে গালিবর্ষণ করছেন একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে। বারাসত-ভগ্নিদ্বয় বেশ দ্রুত হেঁটে চলেছেন—আমাকে পশ্চাতে রেখে। এমনি করে প্রায় ৪ মাইল পথ অতিক্রম করে পৌঁছে গেলুম পঞ্চতরণীর পূর্ব তীরে, যেখানে একটি অস্থায়ী শহর গড়ে উঠেছে শ্রাবণী-পূর্ণিমা উপলক্ষে। তারপর একটি কাঠের সেতু পার হয়ে ক্ষীণস্রোতা পঞ্চতরণীর নদীগুলি একটি একটি করে অতিক্রম করে ৩-৫০ মিনিটে উপস্থিত হলুম পঞ্চতরণীর নির্দিষ্ট তাঁবুতে। আমাদের পূর্বে ৪।৫ জনের একটি দল পৌঁছে গেছেন। আমরা পৌঁছলুম দ্বিতীয় দল।

পাঁচ

আগে চলাতেই আনন্দ—ফেরার পথে আনন্দ নাই। তাইতো শাস্ত্রকারগণ তাঁদের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় লিপিবদ্ধ করে বলে গেছেন, "চরৈবেতি, চরৈবেতি"। সন্ধ্যার প্রাক্কাল হতেই শীতের প্রকোপ শুরু হল। দর্শনান্তে প্রত্যাবর্তন করেছেন সকলেই। স্বামী সদাত্মানন্দ, কল্যাণানন্দ, সীতেনবাবু ও শান্তিবাবু সকলেই নিরাপদে ফিরে এসেছেন। সকলেরই মুখে এক অভিযোগ—জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের অব্যবস্থা বিষয়ে। প্রত্যেক দর্শনার্থীই অল্পবিস্তর আহত হয়ে ফিরেছেন—অকল্পনীয় জনতার চাপে। এসব কিন্তু সকলেই হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন অমরনাথজীর দর্শনান্তে। পঞ্চতরণীর রাত্রি। প্রায় ১৩০০০´ ফুট উচ্চের কন্‌কনে শীত তাঁবুর কানাত দিয়ে প্রবেশ করছে। প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ উপেক্ষা করেই গভীর রাত্রে ক্ষণকালের জন্য একবার বাইরে এসে দাঁড়ালুম। বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে গেলুম পঞ্চতরণীব নৈশ-স্তব্ধতা অনুভব করে। শ্রাবণী-পূর্ণিমার চন্দ্রমা-রজনী, পাহাড় ঘেরা আকাশে চন্দ্র-তারকার অপরূপ শোভা। যেন কোন নিপুণ শিল্পী একখানি সুনীল চন্দ্রাতপে বিচিত্র আলোকমালা সাজিয়ে নিজেই তাঁর সৃষ্টিকে উপভোগ করছেন—এই পশুপক্ষীবিহীন নির্জন উপত্যকায়। বিচিত্র সেই দৃশ্য যার অনুধাবন আস্বাদনের অপেক্ষা রাখে না। সমস্ত প্রত্যাশা হয় স্তব্ধ, সমস্ত চৈতন্য, উন্মেষ, উৎসাহ যায় থেমে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সহ্যাতীত শীতের প্রচণ্ড প্রকোপে তাঁবুর মধ্যে এসে প্রবেশ করলুম। প্রত্যুষেই রওনা হতে হবে এখান হতে চন্দনবাড়ী অভিমুখে—একটানা ১৬ মাইল পথ পায়ে হেঁটে। দূরত্বের কথা চিন্তা করে মন সরছিল না পায়ে হেঁটে যাত্রা করতে। একটি চতুষ্পদ জন্তুর পৃষ্ঠে আরোহণ করেই যাত্রা করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে তা সম্ভব হল না। বিশেষ করে ৭০ বৎসর বয়স্ক স্বামী

সদাত্মানন্দজীর প্রয়োজন ছিল বেশী। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনাতেও কোন ফল হল না। অগত্যা ১৬ মাইল হাঁটার প্রস্তাবই বলবৎ রইল। দু'একজন ব্যতীত এই ১৬ মাইল পথ একেবেলা কোথাও বিশ্রাম না নিয়ে হেঁটে যাওয়ার বিপক্ষে ছিলেন অনেকেই। কিন্তু এখন আমরা কুণ্ডু স্পেশ্যালের অধীন, সুতরাং "নান্যেব গতিরন্যথা"। হাঁটাব জন্য মনকে দৃঢ় করলুম।

॥ পঞ্চতরণী—চন্দনবাড়ী ॥

২৮শে আগষ্ট সকাল ৮-৩০ মিনিটের মধ্যে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করে চন্দনবাড়ী অভিমুখে হাঁটার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলুম মস্থুর সিং-এর হাতে মালগুলি দিয়ে--সঙ্গে নিয়ে কুণ্ডু স্পেশ্যাল প্রদত্ত জেলি, পাঁউরুটি ও কিছু মিষ্টি পথিমধ্যে জলযোগের জন্য। প্রত্যাবর্তন পথে সারি সারি অশ্বারোহী যাত্রীদলের সংখ্যা কম নয়। পঞ্চতরণীতে যত দর্শনার্থী সমবেত হয়েছিলেন শ্রাবণী-পূর্ণিমা উপলক্ষে তাঁদের অধিকাংশ এখন ফেরার পথে চতুষ্পদ জন্তুর পৃষ্ঠে আরোহণ করে চলেছেন চন্দনবাড়ী অভিমুখে। আমরাও চলতে শুরু করলুম ঐসব অশ্বগুলির পাশে পাশে একটু দ্রুতপদে—যাতে তাদের অতিক্রম করে অগ্রসর হয়ে যেতে পারি অন্যথায় দুর্ভোগ বাড়বে। মহাগুণাস্ পর্যন্ত সমগ্র পথ যেটি আসার সময় ছিল উৎরাই এখন ক্রমেই সেটি কঠিন চড়াই-এ পরিণত। পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হল সহযাত্রী শ্রীনরেন্দ্রনাথ আচার্যের সঙ্গে। বয়স ৬৫—অকৃতদার। পথের উত্তম সাথী বলা চলে। এই পথে চলার সময় একটি বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল আমাদের চারজনকে সময় সংক্ষেপ করতে গিয়ে পাকদণ্ডী পথে চলার জন্য। ঢালুপথে চলতে কেবলই নীচের দিকে পা সরে যাচ্ছে—কোনরূপেই দেহের ভারসাম্য রাখা সম্ভব হচ্ছে না—নীচে প্রায় ১০,০০০´ ফুট খাদ। অথচ যে পথে সাধারণ মানুষ ও ঘোড়াগুলি চলেছে সে পথও এত উচ্চে যে, সেখান হতে উক্ত পথে যাওয়াও সম্ভব

নয়। বিশেষ করে এখান হতে উপরে যাবারও কোন পথ ছিল না। যাই হোক, কোনরূপে ধীরে ধীরে পশ্চাদপসরণ করে পুনরায় যে পথে ঘোড়া ও সাধারণ মানুষ চলেছে সেই পথেই চলতে শুরু করলুম। সাড়ে তিন মাইল চলার পর শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট দেখা দিল। কিছুদূর চলেছি আর লাঠিতে ভর করে বিশ্রাম নিচ্ছি আবার চলেছি। সাক্ষাৎ হল মেদিনীপুবের মহিষাদল হতে আগত শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি-দম্পতির সঙ্গে। কথায়-বার্তায় এমনি করে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলুম মহাগুণাসে। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য স্মেলিং সল্টের আঘ্রাণ নিলুম মহাগুণাসেব প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র হতে এবং স্বামী সদাত্মানন্দ-জীকেও দেওয়াব ব্যবস্থা করলুম। এতে সাময়িক শ্বাসকষ্টের লাঘব হয় এবং বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করা যায়। মহাগুণাসের পর শেষনাগ পর্যন্ত প্রায় সব পথটিই উৎরাই পথ। চলার গতি দ্রুততর হয়ে এল। অবশ্য সদাত্মানন্দজীর প্রত্যাবর্তন পথে বেশ কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু পথিমধ্যে সে কষ্ট লাঘবের কোন উপায় ছিল না। দু'একটি পরিচিত মুখ অতিক্রম করে চলে এলুম। মস্তুব সিং এতক্ষণ পৌঁছে গেছে শেষ-নাগের কাছাকাছি। এইভাবে ৮ মাইল পথ অতিক্রম করে বেলা ২-৩০ মিনিটে পৌঁছে গেলুম শেষনাগ। বেশ ক্লান্তি অনুভব করছিলুম এবং জলযোগের জন্যও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলুম। মস্তুর সিং-এর সাক্ষাৎ মিলল প্রবেশ পথে লীডারের তীরে। তারই সঙ্গে একটি চায়ের দোকানে বসে কুণ্ডু স্পেশ্যাল প্রদত্ত জেলি-পাঁউরুটি ও মিষ্টি সহযোগে চা পান করে সুস্থ হলুম কিছুটা। ইতিমধ্যে এসে গেলেন সীতেন-বাবু। কিছুক্ষণ পরেই স্বামী সদাত্মানন্দ ও শান্তিবাবু। স্বামী কল্যাণানন্দের সাক্ষাৎ মেলেনি এ পথে। আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সীতেনবাবু, শান্তিবাবু ও স্বামী সদাত্মানন্দজীর জলযোগ সমাপ্ত হলে সকলে ৩-৩০ মিনিটে শেষনাগ হতে রওনা হলুম চন্দনবাড়ী অভিমুখে। চলেছি শেষনাগ হ্রদের তীর ধরে—জলের অপূর্ব শোভা দেখতে দেখতে। সাক্ষাৎ হল পিশুঘাটির কিশোরীটির সঙ্গে—দুটি ভাই

বোনে চলেছে চন্দনবাড়ী। মা, বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা রয়ে গেছে পঞ্চতরণীতে। আমরা চারজন ও ওরা দুটি ভাইবোন এই ছ'জন একই সঙ্গে চলেছি। শেষনাগ সম্বন্ধে ওদের কৌতূহলের অন্ত নাই। কেমন করে এই হ্রদটি সৃষ্টি হল—লীডার নদীর উৎপত্তি কোথা হতে, কিভাবে হয়েছে ইত্যাদি নানা প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলেছি। তারা ভারী খুসী হল যখন চাক্ষুষ দেখল কেমন করে হিমবাহ হতে গলিত তুষারস্রাব দ্বারা হ্রদটি সৃষ্টি হচ্ছে এবং কিভাবে এই হ্রদের উচ্ছ্বসিত জলরাশি নদীর আকারে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কথাপ্রসঙ্গে জানলুম তাদের মা, বাবা ও আত্মীয়েরা "ভারত-তীর্থ স্পেশ্যালের" যাত্রী। গত ২৭শে আগষ্ট অমরনাথ দর্শনান্তে প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরই এক সহযাত্রী বৃদ্ধার শীতের প্রকোপে মৃত্যু ঘটায় পুলিশী তদন্ত সাপেক্ষে তাদের স্পেশ্যালের যাত্রীরা পঞ্চতরণীতে আটক পড়ে আছে। তারা দুটি ভাইবোন বেরিয়ে পড়েছে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে চন্দনবাড়ীর পথে। আমরাও সহানুভূতি দিয়ে তাদের সঙ্গে নিয়ে চলেছি।

ইতিমধ্যে ভারত-তীর্থ স্পেশ্যালের জনৈক কর্মচারীর সঙ্গে দেখা হল তাদের এবং এখন হতে তারা দু'জনে উক্ত কর্মচারীটির সঙ্গেই চলা শুরু করল এবং এটুকুও জানা গেল যে, বৃদ্ধার মৃতদেহটি সৎ-কারের অনুমতি দিয়েছেন পুলিশ-কর্তৃপক্ষ। সুতরাং ভারত-তীর্থ স্পেশ্যালের সকল যাত্রীই আজ রওনা হয়ে আসছেন। কখন কোথাও সামান্য চড়াই আসছে—সেগুলি অতিক্রম করে ৩ মাইলের মাথায় যোজপল পৌঁছে বিশ্রাম নিতে লাগলুম চা-বিস্কুটের আশায়। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সুযোগ মিলল এক কাপ করে চা পানের। সেখান হতে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই কুণ্ডু স্পেশ্যালের প্রাক্তন কর্মচারী হরির সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। সে এখন ভারত-তীর্থ স্পেশ্যালের কাজে নিযুক্ত এবং উক্ত স্পেশ্যালের যাত্রীদের চা-জলখাবার সরবরাহের জন্য এখানেই তাঁবুর নীচে রয়েছে। সেও চা পানের জন্য অনুরোধ জানাল। তার সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে এগিয়ে পড়লুম পিশুঘাটির

পথে। সন্ধ্যার পূর্বেই পিশুঘাটির বন্ধুব পথ অতিক্রম করতে না পারলে ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে। শেষনাগ হতে পাশে পাশে চলেছে লীডাব—কখন সমতলে, কখন এক হাজার ফুট নীচে। শ'য়ে শ'য়ে সারি সারি চলেছে ভারবাহী অশ্বগুলি চন্দনবাড়ী অভিমুখে ধূলা উড়িয়ে। পাশে পাশে চলেছি আমবা হাঁটাপথের যাত্রী। কখনওবা যাত্রা বন্ধ রাখতে হচ্ছে সঙ্কীর্ণ পথে—তাদের পথ ছেড়ে দিয়ে। এই অশ্বগুলিই পিশুঘাটির উৎরাই পথে মহা উৎপাত সৃষ্টি কবে রুদ্ধ করে দাঁড়াবে পায়ে-চলা যাত্রীদের সামান্য পথটুকুও। এর প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা নেই—পাশাপাশি চলতে হবে উভয়কেই। কিংবা পায়ে-হাঁটা যাত্রীদের বেছে নিতে হবে আবও দুর্গম পাকদণ্ডী পথ। পৌঁছে গেলুম পিশুঘাটির সমতলে। এরপর উৎরাই-পর্ব। চড়াই এবং উৎবাই উভয় পথেরই দুর্গমতা বিষয়ে পিশুঘাটি তার ললাটে দুর-পনেয় কলঙ্কতিলক লেপন কবে দাঁড়িয়ে আছে যুগযুগ ধরে; আজও তাব অবসান ঘটেনি। তবে শোনা যায় কুড়ি বৎসব পূর্বে এব দুর্গমতা ও ভয়ালতা ছিল আরও রোমাঞ্চকর—সে পথ এখন কিছুটা সুগম হয়েছে। যাই হোক, পিশুঘাটির উৎরাই শুরু হল। শীর্ষদেশ হতে পাদদেশ পর্যন্ত ৫০০ শত মালবাহী অশ্ব সারিবন্দী দাঁড়িয়ে, তাদেরই পাশ দিয়ে ফাঁকে ফাঁকে নামতে শুরু করলুম প্রতি ১০।১৫ মিনিট অন্তর বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। প্রায় আধ ঘণ্টা এভাবে চলার পরে বিরক্ত হয়ে অগত্যা পাকদণ্ডী পথের আশ্রয় নিলুম সীতেনবাবুর নিষেধ উপেক্ষা করেই। গোধূলির শেষ লগ্ন ঘনিয়ে আসছে—পর্বতশীর্ষে আলো-ছায়ার খেলা শুরু হয়েছে। ত্বরিৎ-পদে পাকদণ্ডী পথে চলেছি—ছোট ছোট গাছপালার মাঝ দিয়ে, উঁচু উঁচু প্রস্তরখণ্ডগুলির উপর সংহতভাবে পদক্ষেপ করে। উৎরাই পথেরও যেন শেষ নাই। পেছন থেকে কে একজন নারীকণ্ঠে বলে উঠলেন "আর কতদূর রে"। পদযাত্রীদের অন্তরের কথাই যেন প্রতি-ধ্বনিত হল। সত্যই, পিশুঘাটির চড়াই এবং উৎরাই সমভাবেই

দুর্গম। এমনি করে রাত্রি প্রায় ৭টায় নেমে এলুম ঘাঁটির পাদদেশে অবস্থিত প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে এবং এক গ্লাস শীতল জল পান করে সুস্থ হয়ে সহযাত্রী স্বামী সদাত্মানন্দ, সীতেনবাবু ও শান্তিবাবুর জন্য সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগলুম। প্রায় আধঘণ্টা পর সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। স্বামী সদাত্মানন্দজীকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। চন্দনবাড়ীর তাঁবু এখান হতে এখনও ১½ মাইল। অন্ধকার, বন্ধুর পথে, পাহাড়ী বনজঙ্গলের মাঝ দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। এমন সময় মস্থুর সিং এসে উপস্থিত হল আমাদের নিয়ে যেতে। প্রতিটি পদক্ষেপ ব্যাহত হচ্ছে। অসম-বিন্যস্ত-প্রস্তর ঢিবিগুলির ওপর পা ফেলে অগ্রসর হতে হচ্ছে—টর্চের ক্ষীণ আলোকে পথ দেখে। বার ঘণ্টা চলার পর (বিশ্রাম সহ) রাত্রি ৮-৩০ মিনিটে চন্দনবাড়ীর তাঁবুতে এসে পৌঁছে গেলুম। কুণ্ডু স্পেশ্যালেব কর্তৃপক্ষ বেশ কিছুটা উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত ছিলেন আমাদেব কয়েকজনের বিলম্বের জন্য। ইতিমধ্যে পদযাত্রীরা সকলেই প্রায় পৌঁছে গেছেন। দল হিসাবে আমরাই শেষ দল। আরও একজন পদযাত্রীর সন্ধান মেলেনি তখনও। বাদলবাবু ও অমর-বাবু এজন্য বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন এবং তাঁর সন্ধানের জন্য সৈন্য-বিভাগের জনৈক প্রহরীকে ৫৲ টাকা পুরস্কার স্বীকার করেছিলেন। রাত্রি ১০টায় তাঁর সন্ধান করে প্রহরীটি সঙ্গে নিয়ে তাঁকে তাঁবুতে পৌঁছে দিয়ে গেল। পরে সংবাদ নিয়ে জানা গেল যে, পথে পেটের যন্ত্রণার জন্যই তাঁর এই বিলম্ব।

চন্দনবাড়ীর তাঁবুর শ্রী ফিরেছে—সামনে রঙিন কাপড় জুড়ে প্রাঙ্গণ সৃষ্টি করা হয়েছে একরাত্রির জন্য। দুটি কোচের ম্যানেজারদের প্রতিযোগিতার ফলশ্রুতি এটি। সমর মুখার্জি ও স্বামী কল্যাণানন্দ সন্ধ্যার প্রাক্কালেই পৌঁছে তাঁবুতে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আমরাও এসে বিশ্রাম নিতে শুরু করে দিলুম। পঞ্চতরণী ও শেষনাগের তুলনায় চন্দনবাড়ীর শীত তেমন কিছু ভয়াবহ নয়। ইতিমধ্যে কুণ্ডু স্পেশ্যালের প্রথামত চা-জলখাবার এসে গেল, সেগুলির সদ্ব্যবহার

করে ও কিছু মস্থুর সিংকে দিয়ে হোল্ডল্ খোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। একদিনে ১৬ মাইল পদযাত্রার অভিজ্ঞতা এই প্রথম—তা আবার বন্ধুর পার্বত্যপথে। রাত্রি ৮-৩০ মিনিট মধ্যে নৈশভোজন সমাপ্ত করে সকলেই নিদ্রিত হয়ে পড়লুম। এখানেই আমাদের তাঁবুবাস সমাপ্ত এবং সেই সঙ্গে অমরনাথ যাত্রার শ্রমসাধ্য পথেরও অবসান। আগামীকাল হতে শুরু হবে গৃহবাস।

তাঁবুর কানাত দিয়ে ক্ষীণ আলোকরশ্মি প্রবেশ করছে। চন্দন-বাড়ীর দৃশ্য প্রভাত কিরণে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—অপরূপ শোভায় ঝলমল করছে আশপাশের তুষার-মৌলি শৃঙ্গগুলি। শৌচে যাবার তাগিদ সত্ত্বেও পরমুখাপেক্ষী থাকতে হয়েছে গরম জলের আশায়। এর পর হোল্ডল্ গোটানোর পালা —এ কাজে মস্থুর সিং ও শান্তিবাবুব সাহায্য অবিস্মরণীয়।

॥ পাহালগাম ॥

২৯শে আগষ্ট প্রাতঃকালীন চা-জলখাবারের পর্ব শেষ করে বেলা ৮টার মধ্যে পদযাত্রীরা দল বেঁধে রওনা হয়ে এলুম পাহালগামের পথে। পথের মুখে দণ্ডায়মানা বারাসত-ভগ্নিদ্বয় পাহালগাম হতে আগত জীপের অপেক্ষায়। অবশ্য সে আশা তাঁদের পূর্ণ হয়নি, অবশেষে পয়দলেই আসতে হয়েছিল। নরেন্দ্রনাথ আচার্যের সঙ্গে গল্পগুজবে সময়াতিবাহিত করে এগিয়ে চলেছি ঝাউবন ঘেরা পথের মাঝ দিয়ে। প্রভাতী সূর্যের কিরণে মনে লেগেছে আনন্দের দোলা। হেঁটে চলেছি দ্রুতপদে অশ্বারোহী যাত্রীদের সমতালে আঁকা-বাঁকা পথে। সাথে সাথে নেচে নেচে চলেছে যৌবনোচ্ছলা লীডার। কখনও বা তার বেগ আরও চঞ্চল ও খরতর হয়ে উঠছে শৈলবাহু নিপীড়নে। এভাবে পথের দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে চলেছি পাহালগাম অভিমুখে। পাঁচ মাইলের মাথায় এসে বিশ্রাম নিলুম কিছুক্ষণ। আবার শুরু হল চলা। পাহালগাম প্রবেশের দু'এক মাইল পূর্ব হতেই অমরনাথ-

প্রত্যাগত যাত্রীদের প্রত্যুদ্‌গমন উপলক্ষে ছত্রে ছত্রে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাত্রীরা প্রবেশমাত্রই হাত ধরে প্রসাদ দিচ্ছেন ছত্রের কর্মীরা। পাহালগামের সীমানার মধ্যে পৌঁছে গেলুম। প্রবেশ পথে কাঠের সেতু পার হয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে চললুম। সীতেন-বাবু বেশ কিছুদূর এগিয়ে চলে গেছেন। পাহালগামের বাজারের মুখে ফটোগ্রাফারদের সুসজ্জিত দোকান (ষ্টুডিও)। যে ফটো-গ্রাফারের দোকানে যাত্রাপথের স্মৃতি হিসাবে আমরা পাঁচজনে ছবি তুলেছিলাম সেখান হতে ছবিগুলি নিয়ে মাউন্টভিউ হোটেলের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছি। বেলা ১১-২৫ মিনিট। মাউন্টভিউ হোটেলের প্রবেশ পথে কর্তৃপক্ষের তরফ হতে সুবলবাবু করমর্দন করে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন। গত ২৪শে আগষ্ট ১১-২০ মিনিটে এখান হতেই পদযাত্রায় রওনা হয়ে ২৯শে আগষ্ট বেলা ১১-২৫ মিনিটে এখানেই (পাহালগাম) নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করলুম।

ধীরে ধীরে মাউন্টভিউ হোটেলের নির্দিষ্ট কক্ষটিতে উঠে গেলুম। স্বামী কল্যাণানন্দজী কিছুক্ষণ পূর্বে এসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থামত এক বাল্‌তি গরম জল এসে গেল বাথরুমে। সাথের কুলি মস্থুর সিং বিদায়ের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে। কিছু বখশিস্‌ সহ তার মজুরী মিটিয়ে দিতেই সে খুসী হয়ে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল। শ্রান্ত-ক্লান্ত অবস্থায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ও গরম জলে স্নানাদি সম্পন্ন করে বেশ সুস্থ বোধ করতে লাগলুম। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বামী সদাত্মানন্দ ও শান্তিবাবু এসে গেলেন। তাঁরাও কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তিনজনে লীডারের শীতল জলে স্নান সেরে এলেন। এখানে প্রায় দু'দিন অবস্থিতি। সুতরাং পাহালগামের মাধুর্য উপভোগে কোন বাধা নাই। মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করে কয়েকদিন পর গৃহবাসে সকলেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগলুম এবং আরামে বিশ্রাম নিলুম অপরাহ্ন ৪টা পর্যন্ত। আর্শিতে চেয়ে দেখি শীতের প্রকোপে মুখের চামড়া গেছে ঝলসে; নিজের মুখটাও দেখতে

কেমন অদ্ভুত লাগছে। সকলেরই এক অবস্থা! সন্ধ্যার প্রাক্কালে পাহালগামের রমণীয় রূপটি পুনরায় চাক্ষুষ করতে বেরিয়ে পড়লুম—সঙ্গে সীতেনবাবু ও শাস্তিবাবু। রাত্রি ৮টার মধ্যে ফিরে এসে নৈশভোজন সমাপ্ত করে মাউণ্টভিউ হোটেলের আরামপ্রদ শয়নের ব্যবস্থায়—পথশ্রমে কাতর দেহে সহজেই নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লুম।

৩০শে আগষ্ট সকাল থেকেই কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্তৃপক্ষ ব্যস্ত বিদায়ী ভোজের আয়োজনে। কারণ, এখান হতেই দুটি টুরিষ্ট কোচের যাত্রীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবেন—এজন্য এখানেই এই ভোজপর্ব। নিরামিষ ও আমিষ উভয়বিধ ব্যবস্থাই রয়েছে। প্রত্যাবর্তন-পথে অনেকেই আমিষভোজীদের দলে যোগ দিলুম। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিকাল ৪টা পর্যন্ত টানা বিশ্রাম নিয়ে বৈকালিক চা-পর্ব শেষ করে স্তিমিত অপরাহ্নে রূপসী পাহালগামকে দেখতে বের হলুম।

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতের ছেলেমেয়ে, তরুণ-তরুণীরা দোকানে দোকানে, ষ্টুডিয়োয় ষ্টুডিয়োয়, নানা সাজে, নানা পোষাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখে নিলুম শেষবারের মত পাহালগামকে নানা ভঙ্গিতে, নানা বেশে ও নানা রসে। রাত্রে সামান্য কিছু আহার্যদ্রব্য গ্রহণ করে শয্যাশ্রয়ী হয়ে পড়লুম। ৩১শে আগষ্ট এখান হতে বিদায়ের পালা। সকাল ৭টার মধ্যেই প্রাতরাশ সম্পন্ন করে সৌখিন বাস-যোগে (ডিলুক্স) রওনা হয়ে গেলুম পাঠানকোট অভিমুখে। বাসটি খানাবল হয়ে কাজীগান্দে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। এই সুযোগে অনেকে আপেল, আখরোট প্রভৃতি ক্রয় করে নিলেন। কাজীগান্দ হতেই একটি রাস্তা চলে গেছে শ্রীনগর অভিমুখে, অপরটি খানাবল হয়ে পাহালগামের দিকে—এই পথেই অনন্তনাগ, আচ্ছাবল ও কোকরং। বাণিহাল, রামবাণ, বাতোত, কুদ্ ও উধমপুর পেরিয়ে একেবারে এসে গেলুম জম্মুতে। এদিন পথিমধ্যে প্যাকেট ব্যবস্থায় খাদ্যসরবরাহ—লুচি, আলুরদম ও বোঁদে। রাত্রি ৮টার মধ্যেই জম্মুর

সরকারী ডাকবাংলায় পৌঁছে গেলুম। এখানেই আমাদের রাত্রিবাস। জম্মুর উচ্চতা ১০০´ হাজার ফুট, বেশ গরম। সমতলের উষ্ণ আবহাওয়া শুরু হল। সুবৃহৎ একটি হলঘরে স্বামী সদাত্মানন্দ, কল্যাণানন্দ ও শান্তিবাবু সহ আমাদের চারজনের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা এখানেই। গ্রীষ্মপ্রধান সমতলের অধিবাসী, অন্নগতপ্রাণ বাঙালী—সারাদিন উদরে অন্ন না থাকায় সকলেই একমুষ্টি অন্নের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন এবং সকলেব অভিরুচি অনুযায়ী নৈশভোজনে অন্নের ব্যবস্থা করেছিলেন কুণ্ডু স্পেশ্যালের ম্যানেজার। সন্ধ্যার কিছু পবেই বিশ্রাম নিয়ে ও স্নানাদি সেরে স্বামী সদাত্মানন্দ, সীতেনবাবু ও শান্তি-বাবু সহ আমবা পাঁচজনে রঘুনাথজীর মন্দিব দর্শনে বেবিয়ে পড়লুম। ডাকবাংলা হতে ৫।৭ মিনিটের পথ। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার দীর্ঘ মূর্তি। বিরাট মন্দির, বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। মন্দিবে তখন সন্ধ্যাবতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজছিল। আরাত্রিক অন্তে মন্দিবের দ্বাবী সকলের হাতে চরণামৃত ও খৈ প্রসাদ দিল।

৮।১০টি ঘরে প্রায় ১½ লক্ষ বিভিন্ন আকারের শালগ্রাম শিলা সারি সারি সজ্জিত লোহার লম্বা পাতে বর্তুলাকার ছিদ্র মধ্যে। মন্দির-চত্বর পরিক্রমা ক'রে ও পার্শ্বস্থ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর মূর্তিগুলি দর্শন করে রাত্রি ৯টার মধ্যে ফিরে এলুম সরকারী ডাক-বাংলায়। ডাকবাংলার একাংশে টুরিষ্ট অফিস। নৈশভোজনের পর হোল্ডল্ খুলে রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা কবে নিলুম সকলে। এই জম্মুব কাছে ত্রিকূট পর্বত। সেখানে বিষ্ণোদেবীর মন্দিরে নবরাত্রি মেলা আরম্ভ হবে তার জন্য এখানে-সেখানে লাল শালুতে বিজ্ঞাপন।

'১লা সেপ্টেম্বর সকাল ৭-৩০ মিনিটে প্রাতরাশ সমাপ্ত করে রওনা হয়ে গেলুম পাঠানকোট অভিমুখে। ৬৭ মাইল পথ। বেলা ১০টার মধ্যেই পৌঁছে গেলুম আমাদের টুরিষ্ট কোচের নির্দিষ্ট কামারাটিতে। প্রখর রৌদ্র, স্নানের জন্য মন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে। কোচটি এখনও প্লাটফরমের বাইরে—প্রায় ১ ঘণ্টা পর প্লাটফরমে লাগবে। ইতিমধ্যে

নিজ নিজ জিনিসপত্রগুলি গুছিয়ে রেখে দিলুম নির্দিষ্ট স্থানে। তারপর কিয়দ্দূরে প্লাট্ফরমের কলের জলে স্নান সেরে স্নিগ্ধ হলুম। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর্ব শেষ হল বেলা ১টার মধ্যে। অপরাহ্ণে স্বামী কল্যাণানন্দ, সীতেনবাবু ও শান্তিবাবু সহ আমরা চার জন পাঠানকোট বাজার ঘুরতে বের হলুম। এখানে অনেকে ১'৭৫ পঃ কে. জি. চাল কিনে আনলেন। পাঠানকোটে দর্শনীয় বা আকর্ষণীয় কিছুই নাই। গ্রীষ্মপ্রধান স্থান। কেউবা বাইরে প্লাট্ফরমে সতরঞ্চি বিছিয়ে, কেউবা সুবিধামত টুরিষ্ট কোচের চেয়ার টেনে, কেউবা ষ্টীলের বেঞ্চগুলি বের করে আপন আপন প্রিয়জনদের সঙ্গে আলাপে-প্রলাপে আর হাসি-উচ্ছ্বাসে সময়াতিবাহিত করছেন। যথাসময়ে বাইরে চেয়ার, বেঞ্চ ও বিস্তৃত সতরঞ্চির ওপর বসেই অনেকে নৈশভোজন সমাপ্ত করে নিলেন। পাঠানকোটে টুরিষ্ট কোচে রাত্রি কাটিয়ে পরের দিন ২রা সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালীন চা-জলখাবার খেয়ে শক্তিপীঠ জ্বালামুখী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলুম।

ছয়

॥ জ্বালামুখী—হিমাচল প্রদেশ ॥

জ্বালামুখী একটি তন্ত্রপীঠ। পীঠ অর্থে বেদী বা বেদিকা—যাহা দুর্গা, কালী, পার্বতী, উমা ও গৌরী প্রভৃতি দেবীর প্রিয় আশ্রয়স্থল বলে পূজিত। বিশেষ কোন একটি দেবীর নামের সঙ্গে ভৈরব বা শিবকে যুক্ত করেই এই পীঠমাহাত্ম্য প্রচলিত। তন্ত্রচূড়ামণি মতে এগুলি তন্ত্রাচারের অন্তর্ভুক্ত। শব্দকল্পদ্রুম (১৮২২-৫২) ও প্রাণ-তোষিণী তন্ত্রে (১৮২০) এরূপ ৫১টি পীঠের উল্লেখ আছে। আবার এইসব পীঠে যোগী ও সাধকগণ নিয়মিত ধ্যান-জপ দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেছেন এ উদাহরণও বিরল নয়। এজন্য মাতৃসাধকদের নিকট এই পীঠগুলি সাধনার পরম প্রিয় স্থান। জ্বালামুখী এইরূপ ৫১ পীঠের অন্যতম এক পীঠ। যাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে উক্ত হয়েছে :

"জ্বালামুখী জিহ্বা তাহে অগ্নি অনুভব
দেবীর অম্বিকা নাম উন্মত্ত ভৈরব।"

অর্থাৎ এই পীঠে দেবী অম্বিকারূপে পূজিতা ও ভৈরবের নাম উন্মত্ত। লেলিহান অগ্নিশিখা অহরহ প্রজ্জ্বলিত—নাম অমর জ্যোতি। এই পীঠটি উদ্ভবেরও একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা আছে—সেটি অনেকেরই জানা, তবু এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

এক সময় দক্ষপ্রজাপতি (আনুমানিক ৪র্থ শতকের পূর্বে) এক মহান্ যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী হয়ে দেবতাকুল ও তাঁর অন্যান্য জামাতা ও কন্যাগণকে আমন্ত্রণ জানান। অনার্য দেবতা বিবেচনায় কেবলমাত্র জামাতা শিব ও কন্যা সতীকে এই যজ্ঞে আমন্ত্রণ করেন নাই। সতী কিন্তু শিবের নিষেধ উপেক্ষা করেই যজ্ঞদর্শনার্থে পিত্রালয় যাত্রা করেন। দক্ষ সেই যজ্ঞসভাতেই শিবের নিন্দাবাদ করে সতীকে যথেচ্ছা অপমান করেন। পতিনিন্দা শ্রবণে দুঃখে ও ক্ষোভে সতী সভামধ্যেই

দেহত্যাগ করেন। সতীর দেহত্যাগ শ্রবণমাত্রেই শিব তাঁর অনুচরবর্গ সহ দক্ষযজ্ঞ নাশ ও দক্ষকে রাজ্যচ্যুত করেন। দক্ষ তখন শিবকে দেবশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেন। মতান্তরে শিবের তাণ্ডবনৃত্যকালে ছিন্ন জটা হতে উদ্ভূত বীরভদ্র নামে দৈত্য দক্ষকে শাস্তিদান করেন। দক্ষযজ্ঞ নাশের পরেও প্রিয়তমা পত্নী সতীর দেহত্যাগে শিব গভীর শোকে মুহ্যমান হয়ে সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লয়ে উন্মাদবৎ ভূমণ্ডল পরিক্রমা করতে থাকেন। এতদ্দৃষ্টে দেবগণ শিবকে এই মোহাবস্থা হতে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন ও দেবগণের অনুরোধে বিষ্ণু শিবের পশ্চাদনুসরণ করে তাঁর চক্র দ্বারা শিবের স্কন্ধস্থিত সতীদেহ খণ্ড বিখণ্ড করে দেন এবং যে যে স্থানে সতীদেহের বিচ্ছিন্ন অংশ পতিত হয় তার নাম হয় পীঠ। পীঠগুলিতে পূর্বে কোন মূর্তি ছিল না—জলাশয়, বেদিকা কিংবা একখণ্ড প্রস্তর ছিল। মূর্তিগুলি পরবর্তী সংযোজন।

যাই হোক, এ হেন ৫১ পীঠের অন্যতম বিশিষ্ট পীঠ জ্বালামুখী (যেস্থানে দেবীর জিহ্বা পতিত হয়েছিল) দর্শনের উদ্দেশ্যে ২রা সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালীন জলযোগাদি সমাপ্ত করে ৭-১৫ মিনিটে বাসযোগে পাঠানকোট হতে রওনা হয়ে গেলুম কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্মচারী সহ প্রায় পঞ্চাশজন যাত্রী। পাঠানকোট হতে জ্বালামুখীর দূরত্ব ৭৫ মাইল। উত্তর-পূর্ব দিক ঘেঁষে একদিকে বেরিয়ে গেছে ডালহৌসী, ধরমশালা ও কুলুভ্যালি যাবার মোটর পথ। অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণ ঘেঁষে চলেছে আমাদের বাসখানি জ্বালামুখীর পথে। মাঝে মাঝে বনপথের অন্তরালে ছোট ছোট গ্রাম—উল্লেখ-যোগ্য বর্ণনা কিছুই নাই। পথের দু'ধারে বৃক্ষশ্রেণী। পথিমধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান কাংড়াভ্যালি—প্রসিদ্ধি তার অনবদ্য চিত্রকলার জন্য। তবে অধুনা তা বিরল ও দুষ্প্রাপ্য। পূর্বে জ্বালামুখী ছিল পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত এবং কাংড়া জেলায় অবস্থিত। এখন এটি হিমাচল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে তিন ঘণ্টা চলার পর ১০-৪৫ মিনিটে

জ্বালামুখী পৌঁছলুম। প্রখর রৌদ্র—একটু চড়াই অতিক্রম করেই মূল মন্দির। গোলাকৃতি মন্দির-চত্বর। দক্ষিণ-পূর্বকোণে মন্দিরের প্রবেশ পথ। বামপার্শ্বে একটি কুণ্ড। প্রতিটি পীঠস্থানের সন্নিকটে এরূপ একটি কুণ্ড বা জলাশয় জাতীয় কিছু দৃষ্ট হয়। এইগুলিই পূর্বে যোনিকুণ্ডরূপে প্রচলিত ছিল।

মূল মন্দির সম্মুখে ছোট একটি নাটমন্দির অতিক্রম করে সন্নিকটস্থ অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্থানে বা গর্তের উপরে একটি স্তূপাকৃতি স্থান, তারই গাত্রদেশ হতে দুটি লেলিহান অগ্নিশিখা কোন্ স্মরণাতীত কাল হতে প্রজ্জ্বলিত—এরই নাম অমর জ্যোতি বা 'জ্বালামুখী জিহ্বা তাহে অগ্নি অনুভব' এই তন্ত্রোক্ত বাণীর বাস্তব রূপ। এখানে দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। সন্নিকটস্থ একটি দোকান হতে কিছু পেঁড়া ও পুষ্পাদি ক্রয় করে দেবীপূজার্থে পূজারীর হস্তে প্রদান করলুম এবং মন্দিরাভ্যন্তরস্থ স্তূপটি প্রদক্ষিণ করলুম সকল দর্শনার্থী। বেলা ১২টার মধ্যে মন্দিরদ্বার রুদ্ধ হল। ইতিমধ্যে আমরা কুণ্ডের হিমশীতল জলে স্নানাদি সম্পন্ন করে স্নিগ্ধ হলুম এবং পার্শ্বস্থ শিবমন্দিরে কিছুক্ষণ নীরবে একাগ্রচিত্তে অপেক্ষা করতে লাগলুম। প্রায় অর্ধঘণ্টা পর মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হল এবং সকলেই শান্তচিত্তে দেবীর ভোগারতি দর্শন করে শেষ প্রণাম জানিয়ে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ধরমশালা অভিমুখে রওনা হলুম। জ্বালামুখীতে কোন দেবীমূর্তি নাই বা বলির ব্যবস্থাও নাই। ধরমশালায় উপস্থিত হয়ে সত্বর মধ্যাহ্ন ভোজনের পর্ব শেষ করে বেলা ২টার মধ্যে জ্বালামুখী হতে বাসযোগে রওনা হয়ে কাংড়াতে পৌণে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে সেখানে কাংড়ার দুর্গা (অষ্টধাতু নির্মিত) মূর্তি দর্শন করে পাঠানকোটের পথে চলতে শুরু করলুম। সন্ধ্যা ৬-১৫ মিনিটে পাঠামকোট পৌঁছে গেলুম। ইতিমধ্যে প্লাট্‌ফরম হতে আমাদের বগিটি পাঠানকোট এক্সপ্রেসের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আমরা আপন আপন নির্দিষ্ট স্থানে উঠে বসে পড়লুম।

সান্ধ্য-জলযোগের উপকরণ ও তৎসহ চা এসে গেল। ক্লান্তির পর সেগুলির সদ্ব্যবহার করে ট্রেনখানি ছাড়ার জন্য সকলেই উদগ্রীব হয়ে রইলেন। রাত্রি ৮-৩০ মিনিটে পাঠানকোট এক্সপ্রেস চলতে শুরু করল। পরদিন ৩রা সেপ্টেম্বর বেলা ১০-৩০ মিনিটের মধ্যে মোরাদাবাদ পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মোরাদাবাদী জিনিষপত্র ক্রয় করার লোভে। সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে লক্ষ্নৌ পৌঁছে গেলুম। হুস্ হুস্ শব্দে চলেছে পাঠানকোট এক্সপ্রেস পরিচিত অপরিচিত বহু ষ্টেশন অতিক্রম করে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর বেলা ২-৩০ মিনিটে বর্ধমানে ট্রেনখানি এসে থামল। দু'ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব পৃথিবীর বৃহত্তর নগরী তথা শোভাযাত্রার নগরী কলিকাতায়। ভাবছি সংসারে যার কোন বন্ধনই নাই সে আবার ফিরে চলেছে কিসের আশায়—কোন্ আকর্ষণে? কবির ভাষায় মনে পড়ে:

"জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চায়,
ছাড়িতে গেলে ব্যথা বাজে।"

সত্যই, এ আকর্ষণ যায় না, হঠাৎ যেতে চায় না। জন্মান্তরীণ সংস্কাররূপে বাঁধা আছে সূক্ষ্মাকারে। মনের সংকল্প-বিকল্প যতদিন থাকে ততদিন অনিবার্যরূপেই থেকে যায় এ আকর্ষণ—কি সংসারী, কি বিবিক্ত, কি সন্ন্যাসী সকলের মধ্যেই—কোন-না-কোনরূপে। ইচ্ছামাত্রেই তা মন থেকে দূর করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন জন্মজন্মব্যাপী সুচির-সঞ্চিত যে বাসনা-কামনা তা ক্ষয় করার তীব্র প্রয়াস। সংযম, তিতিক্ষা ও ত্যাগ-তপস্যা অভ্যাস এবং ঈশ্বরে সমর্পিত চিত্ত হওয়া। এসব প্রস্তুতি-পর্ব উদ্‌যাপনের পর বিরল কোন কোন ভাগ্যবানের মনের সংকল্প-বিকল্প হয় নাশ—লাভ করেন সেই পরম আনন্দময় সত্তা। নিঃশেষে ক্ষয় হয় তাঁর সকল বন্ধন ও আসক্তির আকর্ষণ:

"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"

সব আনন্দেরই শেষ আছে—নাই কেবল স্বরূপানন্দের, ব্রহ্মানন্দের। নাই তাতে আনন্দোত্তর অবসাদ। পরমানন্দময় সে অনুভূতি—অব্যক্ত, অবসাদহীন, জড়তাহীন ও অশেষ। বৈকাল ৪টা। শিয়ালদহ ষ্টেশনে ট্রেন থামল। সব চলাই একদিন থামে।

॥ যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী-গোমুখ ॥

এক

॥ হরিদ্বার—ঋষিকেশ ॥

এবারেব যাত্রায় ছিল না কোন মানসিক দ্বন্দ্ব। দিক্-নির্ণয় যন্ত্রেব কাঁটাব মত মন ছিল উত্তরাভিমুখী। কাবণ, যাত্রাপর্বেব পরিণতিতে উত্তবাখণ্ড পবিক্রমা পরিসমাপ্তি। সহকর্মী সীতেনবাবুব সম্মতি জেনে ৪ঠা এপ্রিল কুণ্ডু স্পেশ্যালেব স্ট্যাণ্ড বোড অফিসে উপস্থিত হয়ে যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী যাত্রাব দুটি আসন সংবক্ষণেব ব্যবস্থা কবে এলুম। ৬ই মে রাত্রি ১০-১৫ মিনিটে দেবাদুন এক্সপ্রেস্ যোগে যাত্রাব দিন। দেখতে দেখতে এসে গেল সেই শুভদিনটি। বাত্রি ৮-৩০ মিনিট মধ্যে শ্রীবামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ হতে সোদবোপম দেবাশীষ এসে উপস্থিত হাওডা ষ্টেশনে পৌছে দেবাব অভিপ্রায়ে। উদযাপন-পর্বেই বাধা সৃষ্টি। হাওড়া ষ্টেশনগামী কোন ট্যাক্সি মিলল না বহু চেষ্টায় রাত্রি ৯টা পর্যন্ত। অগত্যা একখানি রিক্‌শায় আমরা দু'জন। অপর একখানিতে দুর্গম যাত্রাপথের অভিনন্দন-জ্ঞাপনকারী প্রিয়জন হিসাবে শ্রীবারাণসী দত্ত ও অমর ঘোষ রওনা হয়ে গেলেন ষ্টেশনাভিমুখে। পঁয়তাল্লিশ মিনিটেব মধ্যেই পৌছে গেলুম ষ্টেশনে। ততক্ষণে টুরিষ্ট কোচের অনেক যাত্রীই এসে গেছেন। সহকর্মী সীতেনবাবু আমার উপস্থিতির পূর্বেই তাঁর সংরক্ষিত আসনটি দখল করে ঘোরা-ফেরা করছেন প্লাট্‌ফরমে আমার অপেক্ষায়। তাঁর সঙ্গে যুক্ত নিজ আসনটির ব্যতিক্রম দেখে প্রথমে বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলুম এবং কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ পেশ করতেও বিলম্ব হয়নি। তাঁরা শান্তভাবে বোঝালেন যে, অর্ধাসনের পরিবর্তে কর্তৃপক্ষ সীতেনবাবুর পাশেই আমার জন্য একটি পুরো আসনের ব্যবস্থা করেছেন। বহু বিতর্কের

পর তাঁদের যুক্তিই অনুমোদন করে জিনিসপত্র গুছিয়ে সকলেই নিজ নিজ আসন অধিকার করে বসলুম। আশা করিনি সহকর্মী প্রশান্ত মজুমদারকে। সেও ষ্টেশনে এসে উপস্থিত—অভিনন্দন জানাতে। ১০-৩০ মিনিটে ট্রেনখানি প্লাট্‌ফরম ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন বারাণসীবাবু, চলে গেল দেবাশীষ, অমর ঘোষ ও প্রশান্ত। অপর যাত্রীদের পক্ষ হতে যাঁরা এসেছিলেন অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে তাঁরাও অদৃশ্য হয়ে গেলেন ধীরে ধীরে। মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। উদাস নেত্রে চেয়ে রইলুম তাঁদের দিকে—অনুসন্ধান করতে একখানি হাসিভরা মুখ—মাত্র ৯ মাস পূর্বেও যিনি বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন অমরনাথ যাত্রাকালে। দৃষ্টির কোন্ সুদূর অন্তরালে চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে পূর্ণেন্দুবাবুর সেই সদাহাস্যময় মুখখানি। অবিস্মরণীয় সে স্মৃতি। তবু ভুলতে হয়। ভুলে যাওয়াই যে সংসারের রীতি। কাল আবরণ দিয়ে সব কিছুই ভুলিয়ে দেয়।

দেরাতুন এক্সপ্রেস ছুটে চলেছে হুস্ হুস্ শব্দে। স্বভাবসুলভ নির্বিকার ও উদাসীন চিত্তে জানালার পাশটিতে বসে আছেন পুরাতন সহযাত্রী সরলবাবু। কামরাটিতে প্রবেশ করেই তাঁকে চিনে নিতে বিলম্ব হল না। সারি সারি অপরিচিত মুখ। এঁরাই কয়েকদিনের মধ্যে হয়ে উঠবেন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ক্রমেই রাত্রি গভীর হচ্ছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। বাতি নিবিয়ে সকলেই আপন আপন শয়নোপযোগী সংরক্ষিত আসনে গা ঢেলে দিলেন নিদ্রাদেবীর আরাধনায়। বর্ধমানে তিনজন যাত্রী উঠলেন আমাদের কামরাটিতে।

৭ই মে সকাল ৭টার মধ্যে ট্রেনখানি গয়া প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল সুচির-সঞ্চিত একটি স্মৃতি—আকাশগঙ্গা পাহাড়, ব্রহ্মানন্দ পরমহংস ও গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের কথা। সে অনেক কথা—অনেক ইতিহাস। বাংলার ও বাঙালীজাতির নব অভ্যুদয়ের ইতিহাস। আকাশগঙ্গা পাহাড়ে এক অজ্ঞাত পরমহংসের নিকট দীক্ষালাভ ও অহৈতুকী কৃপাস্পর্শে গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের ভগবৎ

অনুভূতি। তারপর গেণ্ডেরিয়ার গভীর অরণ্যাণীতে লক্ষ ফকির দরবেশের কবরের উপর অদ্বৈতবংশের উত্তরাধিকারী গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের কঠোর সাধনা। সাধনায় সিদ্ধিলাভান্তে নগরে নগরে, তীর্থে তীর্থে হরিনাম বিতরণের পর্ব। বাঙালীর ষোড়শ শতাব্দীর সেই বিস্মৃত পরিত্যক্ত হরিনাম গানে আবার আকাশ-বাতাস মুখরিত। বৈষ্ণবধর্মের যুগাবতার বিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাবে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবধর্মের পুনরায় নবরূপে আত্মপ্রকাশ। ইহাই বিজয়কৃষ্ণের সাধন-জীবনের বিকাশ ও পরিণতির ইতিহাস।

ইতিমধ্যে আমাদের কামরাটির যাত্রীদের মধ্যে গড়ে উঠেছে একটি ঘরোয়া পরিবেশ যার একান্ত অভাব ছিল অমরনাথ যাত্রাপথে। বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন বয়সের স্ত্রী-পুরুষ মিলে মিশে আপন মনের মাধুরী দিয়ে মাসিমা-দাদা-দিদি-কাকা-দাছু প্রভৃতি সম্পর্ক পাতিয়ে একটি মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করে তুলেছেন। সকলেই যেন একটি পরিবারভুক্ত স্বজন-পরিজন এবং পরস্পরের সুখ-দুঃখের সমব্যথী। এই যে একটি আনন্দময় পরিবেশ এটিই আমাদের তিন সপ্তাহ যাত্রা-পথের পাথেয়। এ আনন্দ কোন অংশে কম নয় তীর্থ দর্শনের আনন্দের তুলনায়। কারণ, আমাদের জীবন-মন্থনজাত আনন্দরসে জারিত করেই তো অনুভব করে থাকি তীর্থদেবতাদের আনন্দময় সত্তারূপে। স্বরূপতঃ আনন্দ একটি অবস্থা বিশেষ—তা মানুষকে কেন্দ্র করেই হোক আর দেবতাকে কেন্দ্র করেই হোক। তাইতো কবি বলেছেন ঃ

> "দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
> প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
> তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা
> দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

আলাপে-প্রলাপে আর হাসি-উচ্ছ্বাসে পৌঁছে গেলুম বারাণসী বেলা ১১-৪৫ মিনিটে। দেরাদুন এক্সপ্রেস নির্মমভাবে আমাদের

বগিটি বিচ্ছিন্ন করে দ্রুতগতি চলে গেল আপন গন্তব্য পথে। এখানেই শেষ হল আমাদের স্নান-আহারাদির পর্ব। বেলা ১-৩০ মিনিটে কোচটি পুনরায় 'বারাণসী-দেরাদুন-জনতা'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে চলতে শুরু করল আরও মন্দগতিতে। এইভাবে বারাণসী হতে ১৯½ ঘণ্টা চলার পর ৮ই মে বেলা ৯-০৫ মিনিটে হরিদ্বার পৌঁছে গেলুম। আবার হরিদ্বার। বার বার সাতবার। তবু কিন্তু পুরাতন মনে হয় না। নব নবরূপে প্রতিভাত হরিদ্বার। বিশেষ করে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও ভোলানন্দ গিরির আশ্রম-নিম্নস্থ গঙ্গার উচ্ছল তরঙ্গ-ভঙ্গ আবেগ-চঞ্চল করে তোলে প্রাণচেতনাকে জীবনের জয়যাত্রার পথে। জানিনা, জীবধাত্রী জহ্নু-কন্যার মহিমা কিনা! সেদিন ছিল অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যতিথি। ট্রেনখানি প্লাট্ফরমে প্রবেশেব সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই দ্রুতপদে বেরিয়ে পড়লেন ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের আশায়। প্রতিবারই হরিদ্বারে এসে লক্ষ্য করেছি ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের জন্য স্ত্রী-পুরুষ সকল যাত্রীরই কি আকুতি! এ কি পতিতোদ্ধারিণীর অদ্ভুত আকর্ষণ। মাত্র ১৭।১৮ ঘণ্টার জন্ম এখানে অবস্থিতি। সুতরাং এই স্বল্প সময়টুকুর ব্যবধানে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানান্তে প্রত্যাবর্তন পথে অনেকেই হর-কি-পৌড়ীর বাজার হতে ক্রয় করে নিলেন আপন প্রয়োজনীয় সামগ্রী। কুণ্ডু স্পেশ্যালের নিয়মমত মধ্যাহ্ন ভোজন শুরু হল বেলা ১২টার মধ্যেই।

আপন আপন প্রিয়জন সহ এক-একটি দল বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন অনেকেই। কেহবা ব্রহ্মকুণ্ডে আরাত্রিক দর্শনে, কেহবা কন্‌খল প্রভৃতি দর্শনে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সীতেনবাবু, সরলবাবু সহ আমরা তিনজনে যাত্রা করলুম কনখল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম অভিমুখে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ধ্যারাত্রিক লগ্নে দুর্গম যাত্রাপথের পাথেয়রূপে আশীর্বাণী প্রার্থনা করে ও স্বামীজীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গঙ্গোত্রী-পথে লংকা পর্যন্ত বাস চলাচলের সংবাদ জেনে ফিরে এলুম টুরিষ্ট কোচে রাত্রি ৯টার মধ্যে। সন্ধ্যার পর

হরিদ্বার বেশ জমজমাট। বিজলী বাতির আলো ঝলমল দু'পাশের দোকান, পীচ-বাঁধান বড় রাস্তা ষ্টেশন হতে ব্রহ্মকুণ্ড বরাবর। তারপর মোটর, ট্যাক্সি, সাইকেল রিক্শা প্রভৃতির অবিরত যাতায়াত। অগণিত দোকান আর ব্যবসা-বাণিজ্য, অসংখ্য রেস্তোরাঁ, জনবহুল পথ-ঘাট-সভ্যতার সব উপকরণই আজ এখানে পৌঁছে গেছে। হরিদ্বারে এসে যোগ দিলেন আরও একজন মহিলা যাত্রী শ্রীমতী রমা ঘোষ, বয়স প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায়।

৯ই মে সকাল ৫-১৫ মিনিটে যাত্রীবাহী ট্রেনে হরিদ্বার হতে রওনা হয়ে ঋষিকেশ পৌঁছে গেলুম ৬-১৫ মিনিটে। এখানে একদিন অবস্থিতি। সুতরাং জলযোগ সেরে টাঙ্গা করে বেলা ৮টার মধ্যে দলে দলে সকলে বেরিয়ে পড়লেন লছমনঝুলা, গীতাভবন প্রভৃতি দর্শনান্তে গীতাভবনের ঘাটে স্নান সেরে সময়মত টুরিষ্ট কোচে ফেরার তাগিদে। সীতেনবাবু, সরলবাবু সহ আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়লুম ঋষিকেশ অভিমুখে। ঋষিকেশের বাজার ঘুরে স্নান সেরে ফিরে এলুম টুরিষ্ট কোচে বেলা ১১টার মধ্যে। তখনও প্রত্যাবর্তন করেন নি গীতাভবনের স্নানার্থীরা। এক বৎসরের মধ্যে ঋষিকেশেরও বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষ করে স্নানের ঘাট-বরাবর যে বালিয়ারি রাস্তা, তা পাথর ও ইট গেঁথে নূতন করে নির্মিত হয়েছে। ফলে স্নানার্থীদের যাতায়াতের পথ হয়েছে সুগম। ঋষিকেশের যেরূপ দ্রুত উন্নতি শুরু হয়েছে মনে হয় কয়েক বৎসরের মধ্যেই হরিদ্বারের মত চাক্‌চিক্য-পূর্ণ শহরে পরিণত হবে। বৈকালে সীতেনবাবুর সঙ্গে ঋষিকেশের বাজার ঘুরে ৩নং তিলক রোডে পুরাতন বন্ধু স্বামী সদানন্দ গিরির সংবাদ নিয়ে চলে গেলুম কৈলাস মঠ পর্যন্ত। কুণ্ডু স্পেশ্যালের মহিলা যাত্রীরাও বেরিয়ে পড়েছেন দলে দলে ঋষিকেশ দর্শনে পরিপাটি সাজ-সজ্জা করে। ফিরে এলুম রাত্রি ৯টার মধ্যে।

কয়েকদিনেই আমাদের কামরাটির কিছু সংখ্যক সহযাত্রীদের মধ্যে সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কেদারবদরী ও অমরনাথ

যাত্রা অপেক্ষা এবারের সহযাত্রীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন উচ্চ-শিক্ষিত ও অভিজাত। ফলে কয়েকজন ব্যতীত সবার সঙ্গে গড়ে উঠেছিল একটি রুচিমার্জিত আচরণ পরস্পরের ভাব-ভাষার আদান প্রদানে। আমাদের কামরা হতে অপর কামরায় যাতায়াতের পথে মাত্র একটি দরজার ব্যবধান। এই দরজাটির দক্ষিণ পার্শ্বে পুরাতন সহযাত্রী ষষ্টি বৎসর বয়স্ক শ্রীসরলকুমার দাস। তাঁর উপরের বাঙ্কে কালনা হতে আগত দীর্ঘ কেশ ও শ্মশ্রুবিলম্বিত শ্রীঅবনীকুমার বিশ্বাস, বয়স পঞ্চাশোর্ধ্বে। স্নানান্তে দীর্ঘ আধ ঘণ্টা অধোমুখে তাঁর কেশচর্চা কামরাটির সহযাত্রীদের মধ্যে একটি হাস্যরসের উদ্দীপনা সৃষ্টি করতো। এজন্য হাঁটা-পথে সর্বাগ্রে তাঁকে যাত্রা করতে হয়েছে এক চটি হতে অপর চটিতে—স্নানের প্রথম সুযোগ গ্রহণের আশায়। আমরা যখন প্রতিটি চটিতে উপস্থিত হয়েছি তখন দেখেছি অবনীবাবু স্নান সমাপন করে কেশবিন্যাসে ব্যস্ত। ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগে জেনেছি যে, ঈপ্সিত কতকগুলি তীর্থদর্শনান্তে তিনি কেশগুচ্ছ মুণ্ডন করবেন। সরল-বাবুর আসনের মাঝে অপর কামরায় যাতায়াতের যে পথ তার বাম-পার্শ্বে পর পর চারজন মহিলার সংরক্ষিত আসন। প্রথম আসনটিতে কুমারী ডালিয়া মল্লিক, বয়স ২৪-এর কোঠায়। পরবর্তী আসনটিতে তার বিধবা মাতা শ্রীপারুল মল্লিক, বয়স উত্তর চল্লিশে। মাতা-পুত্রীর রুচিসম্মত ও আভিজাত্যপূর্ণ মধুর ব্যবহারে কামরাটির সকল যাত্রীই ছিলেন তুষ্ট। দু'জনেই আমার সম্মুখস্থ আসনের বাসিন্দা। স্বভাবতঃই অবসরমুহূর্তে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে হয়েছে নানা আলোচনায়, বলতে হয়েছে অনেক কথা। বিশেষ করে শ্রীমতী মল্লিক ভারত সরকার-প্রদর্শিত চলচ্চিত্রে আচার্যদেব স্বামী অভেদা-নন্দের প্রামাণ্য জীবনী-চিত্র দর্শনে মুগ্ধ হওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি ছিল একটি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার। ফলে কখন চলার পথে, কখন টুরিষ্ট কোচের কামরাতে ধর্মীয় আলোচনার মাধ্যমে বহু প্রশ্নের সমাধানে হতে হয়েছে সচেষ্ট। শ্রীমতী মল্লিকের পার্শ্বস্থ দুটি আসনের

একটিতে বিধবা শ্রীগৌরী সেন, বয়স ষাটের কোঠায়, অপরটিতে সধবা শ্রীবীণাপাণি চক্রবর্তী, বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। শ্রীমতী গৌরী সেনের বাচনভঙ্গীতে ছিল এমন একটি সাবলীল সরসতা যে বাক্য-স্ফূর্তির সঙ্গে সঙ্গে অনেকের চিত্ত হতো আকৃষ্ট—তাঁর আলাপচারিতার প্রতি। শ্রীমতী বীণাপাণি চক্রবর্তী সহানুভূতিপ্রবণ, সহজ, সরল প্রকৃতির মানুষ। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর মিটিয়ে এসেছেন উভয়েই প্রয়োজনমত তাম্বুল আর যোয়ানের চাহিদা। আমাদের সম্মুখ দিয়ে শৌচাগারে যাবার পথ। তার দক্ষিণ পাশে অকৃতদার শ্রীসীতেন্দ্রনাথ রায়, বয়স ছাপ্পান্ন। কখন জানালার পাশে বসে বাহিরের দৃশ্য উপভোগে, কখনওবা খৈনী ও নস্যতে মশ্‌গুল হয়ে আছেন। সীতেনবাবুর উপরে দীর্ঘ বাঙ্কে বেহালা হতে আগত দুই বন্ধু শ্রীকেশবকিংকর মুখার্জি ও শ্রীসুধীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। উভয়েই প্রৌঢ়ত্বের সীমায়। এঁদের মধ্যে কেশববাবু যে এককালে ব্যায়ামবীর ছিলেন তাঁর পেশীবহুল দেহ ও ৫২ ইঞ্চি বুকের প্রশস্ততা আজও তা যাত্রীমাত্রকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। হয়তো এজন্যই তিনি অধিকাংশ সময় নগ্নগাত্রে থাকা পছন্দ করতেন। সুধীনবাবু বিপত্নীক। সংসারে একমাত্র পুত্র। তাই মনের বিবাগী-ভাবনার রঙে লুঙ্গি আর গায়ের জামা রঙিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তীর্থে তীর্থে। সীতেনবাবুর পাশে সংরক্ষিত আসনটির অধিকারী আমি নিজে। আত্মপ্রশংসা ও আত্মনিন্দা উভয়ই অরুচিকর —সুতরাং এ বিচারের ভার সহযাত্রীদের উপর। মাঝে যাতায়াতের যে পথ তার পাশেই কালনা হতে আগত শ্রীতারকনাথ ঘোষ, বয়স উত্তর পঞ্চাশের কোঠায়। গ্রাম্যজীবনের বহু তিক্ত-মধুর আচরণ তাঁর ব্যবহারে পরিস্ফুট। সাধারণ হতে একটু ভিন্ন চরিত্রের মানুষ। তাঁর পাশের আসনে কেরলের অধিবাসী অকৃতদার শ্রীরামকৃষ্ণ পিল্লাই। পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ভারত সরকারের অফিসের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। ভিন্ন ভাষাভাষী হলেও আমাদের কয়েকজনের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ ও মধুর সম্পর্ক। তাই সকল সময়েই কি

ধরমশালায়, কি দর্শনাদিতে তাঁকে সঙ্গী করে নিতে কোন অসুবিধাই হয় নি। যাত্রাপথে কাজে-কর্মে বহু সাহায্য মিলেছে তাঁর। শীত-প্রধান দেশেও যে মানুষ সহিষ্ণুতার গুণে কত কম পরিচ্ছদ ও শয্যাদি ব্যবহারে প্রয়োজন মিটিয়ে নিতে পারে সমগ্র কোচটিতে, পিল্লাই ছিল তার উদাহরণ। পিল্লাই-এর পাশে জানালার ধারে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি—চলচ্চিত্র অভিনেতা শুভেন্দু চ্যাটার্জির পিতা, বয়স সত্তর। শিক্ষকতার কাজে দীর্ঘদিন ব্রতী ছিলেন, এজন্য তাঁকে 'মাষ্টারমশাই' বলেই অনেকে অভিহিত করতেন। সহজ, সরল প্রকৃতির মানুষ। শৈলেনবাবুর উপরের বাঙ্কে কালনা হতে আগত শ্রীপাঁচুগোপাল পাল। নিরিবিলি, নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। তীর্থদর্শনের সকল বিধি-ব্যবস্থা পালন করে চলেছেন আপন অভিরুচিমত পুণ্যসঞ্চয়ের আশায়। নানা দেশের, নানা চরিত্রের এইসব মানুষগুলির সঙ্গে চলেছি যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী দর্শনে।

সেদিন ছিল ২৫শে বৈশাখ (৯ই মে) রবীন্দ্রাথের জন্মদিন। ছিন্ন, খণ্ড কয়েকটি পংক্তি ভেসে এল অজ্ঞাতসারে মনের ওপর ঃ

"আজিকার কোন ফুল, বিহঙ্গের কোন গান,
আজিকার কোনো রক্তরাগ
অনুরাগে সিক্ত করি পারিব না পাঠাইতে
তোমাদের করে
আজি হতে শত-বর্ষ পরে
এখন করিছে গান সে কোন নূতন কবি
তোমাদের ঘরে।"

রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাধারা ব্যর্থ করে আজও আমরা তাঁকে ভালবাসি, তাঁর গান শুনি—স্মৃতিপূজা করি। তাই তো ঋষিকেশে এসেও প্লাটফরমে মুক্তাঙ্গনে যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রীর যাত্রীরা রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালনে উৎসুক। অবশ্য সময়মত সকলের উপস্থিতির অভাবে শেষ পর্যন্ত এ উৎসব অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। ৯ই মে যমুনোত্রী-

গঙ্গোত্রী যাবার উদ্দেশ্যে আরও কয়েকজন যাত্রী ঋষিকেশে যোগদান করলেন। তাঁরা হলেন—মহিলা বৈমানিক শ্রীমতী দূর্বা ব্যানার্জী ও সস্ত্রীক সলিসিটব শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং কলিকাতা হতে আগত অকৃতদার শ্রীগোবিন্দলাল মুখার্জি ও তাঁর বৃদ্ধা মাতা। দশ বৎসর পূর্বের ঋষিকেশের এখন রূপ-পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। সেদিনও হরিদ্বার হতে ঋষিকেশের পথ ছিল ঘন অরণ্যাণী সন্নিবিষ্ট। সেই নির্জন পথে বাস চলাচলকালেও হতো ভীতির সঞ্চার। এখন এ্যান্টিবায়োটিক কাবখানাকে কেন্দ্র কবে গড়ে উঠেছে মস্ত এক কলোনী, জনবহুল পথ-ঘাট, মোটর-ট্রাক, ট্যাক্সি-বাসে পূর্ণ।

॥ **নরেন্দ্রনগর** ॥

১০ই মে সকাল ৬টায় ঋষিকেশ ষ্টেশন হতে কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্মচারী সহ তেতাল্লিশজন যাত্রী নিয়ে প্রথম গেটের তু'খানি বাস চলতে শুরু করল গঙ্গাণী অভিমুখে "আমাদের যাত্রা হল শুরু" সঙ্গীতটিব সুললিত সুবের ছন্দে ছন্দে। দেবাহুনের তেরাই অঞ্চলেব একাংশের মধ্য দিয়ে সুন্দর একটি চড়াই পথ। সেই পথ ধরে ধীবে-মন্থরে চলতে চলতে—ধাপে ধাপে ১৭০০´ ফুট উচ্চতা আর ১০ মাইল পথ অতিক্রম করে বাসখানি ৭টার মধ্যে পেঁাছে গেল নরেন্দ্রনগর। নরেন্দ্রনগর একটি সুশ্রী ও উপভোগ্য পার্বত্য জনপদ। গায়ে লাগল হিমেল হাওয়ার স্নিগ্ধ স্পর্শ। সেই সঙ্গে হরিদ্বার-ঋষিকেশের জনকোলাহল ত্যাগ করে এখানে এসে প্রথম অনুভব করলুম নিবিড় নিভৃতির একটি আস্বাদ। ৩৮৫০´ ফুট উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলটিতে টিহরির মহারাজা নরেন্দ্র শাহজী এই নগরটি পত্তন করেন ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে। এককালে এটিই ছিল গাড়োয়ালের রাজধানী। পুরাতন গাড়োয়াল এখন চারভাগে বিভক্ত: টিহরি, উত্তরকাশী, চামোলি ও পৌড়ি। উত্তরে ছুটি জেলা চামোলি ও উত্তরকাশী। চামোলি ধরে রেখেছে কেদার ও বদরীনাথ। উত্তরকাশী ধরে রেখেছে যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী।

ঋষিকেশ হতে একটি "মোটর পথ" নরেন্দ্রনগর-টিহরি-ধরাসু হয়ে বামদিকে যমুনোত্রী উপান্তে চলে গেছে। অপরটি ধরাসু হতে উত্তর পথে (ডাইনে) সোজা উত্তরকাশী হয়ে গঙ্গোত্রী চলে গেছে। এক কথায় ধরাসু হল যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী যাত্রাপথের সংযোগস্থল। আমরা চলেছি ধরাসু হয়ে যমুনোত্রী পথে গঙ্গাণী। অবশ্য এ বৎসর বাস গঙ্গাণী ছাড়িয়ে চলে গেছে আরও ৫ মাইল কুৎনৌর পর্যন্ত। ঋষিকেশ হতে কুৎনৌর উচ্চশ্রেণীর বাস ভাড়া ১৯·২২ প. নিম্ন শ্রেণীর ১৩·৭০ প.। "Tihri Garhwal Motor Owners Corpn. (P) Ltd" বা "যাতায়াত আউর পর্যটন বিকাশ সহকারী সংঘ" এই দুটি পরিবহন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ বিধানের মাধ্যমে যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী যাত্রার ব্যবস্থা করে নিতে হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে টিহরি-গাড়োয়াল উত্তর প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। নরেন্দ্রশাহ শেষ সামন্ত-নৃপতি। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে টিহরির পার্বত্য পথে মোটর দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। বাস স্ট্যাণ্ড হতে অনতিদূরে রাজপ্রাসাদটি অপেক্ষাকৃত একটি নির্জন টিলায় অবস্থিত। বাজার, ডাকবাংলো, কাছারী, হাসপাতাল, থানা, পার্ক সবই আছে নরেন্দ্রনগরে। সুখের বিষয় আজও নাগরিক সভ্যতা প্রবেশ করেনি এখানে।

বাস স্ট্যাণ্ডটি বেশ প্রশস্ত। পাশেই চা-জলখাবারের দোকান ও ছোট ছোট দু'একটি মুদিখানাসহ মনোহারী। দক্ষিণ দিকটি ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠেছে। দশ মিনিট অপেক্ষা করেই পরিবহনটি চলতে লাগল কখন চড়াই, কখন উৎরাই, কখনওবা বাঁকা পথে। অতিক্রম করে এলুম আগর, ফাকোট ও জাজোল সেই সঙ্গে ১৮ মাইল পথ। দক্ষিণে সীমাহীন খাড়াই—বামে গভীর খাদ। আঁকা-বাঁকা উঁচু-নীচু পাহাড়ী পথ। পাহাড়ের বুকে ঘন শালবন। সম্মুখে উপলমুখরা বিক্ষুব্ধ নদী। আরও ৫ মাইল পথ অতিক্রম করে পৌঁছে গেলুম নাগ্নি। ক্ষুদ্র একটি পার্বত্য জনপদ। বাসটি চলেছে কখন চড়াই, কখন উৎরাই পথে। চলার সেই অসম-ছন্দে অনেকেই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় চলে

পড়েছেন একে অপরের গায়ে। এই চক্রাকার গতির ফলে একমাত্র মহিলা যাত্রী শ্রীমতী শান্তি বসুমল্লিক ও পুরুষ যাত্রী শ্রীপাঁচুগোপাল পাল বমি করতে শুরু করে দিলেন। নাগ্‌নি অতিক্রম করে বাসখানি ক্রমেই চড়াই পথে উঠছে। গাছপালা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে। সম্মুখে, পশ্চাতে, দূরে, কাছে সর্বত্রই পাহাড়। দূরের পাহাড়গুলি ধোঁয়াটে—পর্বতের দৃশ্য দূর হতে এইরূপই দেখায়। পৌঁছে গেলুম ৭৫৩০´ ফুটের মাথায় ধরাসু পথের উচ্চতম স্থান চম্বা উপত্যকায় বেলা ৯-৪৫ মিনিটে। ঋষিকেশ থেকে এসে গেছি ৪০ মাইল পথ। বাস হতে নেমে পড়লুম কয়েক মিনিটের জন্য। এই পার্বত্য শহরটিকে চাক্ষুষ দেখে নিতে। জনসংখ্যা মন্দ নয়—একটি ব্যবসা কেন্দ্র। সহসা রৌদ্রের দীপ্তিতে ঝলমল করে উঠল উত্তরে তুষার-ধবল গিরিশৃঙ্গগুলি। ঐ শৃঙ্গগুলির অন্তরালেই লুকিয়ে আছে কেদারনাথ, নীলকণ্ঠ, শতোপন্থ ও গোমুখ প্রভৃতি। আঁকা-বাঁকা পার্বত্য পথে বাসখানি চলার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল তুষার-মৌলির সেই অপূর্ব শুভ্রতা।

॥ টিহরি ॥

বেলা ৯টায় চম্বা হতে বাসখানি চলতে শুরু করল টিহরি অভিমুখে—১২ মাইল পথ। নামছি ৫০০০´ ফুট নীচে। মোটরচালক ষ্টীয়ারিং ধরে বসে। ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে ঘুরপাক খেয়ে যেমন উঠে এসেছে বাসখানি তেমনি নামছে চক্রাকারে, সর্পিল গতিতে, ব্রেক টিপে টিপে বাঁকের মুখ অতিক্রম করে। পথের একপাশে গভীর খাদ। ক্রমে সমতলের দিকে এগিয়ে চলেছে বাসখানি। দু'পাশে সবুজ ক্ষেত। পাহাড় চলে গেছে দৃষ্টির বাইরে। সমতলভূমি গিয়ে মিশেছে পাহাড়ের সাথে। শহরের কিছু পূর্বেই পাথরে পাথরে মাতামাতি করে দুরন্ত প্রবাহে বয়ে চলেছে ভাগীরথী উত্তর থেকে দক্ষিণে। চারিদিকে নিস্তব্ধ গিরিরাজি, তার মাঝখানে সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড বিদীর্ণ

করে প্রাণবন্যায় উচ্ছ্বসিত ভাগীরথী। ৯-৪৫ মিনিটে শহরের বাহিরে এসে বাসখানি থেমে গেল নরেন্দ্রনগর হতে ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ২৫২৬´ ফুট উচ্চে ভাগীরথী ও ভীলগঙ্গার সঙ্গমস্থলে শহরটি--গঙ্গার তীর ধরে ঢালু উপত্যকার মত উঠে এসেছে। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে নেপালের গুর্খাগণ গাড়োয়াল অধিকার করে বিদ্রোহী সেনাপতির গুর্খা স্ত্রীর প্ররোচনায়। গাড়োয়ালরাজ ইংরেজদের সহায়তায় তাদের বিতাড়িত করেন। কিন্তু অর্ধেক গাড়োয়াল ছেড়ে দিতে হল ইংরাজদের। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে সুদর্শন শাহ রাজধানী স্থাপন করলেন টিহরিতে। নাগরিক সভ্যতা আসন বিস্তার করেছে এখানে। ব্যবসায়ীর গদি, মনোহারী, ডাক্তারখানা, কাপড়, চাদর, কম্বল কোনটিই দুষ্প্রাপ্য নয় টিহরিতে। বর্তমানে মহারাণী স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকল্পে স্থাপন করেছেন একটি মহিলা ডিগ্রী কলেজ। টিহরির শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ঘণ্টাঘর (Tower clock). মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে কীর্তিশাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দূর হতে দৃষ্টিগোচর হয় গম্বুজটি। ১৫ মিনিট অপেক্ষা করেই বেলা ১০টায় পরিবহনটি চলতে শুরু করল। বাম পার্শ্বে পাহাড় দক্ষিণে খাদের নীচে গঙ্গা। খাদের একেবারে পাশ ঘেঁষে চলেছে বাসখানি। উঁচু-নীচু আঁকা-বাঁকা পথে ১১ মাইল এসে 'ভলদিয়ানা' অতিক্রম করে চলে এলুম। পথ চলেছে যেন সর্পাকৃতি। প্রতি বাঁকে তার উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য। চলেছি যেন কোন অলক্ষ্য দেবলোকের সন্ধানে। কিছুক্ষণের মধ্যে আরও ৫ মাইল চড়াই পথে বাসখানি উঠে এ পথের দ্বিতীয় উচ্চতম স্থান ছাম-এ পেঁছিল। দৃশ্যাবলীর কোন পরিবর্তন নাই। এসে পেঁছিলুম একটি ক্ষুদ্র জনপদ নাগুনে। ছাম হতে দূরত্ব ৫ মাইল। টিহরি জেলার শেষ সীমা এই নাগুন্। বর্ণাঢ্য হরিৎ শোভায় শোভমান। চড়াই উত্তরণের পালা শেষ। এখন শুধু নীচে নামা। এখান হতে ধরাসু আর ৫ মাইল পথ।

॥ ধরাসু ॥

দক্ষিণবাহিনী ভাগীরথীর পথ ধরে চলেছে আমাদের পরিবহনটি। চলেছি উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে। লোকের বসতি চোখে পড়ছে স্বল্পই। পাহাড়ের দেওয়ালের গায়ে ছোট ছোট ঘর বাঁধা। সামান্য চাষবাস আর কম্বল বোনা এই নিয়েই এদের জীবনযাত্রা। টিহরি হতে ২৬ মাইল পথ অতিক্রম করে বেলা ১১-৩০ মিনিটে ধরাসু পেঁাছে গেল বাসখানি। ধরাসু ভাগীরথী তীরে একটি মনোরম স্থান। উচ্চতা ৩৪০০´ ফুট। ভাগীবথীর উপবেই কালী কম্বলীব ধরমশালা। এখান হতে একটি রাস্তা চড়াই পথে চলে গেছে গঙ্গাণী হয়ে যমুনোত্রী উপান্তে। দক্ষিণে অপর একটি পথ উত্তরকাশী হয়ে চলে গেছে গঙ্গোত্রী। ধরাসু হতে গঙ্গাণী ২৫ মাইল উত্তরকাশী ১৯। এক সময় এখান হতেই পদযাত্রা শুরু হতো যমুনোত্রী যাত্রীদের। অধুনা এখান হতে মসৌবী পর্যন্ত ৪০ মাইল পথ বাস চলাচল করছে। যন্ত্রযানের অনুগ্রহে হিমালয়ের দুঃসাধ্য পথগুলি এখন সুগম হয়ে উঠেছে। কিছুকাল পূর্বেও এসব পথ ছিল দুস্তর ও দুর্গম। দুঃসাধ্য পথ অতিক্রমের অধ্যবসায়, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, খাদ্যসামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা, উপযুক্ত আশ্রয়ের অভাব সবকিছু মিলে হিমালয়ের তীর্থগুলির যে ভয়াবহতা ছিল তা আজ আর নাই। ফলে তীর্থদর্শনের মাহাত্ম্যও পেয়েছে হ্রাস। এখন তা সৌখীন দেশভ্রমণে পরিণত। এখানকার বাস স্ট্যাণ্ডের রাস্তাটি বেশ প্রশস্ত। দেওয়ালের মত খাড়া পাহাড় উঠে গেছে। বাঁদিকে পথের দু'ধারে থরে থরে সজ্জিত দোকান—যাতায়াতের পথে প্রয়োজনীয় যা-কিছু সবই মেলে। প্রায় ১৫ মিনিট বাসখানি এখানে অপেক্ষা করল। সেই অবকাশে কেহ কেহ চা-পর্ব সমাপ্ত করে নিলেন। অনেকেই নেমে পড়েছেন গা-হাত-পায়ের জড়ত্ব কাটাতে। ম্যানেজার বিনয়বাবুর তাগিদে বাসে উঠে আপন আপন নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়লুম। এখানে রয়েছে ডাকঘর, ডাকবাংলো ও ধরমশালা। গঙ্গা ও মূল গঙ্গার সঙ্গমস্থল ধরাসু।

গঙ্গোত্রী মন্দিব ১০,১০০´

গঙ্গোত্রী মন্দিরে গঙ্গাদেবী

ভূজবাসা সাধু লালবিহারী দাসের আশ্রম

গোমুখের পথে একমাত্র আশ্রয়

পর্বতারোহিণী ৺সুজয়া গুহের স্মৃতিরক্ষাকল্পে নির্মীয়মাণ গৃহ

পশুপতিনাথ-মন্দির (কাঠমাণ্ডু)—৪,২০০´
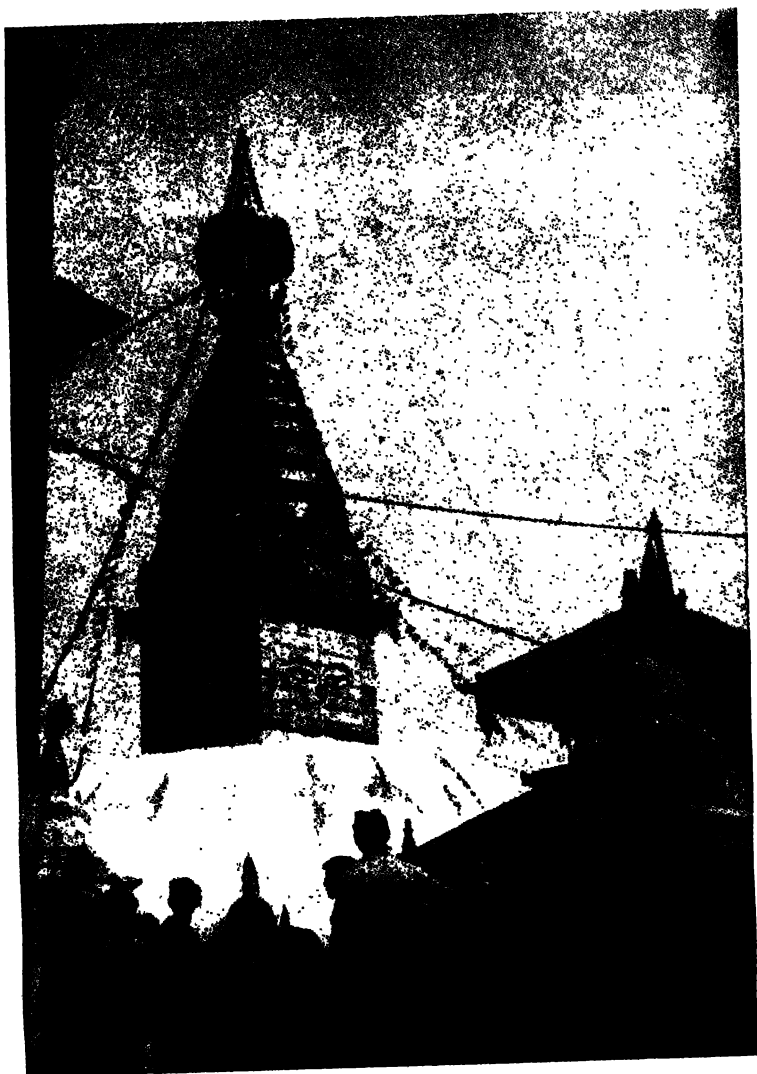
স্বয়ম্ভু চৈত্য (কাঠমাণ্ডু)

বোধনাথ স্তূপ (কাঠমাণ্ডু)
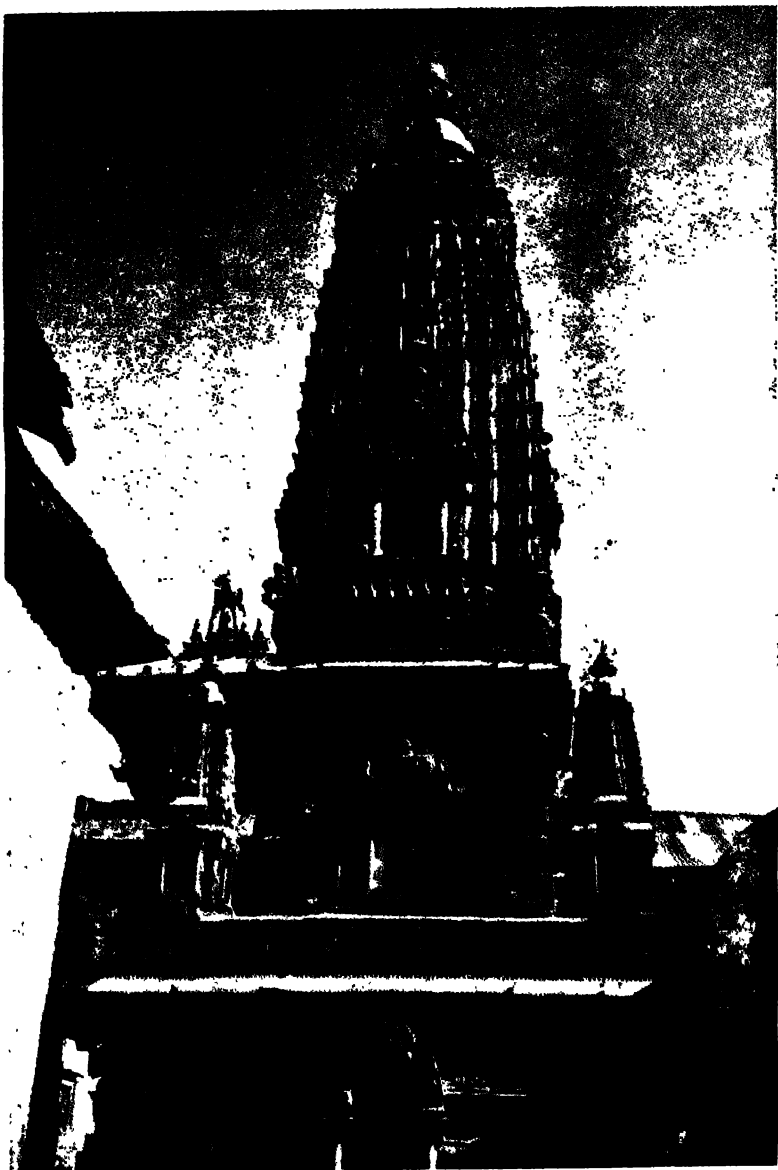
মহাবুদ্ধ মন্দির (ললিতপুর) কাঠমাণ্ডু হতে ৩ মাইল
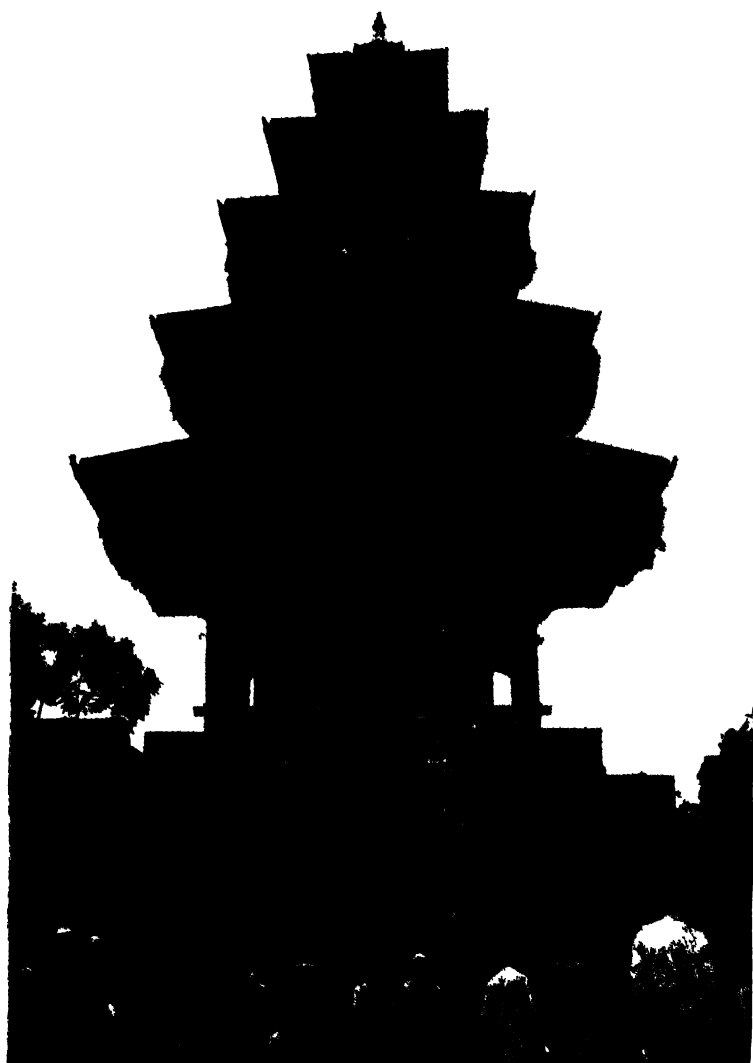
নয়াতোপোল মন্দির (ভক্তপুর) কাঠমাণ্ডু হতে ৯ মাইল

অমবনাথেব পথে

বাম হতে : (১) শ্রীশান্তিরঞ্জন দাস (২) লেখক (৩) স্বামী সদাত্মানন্দজী, সভাপতি, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ (৪) স্বামী কল্যাণানন্দ (গুরুভ্রাতা) (৫) শ্রীশীতেন্দ্রনাথ রায় (সহকর্মী)

এখান হতে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বাম পথে বাঁক নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গাণী অভিমুখে চলতে লাগল বাসখানি। সহযাত্রী মহিলারা কেউ কেউ গুন্ গুন্ স্বরে গান ধরেছেন পথের একঘেয়েমি কাটাতে। এ অঞ্চলে বিশেষ জলাভাব। ধবাসু থেকে ৪ মাইল পথ কল্যাণী। স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। কিছুটা চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে পাইনবনের মাঝ দিয়ে সুন্দর একটি রাস্তা কল্যাণী পর্যন্ত। প্রথমে সিকি মাইল চড়াই তারপর এক মাইল সমতল। এখান হতে গিঁউলা আরও ৫ মাইল—মাঝে মাঝে সবুজ ক্ষেত। পথিপার্শ্বে একটি জলকলের সামনে গিঁউলায় এসে থেমে গেল আমাদের বাসখানি বেলা ১২-১৫মিনিটে। এখানেই প্যাকেট ব্যবস্থায় মধ্যাহ্ন ভোজনের পর্ব শুরু হল লুচি, আলুব দম আর ঋষিকেশ হতে আনীত মিষ্টি সহযোগে। সীতেনবাবু, সরলবাবু ও আরও অনেকে বসে গেছেন চায়ের দোকানে। দু'একজন বয়স্কা ব্যতীত মহিলারাও সকলে নেমে পড়েছেন। আর খুসীর খেয়ালে দল বেঁধে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ১টা বাজতেই ড্রাইভারের হর্ণের শব্দে সকলে সচকিত হয়ে বাসে উঠে বসলুম। দু'পাশে পাইনঘেরা পথ প্রায় সমতল—মাঝে মাঝে পুষ্পশোভিত রডোডেনড্রন গাছ। যাত্রীদের আলাপে আর গুঞ্জনে বাসখানি মুখরিত। এরূপ একটি সংঘবদ্ধ যাত্রায় যে অনবদ্য আনন্দ আছে তা অনুভবের অপেক্ষা রাখে। ইতিমধ্যে আরও ৫ মাইল পথ সিলকিয়ারী অতিক্রম করে বাসখানি চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে পড়ল। ক্রমাগত চড়াই-উৎরাই করে যন্ত্রযানটি এখন তৃষ্ণার্ত ও পরিশ্রান্ত। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল পানের প্রয়োজন। অথচ তীব্র জলাভাব এখানে। নিকটে কোন ঝরণা নাই। ২০০´ ফুট নীচে হতে মোটর-চালকের এ্যাসিষ্টেণ্ট জল নিয়ে এল যন্ত্রযানটির তৃষ্ণা মেটাতে। এই অবকাশে সকল যাত্রীই বাস হতে অবতরণ করে পাইনবনের মাঝে বিশ্রাম নিতে লাগলেন। পাইন পাতার মনমাতানো গন্ধে বাতাস আকুল হয়ে রয়েছে। অনেকেই সময় অতিবাহিত করছেন গল্পে আর

গুঞ্জনে। সম্মুখে একটি পর্বতচূড়া। ধীরে ধীরে সে চূড়া আরও মাথা তুলে উঠেছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পর বাসখানি চলতে শুরু করে ছ'মাইল চড়াই উত্তরণের পর রাড়িরধার পৌছে পুনরায় তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ল।

এই দীর্ঘ চলার পথে দেখেছি যেসব পাহাড়ী মানুষগুলিকে তাদের কথা ভাবছি আর মনে হচ্ছেঃ সমতলের অধিবাসী আমরা কতই না বিভিন্ন সংস্কারে আচ্ছন্ন সমস্যাপীড়িত মন আমাদের। কিন্তু এ পথে নেই সমস্যার জটিলতা, এখানে দিনযাপনের প্রাণধারণের প্রশ্ন ছাড়া অন্য কোন প্রশ্ন নাই। অশান্ত, উদ্বেলিত জীবনের সংকট-সংকুল ভাবনায় হিমালয়বাসীর মন বিক্ষিপ্ত ও বিপর্যস্ত নয়। আরও ছ'মাইল পথ ডিণ্ডিলগাঁও অতিক্রম করে হাঁপাতে হাঁপাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যন্ত্রযানটি পৌঁছে গেল ৪ মাইল দূরত্বের ব্যবধানে গঙ্গাণী—বেলা চারটায়।

॥ গঙ্গাণী ॥

সকাল ছ'টায় ঋষিকেশ হতে প্রথম গেটের বাস ধরে ১০১ মাইল পথ অতিক্রম করে পৌছে গেলুম গঙ্গাণী বেলা চারটায়। বাস স্ট্যাণ্ড হতে প্রায় ৩০০´ ফুট উৎরাই নেমে ত্রস্তপদে কালী কমলীর ধরমশালায় পৌছলুম কুলির পিঠে হোল্ডল্ দিয়ে আর নিজের হাতে ব্যাগ, ছাতা, ফ্লাস্ক ও কেদারবদরী যাত্রাকালে তিন বৎসর পূর্বে ক্রীত চড়াই-উৎরাই-এর স্পাইক দেওয়া লাঠিটি নিয়ে। ৪৮০০´ ফুট উচ্চেও গ্রীষ্মের উষ্ণতা হেতু অস্বস্তির জন্য প্রথম দৃষ্টিতে ভাল লাগেনি গঙ্গাণী। অবশ্য সন্ধ্যাগমের সঙ্গে এ ধারণা পরিবর্তিত হয়েছিল কিছুটা। গঙ্গাণী একটি অপ্রশস্ত উপত্যকা। চতুর্দিকে সবুজ ক্ষেত। মুদিখানা, মনোহারী, মিঠাই প্রভৃতির কিছু কিছু দোকান-পসার এই নিয়ে গঙ্গাণী। এখানে গঙ্গানয়ন নামে একটি কুণ্ড আছে, তাই বোধ হয় স্থানটির নাম গঙ্গাণী। ধরমশালায় ওঠা-নামার পথটি স্মরণ করিয়ে

দেয় কেদার পথের রামওয়াড়া ধরমশালার কথা। এখানেই আমাদের রাত্রিবাস। সীতেনবাবু, সরলবাবু ও পিল্লাই সহ আমরা চারজন অকৃতদার একটি নির্দিষ্ট কামরার অধিকারী হওয়ায় বেশ স্বচ্ছন্দেই কাটিয়েছি এখানে। আমাদের সম্মুখস্থ বৃহৎ বারান্দাটি পুরোপুরি মহিলাযাত্রীদের অধিকারে—পুরুষদের মধ্যে কেবল শ্রীকাশীনাথ মিত্র ও পুলক কুণ্ডু ছিল তাঁদের তত্ত্বাবধায়ক। ধরমশালা হতে অন্ততঃ ২০০´ ফুট নীচে যমুনা। সত্বর মালপত্র গুছিয়ে আমরা চারজনে বেরিয়ে পড়লুম স্নানের জন্য যমুনা অভিমুখে। উপল-ব্যথিতা, ক্ষীণ-কায়া, স্বচ্ছ-সলিলা যমুনা কুল্ কুল্ শব্দে বয়ে চলেছে। জানিনা কোন্ রাধিকার কুল নাশ করতে। বৃন্দাবনের যমুনার চেয়ে একটু উন্নততর সংস্করণ। এ পথে যমুনাকে এই প্রথম দর্শন-স্পর্শন। কোন্ স্মরণাতীত কাল হতে এই যমুনা কত বিরহ-মিলনের সাক্ষী—কত হোরিখেলার স্বাক্ষর এর স্বচ্ছ বুকে। তাইতো তার আজকের এই রূপ দেখে বলতে ইচ্ছে করে ঃ

"যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনে
প্রবাহিনী
(যার) রূপের হাটে বিশাল তটে বিকাইত
নীলকান্তমণি।"

আবার এই স্বচ্ছ-সলিলা যমুনা তীরেই গড়ে উঠেছে অপরূপ শিল্প-শোভা, প্রেমনিষ্ঠার অক্ষয় মর্মর স্মৃতি। কবিকণ্ঠে যার অকুণ্ঠ প্রশস্তি ঃ

"শুধু থাক্ এক বিন্দু
নয়নের জল
কালের কপোলতলে
শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।"

এ হেন কুলঘাতিনী, স্মৃতিচারিণী যমুনার হিমশীতল জলে স্নান সেরে আঁকা-বাঁকা সংকীর্ণ পথে উঠে এলুম ধরমশালায়।

ইতিমধ্যে প্রায় সকলেই হোল্ডল্ খুলে বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত। আমরাও হোল্ডল্‌গুলি খোলার জন্য উদ্যোগী হলুম। টুরিষ্ট কোচের উভয় কামরার যাত্রীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা শুরু হল এখান হতেই স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে। কারণ, এরপর পরস্পর পরস্পরের সাথী হতে হবে পদযাত্রায়। দূরকে করতে হবে নিকট আত্মীয়। পথের সুখ-দুঃখে হতে হবে একে অপরের সমব্যথী।

অন্য কামরার সহযাত্রী শ্রীমতী রমা ঘোষ ওরফে রমাদি মজলিসী মহিলা। লাল পাড় গরদের শাড়ী আর গলায় একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা পরে ইতিমধ্যে পানের বাটা খুলে বসে গেছেন গল্প-গুজবে, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আর মাঝে মাঝে পান সাজছেন আগামী দিনের সঞ্চয় পূর্ণ রাখতে। বুদ্ধিমতী মহিলা, তাঁদেরই কামরার দু'জন পুরুষ-সহযাত্রী শ্রীকাশীনাথ মিত্র ও পুলক কুণ্ডুকে রেখেছেন তাঁর পাশে পাশে ভ্রাতৃস্নেহে আবদ্ধ করে দুর্গম যাত্রাপথে কাজকর্মে সাহায্যের জন্য এবং তাদের উপদেশ দিয়ে বলছেন: "দেখ, রমাদি যখন বলেছ তখন কাজকর্মে কিছু সাহায্য করতে হবে বৈ কি?" এ কথা বলেই শ্রীপুলক কুণ্ডুকে গঙ্গাণী বাজার হতে কয়েকটি মোমবাতি আনতে নির্দেশ দিলেন। পাশের কামরার বাসিন্দা হিসাবে বিশ্রামের অবকাশে এসব বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। আলাপ-আলোচনায় রাত্রি হয়ে গেল। ৯টার মধ্যে নৈশভোজন সমাপ্ত করে সারাদিনের বাসযাত্রাজনিত ক্লান্তিতে বিছানার আশ্রয় নিলুম সকলেই। গঙ্গাণীতে শীতের প্রকোপ কিছুই ভোগ করতে হয়নি। নিদ্রার ব্যাঘাতও কিছু ঘটেনি। এখান হতেই শুরু হল তল্পি খোলা আর তল্পি গোটানর প্রাণান্তকর পরিশ্রম।

॥ কুৎনৌর ॥

১১ই মে প্রাতঃকালীন চা-পর্ব শেষ করে ৬-৩০ মিনিট মধ্যে তল্পি গুটিয়ে প্রায় ৩০০´ ফুট চড়াই ভেঙে হাতের মালগুলি নিয়ে ধীরে ধীরে

সকলে যাত্রা করলুম বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে। আমার হাতের মালের ওজন আরও ৫ কে. জি. বেড়েছে। উত্তরকাশীর সন্ন্যাসীদের পঠন-পাঠনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ কর্তৃক প্রদত্ত স্বামী অভেদানন্দজীর "Complete Works"গুলি অন্যতম। স্বহস্তে এই পুস্তকগুলি প্রথম বহন করছি আর ভাবছি এতগুলি মালসহ চড়াই উত্তরণ সম্ভব হবে কি? এমন সময় বাস স্ট্যাণ্ড হতে প্রত্যাবর্তন পথে একজন কুলি "Complete Works"গুলি হাতে নিয়ে বাসে পেঁৗছে দিল। মনটা খুসীতে ভরে উঠল এই ভেবে যে, এমনি করেই বুঝি জীবন্মুক্ত আচার্যেরা স্বেচ্ছায় শিষ্যের জীবনের গুরুভার লাঘব করে থাকেন। বাস স্ট্যাণ্ডে পেঁৗছে উঠে বসলুম আপন আপন নির্দিষ্ট আসনে। বাসখানি চলতে শুরু করল কুৎনৌর অভিমুখে। সমতল—কিন্তু পথ বন্ধুর। পাশেই ৫০০০´ ফুট গভীর খাদ। তারই গা ঘেঁষে চলেছে বাসখানি। চাকার পরিধির বাইরে উদ্বৃত্ত স্থান নাই বললেই চলে। কোনক্রমে নির্দিষ্ট কক্ষপথ হতে চাকাটি বিচ্যুত হলে যে কি অবস্থা ঘটবে সে কথা চিন্তা না করাই ভাল। পথে "খারাবি" অতিক্রম করে বাসখানি এসে থামল কুৎনৌরে ৭-১৫ মিনিটে। গঙ্গাণী হতে কুৎনৌর ৫ মাইল পথ। এখানেই বাসচলাচলের প্রান্তসীমা (Terminus)। বিভিন্ন স্থানে যাত্রার জন্য বহু বাস এখানে অপেক্ষা করছে। গঙ্গাণীর গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে কুৎনৌর হয়ে উঠেছে কর্মচঞ্চল। মুদিখানা, পান, বিড়ি, খাবারের দোকান প্রভৃতিতে স্থানটি হয়ে উঠেছে বেশ জমজমাট। প্রাকৃতিক পরিবেশে নদী যেমন এক কুল ভাঙে অন্য কুল গড়ে। পথের পরিবেশও তেমনি একটি স্থানকে অপ্রয়োজনীয় করে অপর একটিকে করে তোলে প্রয়োজনীয়।

মোটর রাস্তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন কালের পদযাত্রার চটিগুলি এখন বিলুপ্ত হয়ে তার স্থলে উদ্ভব হয়েছে অনেক নূতন ধরমশালা ও আধুনিক চটি। তেমনি কুৎনৌর পর্যন্ত বাসচলাচল শুরু হওয়ায়

গঙ্গাণী তার গুরুত্ব হারিয়ে কুৎনৌর হয়ে উঠেছে গরিষ্ঠ। আমাদের প্রাতরাশ ব্যবস্থা শেষ হল। এখানেই কুলির পিঠের মালগুলি ওজন করা এবং ডাণ্ডী ও ঘোডার যাত্রীদের ডাণ্ডী ও ঘোড়া ভাড়ার ব্যবস্থা করার রীতি। সেইমত সব স্থির হল। যমুনোত্রী পর্যন্ত যাতায়াত কুলি ভাড়া ১'৫০ পঃ কে. জি.। ঘোড়া যাতায়াত ৭৫৲ টাকা এবং ডাণ্ডী ২৫০৲ টাকা। যতদূব স্মরণে আছে আমাদের টুরিষ্ট কোচেব ত্রেত্রিশজন যাত্রীর মধ্যে চারজন ছিলেন ডাণ্ডীব এবং ছয়জন ছিলেন ঘোড়ার যাত্রী। অত্যধিক মূল্যের বিনিময়ে ঋষিকেশ হতে ডাণ্ডী ও ঘোড়ার ব্যবস্থা ছাড়া যমুনোত্রী যাতায়াতেব উপায় নাই এই ভুল তথ্যটি কুণ্ডু স্পেশ্যাল কর্তৃপক্ষ ক্রমাগত প্রচার করার ফলে এ পথেব প্রায় সকল যাত্রীই "পয়দলে" যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন। প্রত্যাবর্তন পথে উত্তরকাশী নিয়ে যাবার জন্য কুণ্ডু স্পেশ্যালের পবিচিত একটি দোকানে স্বামী অভেদানন্দের "Complete Works"গুলি রাখার ব্যবস্থা করলেন ম্যানেজার বিনয়বাবু। যমুনোত্রী যাতায়াতের পথে হাতের মালগুলি বহনেব জন্য সীতেনবাবু, সবলবাবু সহ আমরা তিনজনে সাথে সাথে যাবার জন্য একজন কুলি ভাড়া করলুম ২০৲ টাকা দিয়ে।

দুই

॥ সানাচটি ॥

১১ই মে কুৎনৌর হতে বেলা ৮-৪৫ মিনিটে “পয়দলে” রওনা হয়ে গেলুম কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্মচারী সহ তেত্রিশজন যাত্রী সানাচটি অভিমুখে। ডাণ্ডী, অশ্বারোহী যাত্রী ও মহিলারা বেরিয়ে পড়লেন অগ্রস্থচী বিদায় নিয়ে। ন’জন মহিলা পদযাত্রীর মধ্যে সাতজনেই ছিলেন শালোয়ার-পাঞ্জাবী ও রকমারি সোয়েটারে সজ্জিতা। কারো মাথায় কাশ্মীরী ছাঁদে বাঁধা রঙিন রুমাল। শ্রীমতী শৈলবালা ব্যানার্জী ও ইন্দুবালা সরকার এই দুইজন বিধবা মহিলা ছিলেন বাঙালী পোষাকে। শালোয়ার-পাঞ্জাবীতে সজ্জিতা শ্রীডালিয়া মল্লিক, শ্রীমতী দূর্বা ব্যানার্জী, পুষ্প ব্যানার্জী ও আরতি বসু মল্লিককে বাঙালী মহিলা বলে চেনাই ছিল দুষ্কর। স্পাইক লাগানো লাঠি হাতে সকলেই ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে চলেছি। কুৎনৌর সীমান্তে একটি কাঠের সেতু পেরিয়ে সামনেই চড়াই। কিছুক্ষণ চড়াই অতিক্রম কবে প্রায় সমতল পথ ১ মাইল অগ্রসর হয়ে কালী কমলীর ধরমশালার পাশ দিয়ে যমুনা চটি অতিক্রম করে চলে এলুম। স্থানটি বদরীনারায়ণের পথে পাণ্ডুকেশ্বরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যমুনার দৃশ্যও মনোরম— চতুর্দিকে শ্যামল পাদপশোভা অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত, লোকালয়সমৃদ্ধ। যমুনা চটির পূর্বেই একটি সেতু পার হয়ে ১ মাইল পথ বেশ চড়াই তারপর আরও ১ মাইল চড়াই। পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই-উৎরাই করতে হচ্ছে। এই পথটি অতিক্রম করেই সাক্ষাৎ হল টুরিষ্ট কোচের অপর কামরার যাত্রী শ্রীমতী আরতি সরকারের সঙ্গে। সাথে চলেছেন চড়াই-উৎরাই-এর সাহায্যার্থে সহযাত্রী শ্রীকাশীনাথ মিত্র। চলার পথে তাঁদের সাহস দিয়ে এগিয়ে পড়লুম। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৬০০০´ ফুট উচ্চতা আর যমুনা চটি হতে ২ মাইল পথ চলেছি ওয়াজিরি অভিমুখে। মাঝে পাহাড়ের

গায়ে ঝুরো পাথর সাজান একটি গড়ানে পথ— দৈর্ঘ স্বল্পই। সামান্য আঘাতেই প্রস্তরগুলি গড়িয়ে পড়ছে নীচের দিকে। বেশ সতর্কতার সহিত উত্তীর্ণ না হলে বিপদ অনিবার্য। সামনেই শ্রীমতী মিতা দত্ত, অশ্বারোহী যাত্রী, সলিসিটর শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের সহধর্মিনী। দুর্গমতার জন্য এ পথটুকু সকলকেই পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হচ্ছে। এ পথে চলার অনভিজ্ঞতা হেতু শ্রীমতী দত্ত একখানি বৃহৎ প্রস্তরে পদক্ষেপ করে অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে সেটি নীচের দিকে নামতে শুরু করল। পশ্চাতের যাত্রী হিসাবে অতি সন্তর্পণে সেটি অতিক্রমের চেষ্টা করা সত্ত্বেও প্রস্তরখণ্ডগুলি ক্রমেই নীচের দিকে গড়াতে লাগল। পর পর সজ্জিত সকল প্রস্তরগুলি ক্রমেই গড়াচ্ছে— যেন সব কিছুই গড়িয়ে পড়ার পালা শুরু হল। সেই সঙ্গে আমিও নীচের দিকে নামতে শুরু করেছি। কোন কিছু আঁকড়ে ধরার সুযোগও সেখানে নাই। সামনেই ছিল শ্রীমতী দত্তের সহিস। হাত ধরে তুলে দুর্গম পথটি পাব করে দিয়ে বিপন্মুক্ত করল। ভয় যে কেমন করে মানুষের সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে সৎ চিন্তার অবকাশটুকুও ভুলিয়ে দেয় তা প্রত্যক্ষ অনুভব করলুম এই সংকট মুহূর্তে যমুনা ও ওয়াজিরি চটির মধ্যবর্তী একটি দুর্গম পথে। এ পথে চলার শক্তিই মানুষের পরিচয়। সকলেই চলেছেন যাঁর যেমন শক্তি। বিশেষ করে সবার শেষে এক চটি হতে রওনা হয়ে সবার আগে অপর চটিতে পৌঁছতে সক্ষম যে কয়টি মানুষ—ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের দল-ভুক্ত হওয়ায় উভয় কামরার যাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যাচ্ছে পথিমধ্যে কোন-না-কোন সময়ে। কিছুদূর অগ্রসর হয়েই শুরু হল পাইন গাছের সারি, তারই মাঝে সরু আঁকা-বাঁকা পথে চলেছি সারিবদ্ধ একদল স্ত্রী-পুরুষ। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা হয়ে গেল শ্রীমতী কাজল চৌধুরী ও আরতি বসু মল্লিকের সাথে। উভয়েই উচ্চশিক্ষিতা—সঙ্গে পুলক কুণ্ডু। একটি মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তোলায় সকলেই ব্যস্ত। অতিক্রম করে চলে এলুম তাদের। এইভাবে চলতে চলতে

প্রবেশ পথে যমুনা নদীর উপর একটি সেতু পার হয়ে পৌঁছে গেলুম সানাচটি বেলা ১২-১৫ মিনিটে কুৎনৌর হতে ৬ মাইল পথ অতিক্রম করে। সানার উচ্চতা ৬০০০´ ফুট। মূল ধরমশালার পাশেই দু'তিন মিনিটের মধ্যেই একটি নিভৃত পরিবেশে একখানি ঘরে আমাদের কয়-জনের বাসের ব্যবস্থা করেছিলেন কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্তৃপক্ষ। কেদারের পথে যেমন মাল আসে কুলির পিঠে এ পথেও সেই ব্যবস্থা। ফলে যাত্রীদের অপেক্ষা করতে হয় বিশ্রামের জন্য যতক্ষণ না মাল-গুলি এসে পৌঁছায় নির্দিষ্ট ধরমশালায়। সীতেনবাবু, সরলবাবু ও পিল্লাই এসে গেলেন বেলা ১টার মধ্যেই, সাথের কুলি রামপাল সিংকে সঙ্গে নিয়ে। তার হাতেই স্নানের উপকরণের ব্যাগটি। সে পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে গেলুম স্নানের জন্য। যমুনার তুহিন-শীতল স্বচ্ছ জলে স্নান করে স্নিগ্ধ হলুম। বেলা ২টার মধ্যে মধ্যাহ্ন ভোজনের পালা শেষ হল। দীর্ঘ ৬ মাইল পথ চড়াই-উৎরাই-এর পর শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে বিশ্রামের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলুম সকলেই। একে একে হোল্ডল্ খুলে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে শুরু করে দিলুম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমেজী শীতের প্রকোপ দেখা দিল। সানাচটির শীত একটি সোয়েটারেই কাটে। রাত্রেও শীতের প্রকোপ তেমন কিছু নয়। নিরিবিলি ঘরে রাত্রিযাপনের ফলে অসুবিধাও কিছু হয় নি।

॥ ফুলচটি ॥

প্রাতঃকালীন চা-পর্ব শেষ করে ১২ই মে সকাল ৬-১৫ মিনিটে সানা-চটি হতে রওনা হয়ে প্রথমেই বেশ কিছুটা চড়াই ভেঙে উৎরাই পথে অবতরণ করে কাঠের সেতু পার হয়ে যমুনার অপর পারে চলে এলুম। কিছুটা চলার পর আর একটি সেতু। তারপর শুরু হল বামপার্শ্বে ঘনসন্নিবিষ্ট দেওদারের সারি। ছায়াঘেরা পথ। দক্ষিণপার্শ্বে, উঁচু পাহাড়। নানা জাতের পাহাড়ী ফুলের গাছ। মাঝে মাঝে রডোডেন্-ড্রন্ আর লতানে শ্বেত গোলাপ। পাহাড়ী মেয়েরা বনান্তরালে ডাল-

পালা সংগ্রহ করছে আর গুন্ গুন্ সুরে দেশওয়ালী ভাষায় গান ধরেছে। "দেশিল বআনা সবজন মিঠ্ঠা"। নিজ নিজ দেশের ভাষা সকলের কাছেই মধুর। পদযাত্রীদের পক্ষে পথটি বেশ আরামপ্রদ। এই পথটি স্মবণ করিয়ে দেয় পাহালগাম থেকে চন্দনবাড়ীর ঘন সন্নিবিষ্ট পাইনঘেরা বনপথেব কথা। একটিতে ছায়াঘন দেওদার অপবটিতে পাইন। একটির পাশে পাশে চলেছে যমুনা অপরটির পাশে লীডাব। এটি অতিক্রম কবেই রাণা গ্রাম। সানা থেকে রাণা তু' মাইল—যাত্রাপথ আরামপ্রদ সমতল। এখানে একটি জুনিয়াব হাইস্কুল ও ধরমশালা আছে। আরও ইমারৎ নির্মাণ হচ্ছে। রাণা ক্রমেই বর্ধিষ্ণু হয়ে উঠছে। উচ্চতা ৬৯০০´ ফুট। ৭-৩৩ মিনিটে বাণা পেরিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হতেই বৌদ্রঝালরে ঝলমল ক'রে উঠল বন্দরপুঁছেব তুষাবমণ্ডিত শীর্ষদেশ—যা চিরকালই থাকে তুষাবাচ্ছন্ন—সেখান হতেই যমুনার উৎপত্তি। মন সচকিত হয়ে উঠল। দেখলুম দেবাদিদেবেব ক্ষণিক রূপ। এ রূপ যতবাব দেখা যায় ততবারই মনে হয় "প্রথম দর্শন"। দ্বিতীয় দর্শনের জন্য জেগে থাকে একটি আকুতি। গঙ্গাণী হতে সাথে সাথে চলেছে যমুনা কখন দৃশ্য কখন বা অদৃশ্য হয়ে পর্বত ও বনভূমির অন্তরালে। সীতেনবাবু, পিল্লাই ও সরলবাবু আসছেন সাথের কুলি রামপাল সিংকে সঙ্গে নিয়ে ধীরে, মন্থবে—চটিতে চটিতে চা-বিস্কুটের সদ্ব্যবহার করে। কিছুদূব অগ্রসর হয়েই দেখি সামনে চলেছে একটি যাযাবব-পরিবাব, সঙ্গে একদল জীবজন্তু। ঋতুবদলের সঙ্গে সঙ্গে ওরাও করে স্থান বদল। এক জায়গার বাস উঠিয়ে অন্য জায়গায় বাসা বাঁধে। চেয়ে দেখি আমাদের কামরার ডালিয়া তাদের দলে ভিড়ে মেয়েদের সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে গল্প-গুজবে মশ্গুল হয়ে চলেছে অন্য পথে। আমায় দেখেই সঙ্গ নিল। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সংকীর্ণ পায়ে-চলা পথ। একটা বাঁকের মুখে যমুনা। কাঠের সেতু পেরিয়ে ওপারে হনুমান-চটি। রাণা থেকে তু'মাইল পথ। উচ্চতা ৭০০০´ ফুট। বেলা

৯-১৫ মিনিটে পেঁ ৗছে গেলুম হনুমানগঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল হনুমান-চটি। সাক্ষাৎ হল কয়েকজন পর্বতাভিযানপ্রয়াসী যুবকের সঙ্গে। তারা যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী ও গোমুখ হয়ে যাবে তপোবন। তপোবনের কথা বলতে স্বভাবতঃই মনে আসে হিমালয়ের সুন্দর সুন্দর ফুলের কথা, যা গাড়োয়াল ও গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর পর গোমুখের হিমবাহ অঞ্চলে প্রস্ফুটিত হয় বারো তেরো হাজার হতে শুরু করে ষোল সতেরো হাজার ফুট উচ্চে। তাদের কত সব নাম। প্রিমুলা, অ্যাসটার, ইন্‌লা, পলি-গোণাম, পোটেনটিলা, রুমেকস জেনসিয়ান, প্রুণাম, কারিয়ালিস্ ব্লুপপি, রডোডেনড্রন্ আবও হাজাবো বকমেব নাম যা জানা সম্ভব নয়। জুলাই-আগষ্ট মাসেই হিমালয়ে ফুলের সর্বাধিক বাহাব খোলে। অন্য আব কোন সময়ে এত বৈচিত্র্যময় ফুল এক সঙ্গে দেখা যায় না। তখন গাছে ফুল, ঘাসে ফুল, নদীর তীবে তীরে ফুল ফুটে থাকে। পাথবেব কোলে, পাহাড়ের ঢালে, এমন কি জলের মধ্যেও। এক কথায় হিমালয়ের সর্বত্র তখন ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়। মনে হয় পৃথিবীতে যত রং আর গন্ধ আছে, সবের সমাবেশ ঘটেছে গিরিরাজের অঙ্গনে। কিন্তু হিমালয়ের এত সব বিচিত্র ফুলের সমাবেশের মধ্যে যে ফুলটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ কবে তা'হল ব্রহ্মকমল।

দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ঢালু অংশে যেখানে শীতেব সময় খুব বেশী বরফ জমে, সে সমস্ত স্থানেই এই ফুলগাছ সবচেয়ে বেশী জন্মায়। মাটি থেকে তিন-চার হাত উঁচু এই ফুলগাছের ডাঁটিতে একটি করেই ফুল জন্মায়। ফিকে হলুদ রঙের এই ফুলগুলি আকারে এত বড় হয় যে, অনেক সময় তা দু'হাতের মুঠোতেও ধরা যায় না। ভারী মিষ্টি তার গন্ধ।

সাধারণতঃ ১২।১৩০০০´ হাজার ফুট উঁচু হতে শুরু করে ১৫।১৬০০০´ ফুটের মধ্যে ব্রহ্মকমল ফুল দেখা যায়। এর গাছের,পাতা অনেকটা আনারসের পাতার মত দেখতে। হিমেল হাওয়া, তুষারপাত ও তুষার-ঝঞ্ঝা যাতে ফুলের কোন ক্ষতি করতে না

পারে, সেজন্য এই গাছের পাতা ফুলটিকে সর্বদা পাপড়ির মত ঢেকে রাখে।

গাড়োয়াল-হিমালয়ে ব্রহ্মকমল দিয়ে পূজা করার একটা প্রাচীন রীতি প্রচলতি আছে এবং আজও চলছে। বিশেষ করে কেদারনাথ, বদরীনাথ ও গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী মন্দিরে আজও এই ফুল দিয়ে নিয়মিত পূজা করা হয়। প্রসাদের সঙ্গে যার অংশবিশেষ পৌঁছে যায় যাত্রীদেরও হাতে। ডালিয়া উৎসুক নেত্রে কয়েকটি প্রশ্নে জেনে নিল তাদের যাত্রাপথের বিবরণ। নমস্কাবান্তে যুবকগুলি বিদায় নিয়ে চলে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার চলতে শুরু করলুম। ডালিয়া চলেছে আগে আগে লাঠি হাতে। উঁচু-পুরু চেহারার ওপরে সালোয়ার-পাঞ্জাবী আর ফুটফুটে রং-এর সঙ্গে কালো সোয়েটার ও মাথায় নীল সিল্কের রুমালে সজ্জিত হয়ে ওকে মানিয়েছিল চমৎকার। ভ্রম হচ্ছিল কাশ্মীরী মহিলা বলে। কিছুদূব অগ্রসর হয়েই শুরু হল দুর্গম বন্ধুর পথ আর দু'পাশে অসংখ্য আখরোটের গাছ। আখরোট বন শেষ হতেই দেখা হল লক্ষ্ণৌ হতে আগত শ্রীশৈলবালা ব্যানার্জীর সঙ্গে।

ডালিয়ার হিসাবমত আমাদের সামনে অবশিষ্ট মাত্র তিনজন মহিলা পদযাত্রী—শ্রীমতী দূর্বা ব্যানার্জী ও তাঁর ভগ্নিদ্বয়। ডালিয়ার ইচ্ছা এঁদের পশ্চাতে রেখে প্রথম মহিলা পদযাত্রী হিসাবে সে ফুলচটিতে প্রবেশের কৃতিত্ব অর্জন করে। সেইমত দ্রুতপদে চলতে শুরু করে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভগ্নিত্রয়কে পশ্চাতে রেখে চলে এলুম উভয়েই। হনুমানচটি হতে ৩ মাইল পথ ফুলচটি। বামপার্শ্বে সাথে সাথে চলেছে যমুনা। যতই উচ্চে আরোহণ করি ততই মুগ্ধ হই তার রূপ পরিবর্তনের মহিমা দেখে। এখন আর সে ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতী মাত্র নয়। তরঙ্গময়ী, যৌবনোচ্ছলা। শৈলবাহু পীড়নে খরস্রোতা ও চঞ্চলা। যেন কোন্ বল্লভ কান্তের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় উতলা। মধ্যপথে ৮০০০´ ফুটের মাথায় বানাস্চটি অতিক্রম করে চলে এলুম।

সাক্ষাৎ হল আমাদের কামরার কেশব মুখার্জি ও সুধীন চ্যাটার্জির সঙ্গে। আগে-পিছে চলেছেন দুটি বন্ধুতে। বেলা ১০-৩০ মিনিটে পেঁাছে গেলুম ফুলচটি। সাত মাইল পথ অতিক্রম করে হর্ষোৎফুল্ল ডালিয়া প্রথম মহিলা পদযাত্রী প্রবেশ করল চটিতে। পেঁাছে গেছেন ডাণ্ডী ও অশ্বারোহী যাত্রীদল। আর পেঁাছে গেছেন তিনচার-জন পুরুষ পদযাত্রী। ৮৫০০´ ফুট উচ্চ একটি পার্বত্য উপত্যকায় রমণীয় পরিবেশে ফুলচটি। এখানে 'জ্যোতি ভবনের' দ্বিতলের একটি সুবৃহৎ কক্ষে আমাদের দু'দিন বাসের ব্যবস্থা। গৃহখানির পশ্চাতে পীচ, আপেল, ন্যাসপাতি প্রভৃতি ফলের একটি সুরম্য উদ্যান। দ্বিতলের নীচে একটু চত্বর—সেখানে চা-বিস্কুট, পকৌরী প্রভৃতির দোকান। অনতিদূরেই জলের কল। ঝরণা হতে সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করে জলসরবরাহ হচ্ছে কয়েকটি কলে। সেখান হতে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে সারি সারি চারটি স্যানিটারী পায়খানা। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই শৌচে যাবার কোন অসুবিধা নেই। মোটকথা বসবাসের দিক হতে ফুলচটিতে কোন অভিযোগের সুযোগ ছিল না। এখানে পুরুষ ও মহিলাযাত্রীদের বাসস্থানের জন্য পৃথক ব্যবস্থার সুযোগ থাকায় একটি কামরায় সকল পুরুষযাত্রী ও অপেক্ষাকৃত কয়েকটি ছোট কামরায় মহিলাযাত্রীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফলে শ্রীকাশীনাথ মিত্র ও পুলক কুণ্ডুকে মহিলাযাত্রীদের তত্ত্বাবধায়কের পদ ত্যাগ করে পুরুষদের কামরায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে "যাযাবরের দৃষ্টিপাত"এর মিঃ খোশলার কথা। নয়া দিল্লীতে মেয়েরা আছেন অথচ খোশলা নেই এমন কোন সভা-সমিতি, পার্টি, পিক্‌নিক যেমন কেউ কল্পনা করতে পারতো না তেমনি আমাদের টুরিষ্ট কোচের মহিলারা আছেন অথচ তাঁদের চড়াই-উৎরাই পথে সহকারী হিসাবে, ধরমশালায় অবস্থানকালে তত্ত্বাবধায়করূপে কিংবা পথে বাসে চলাকালে মেয়েদের চা প্রভৃতি সরবরাহ ব্যাপারে পুলক ও কাশীনাথবাবু নাই—এ কথাও ছিল একরূপ অকল্পনীয়। ৮৫০০´

ফুট উচ্চে শীতের প্রকোপ মন্দ নয়। স্নানের কথা এককালে বিস্মৃত হয়ে বেগুনি, পাঁপড়ভাজা সহ গরম গরম খিচুড়ি পরম তৃপ্তিসহকারে উদরস্থ করে বিশ্রামের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। ইতিমধ্যে এসে গেল হোল্ডল্‌গুলি—এসে গেলেন সীতেনবাবু, সরলবাবু ও পিল্লাই। এখান হতেই প্রকৃতপক্ষে শীতবস্ত্রের ব্যবহার শুরু হল। মহিলারা অবশ্য সোয়েটার ইত্যাদির ব্যবহার কুৎনৌর হতেই শুরু করে দিয়েছেন। শীতের জন্য ততখানি নয়—সজ্জার পরিপাটির জন্য। পার্বত্য অঞ্চলে সন্ধ্যাগম হয় সমতল অপেক্ষা অন্ততঃ ১½ ঘণ্টা বিলম্বে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্বল্প শীতের আমেজে জ্যোতি ভবনের অঙ্গনচত্বরে চায়ের দোকানের চুল্লীর সম্মুখস্থ বেঞ্চে অগ্নির ঈষৎ উত্তাপে স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করছি। সলিসিটার শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এসে উপস্থিত হলেন—বয়স চল্লিশের কোঠায়। সময়াভাবে এ কয়দিন পরিচয়ের বিশেষ সুযোগ মেলেনি তাঁর সঙ্গে। এই অবকাশে পরস্পর পরিচয়ের পালা শুরু হল। কৃষ্টিবান্‌ মানুষদের ভাবের সামান্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে সূক্ষ্ম রুচিবোধটুকু হয় প্রতিফলিত পরস্পরের মানসপটে, ফলে সহজেই গড়ে ওঠে একটি প্রীতির সম্পর্ক। শ্রীদত্তের সঙ্গে সামান্য আলোচনাতেই গড়ে উঠল একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বিশেষ করে তিনি সাহিত্যরসিক ও ধর্মপ্রবণ মানুষ, এজন্য আলোচনার ভূমিকাও ছিল অনুকুল। টুরিষ্ট কোচের যাত্রী শ্রীপতাকীচরণ কুণ্ডুর সাথেও আলাপের সূত্র এখানেই। পরবর্তী কালে বহু অবসর মুহূর্ত যাপন করেছি তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়। স্বভাবসুলভ মধুর ব্যবহারের জন্য ভাল লেগেছিল তাঁকে। রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শীতের প্রকোপও বৃদ্ধি পেতে লাগল। ন'টার মধ্যে নৈশভোজন সমাপ্ত করে গায়ে একখানি র‍্যাগ জড়িয়ে বিছানার আশ্রয় নিলাম।

॥ যমুনোত্রী ॥

১৩ই মে চা পান শেষ করে ৬-৩০ মিনিট মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে নিলুম। আজ আর তল্পি গোটানর পরিশ্রম নাই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি। কয়েকজন ব্যতীত সকলেই রওনা হয়ে গেছেন যমুনোত্রী পথে। অবশিষ্ট মাত্র আমরা কয়জন—সীতেনবাবু, পিল্লাই ও সরল-বাবু। কবির ভাষায় মনে এল ঃ

আমি তোমার যাত্রীদলের
রব পিছে,
ঠাঁই দিও হে আমায় প্রভু
সবার নীচে।

সবার পিছেই বেরিয়ে পড়লুম—সবার নীচে ঠাঁই পাবার আশায়। পোষাকের রং বদলেছি আজ। অবশ্য মনের রং এখনও বদলায়নি। তবু ঐ রং বদলান পোষাকই আমার পছন্দ। শুধু এ জীবনে নয়—পরজীবনেও, তাইতো যখনই পাঠ করি ঐ রং বদলের মন্ত্র ঃ

"হে অগ্নি শরীরে শয়ান্! জ্ঞান প্রতিবন্ধ হরণকুশল লোহিতাক্ষ পুরুষ জাগরিত হও, হে অভীষ্টপূরণকারিন্ তত্ত্বজ্ঞান লাভের পথে আমার যত কিছু প্রতিবন্ধক সেই সকলের নাশ কর এবং চিত্তের সমগ্র সংস্কার সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হইয়া যাহাতে গুরুমুখে শ্রুত জ্ঞান আমার অন্তরে সম্যক্ উদিত হয় তাহা করিয়া দাও, আহুতি দ্বারা মলিনতা বিদূরিত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই।"

তখন দেহমনে ও শিরায় শিরায় অনুভব করি ঐ রং বদলান পোষাকের প্রতি তীব্র আকর্ষণ। পথ চলতে শুরু করেছি। অনতিদূরে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী পারুল মল্লিক—অশ্বপৃষ্ঠে রওনা হয়ে গেলেন। পথ তেমন দুর্গম নয়। অন্ততঃ খরসালী পর্যন্ত। চড়াই-উৎরাই সামান্যই। মাঝে মাঝে গ্রাম। গ্রামের আশেপাশে সবুজ ক্ষেত, কোথাওবা আখরোটের বাগান। গ্রাম থেকে পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা পশ্চাদনুসরণ

করছে "পয়সা পয়সা" বলে। কিছুদূর এসে ফিরে যাচ্ছে। সামনে আবার এক দল উপস্থিত হচ্ছে। ফুলচটি হতে ১½ মাইল পথ খরসালী বা বীফর্গাও। খরসালীতে যমুনোত্রীর পাণ্ডাদের বাস। খরসালীর এক মাইল পূর্বে যমুনার অপর পারে মার্কণ্ডেয় তীর্থ। খরসালী আর মার্কণ্ডেয় যমুনার দুই পারে প্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দেড় মাইল পথ চলে এসেছি। ঝুরো মাটির সঙ্গে কাঁকরের পথ। উচ্চতা ৮০০০´ ফুট। সামনেই ভৈরবঘাঁটি—ঘাঁটির পাদদেশে চায়ের দোকান। কারো কারো মতে ভৈরবঘাঁটির চড়াই অমরনাথ পথের পিশুঘাঁটির চেয়েও দুর্লজ্ঘ্য। এ বিষয়ে আমাদের কয়েকজনের মতভেদ আছে। তবে ভৈরবঘাঁটিব চড়াই উত্তরণও সহজসাধ্য নয়। তিন মাইল পথ টানা ২০০০´ ফুট খাড়াই। পাহাড়ের পাদদেশ কেটে আঁকা-বাঁকা পথ প্রস্তুত করা হয়েছে—পিশুঘাঁটির মত বড় বড় পাথরের ঢিবিযুক্ত সোজা খাড়াই নয়। এগিয়ে চলেছি। সাক্ষাৎ হল ৭৬ বৎসর বয়স্ক শ্রীগৌরীপ্রসন্ন ব্যানার্জীর সঙ্গে। টুরিষ্ট কোচের প্রবীণতম পদযাত্রী। খাড়া চড়াই ভাঙছি—কয়েক পা অগ্রসর হয়ে লজেন্স মুখে দিচ্ছি—আবার চলেছি। বিশ্রামের কোন আশ্রয় নেই—লাঠিতে ভর দিয়ে বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটছি। অতিক্রম করে এলুম শ্রীমতী কাজল চৌধুরীকে। হাত ধরে চড়াই ভাঙতে সাহায্য করছে পুলক কুণ্ডু। শ্রীমতী চৌধুরীর অবস্থা দৃষ্টে মনে হল তাঁর পা দু'খানি যেন দেহের ভার আর বইতে পারছে না। ক্রমাগত উপরের দিকে চলেছি। আর কতদূর! পথের যেন শেষ নাই। যমুনোত্রী পথে ভৈরবঘাঁটির চড়াই পিশুঘাঁটির পরই স্মরণযোগ্য। কোন সহযাত্রীর সাক্ষাৎ নাই। পশ্চাতে চেয়ে একবার মাত্র শ্রীপিল্লাই-এর সাক্ষাৎ মিলল তারপর সেই যে অদৃশ্য হল একেবারে যমুনোত্রীতে। সীতেনবাবু ও সরলবাবু আরও পশ্চাতে আসছেন। অদূরে দাঁড়িয়ে বন্দরপুঁছ—মস্তকে মেঘের আস্তরণ আর গাত্রে তুষার প্রলেপ দিয়ে হাতছানি দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছে। দিগন্তবিস্তৃত ঐ চিরতুষারের একাংশই দ্রবীভূত তুষার-

স্রাবরূপে অবতরণ করে পরিণত হচ্ছে উচ্ছ্বাসময়ী সুনীল জলধারায়। ভৈরবঘাঁটি অতিক্রম করে চলে এসেছি। এগিয়ে চলেছি যমুনোত্রীর দিকে আরও ১২ মাইল পথ। ধীরে ধীরে পথ নেমে গেছে নীচের দিকে—চড়াই নাই কিন্তু আঁকা-বাঁকা—সেই পথ ধরে চলেছি। চতুর্দিক নিস্তব্ধ—মাঝে মাঝে ঝির্‌ঝিরে হাওয়া বইছে—চলেছি যেন কোন্‌ অজানালোকে। এমনি করে ফুলচটি হতে ৬ মাইল পথ অতিক্রম করে পেঁৗছে গেলুম যমুনোত্রী বেলা ৯-৫০ মিনিটে।

ত্রিভুজাকৃতি, এক একরেরও কম অসমতল, প্রস্তরপূর্ণ একটি জায়গা। একাংশ কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে যাত্রীসমাগমে। গড়ে উঠেছে অস্থায়ী যাত্রীনিবাস। সেখানকার একটি দীর্ঘতম নিবাসে আমাদের সাময়িক বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছেন কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্তৃপক্ষ। ঋষিকেশে যতগুলি মানুষ সমবেত হয়েছিলুম তাঁদের সকলেই আজ এখানে উপস্থিত—কেউ ডাণ্ডী, কেউ ঘোড়া, কেউবা পয়দলে। আশে-পাশে গড়ে উঠেছে অনেকগুলি অস্থায়ী দোকান—কোনটিতে খাদ্যদ্রব্য, কোনটিতে পূজার সামগ্রী ইত্যাদি। সহযাত্রীরা কেউ বিশ্রাম নিচ্ছেন, কেউবা স্নান ও পূজাদির উদ্যোগে ব্যস্ত। আমাদের যাত্রীনিবাসটির বিপরীত দিকেও গড়ে উঠেছে নানা জাতের দোকান-পসার—তারই মাঝ-বরাবর চলে গেছে যে পথটি সেই পথেই ৩।৪ মিনিটের মধ্যে যমুনার সেতু পার হয়ে ওপার একটু চড়াই ভেঙে ৪।৫টি উষ্ণকুণ্ড। তার মধ্যে একটির জল স্নানোপযোগী। অপরগুলি এত উষ্ণ যে, অনেকেই সে জলে চাল বা আলু সিদ্ধ করে নিচ্ছেন কাপড়ে বেঁধে। আমাদের সহযাত্রী দূর্গা ব্যানার্জিরা তিন ভগ্নী মিলে চাল সিদ্ধ করে নিলেন উষ্ণকুণ্ডের জলে। স্মরণে এল দণ্ডকমণ্ডলুধারী এক তরুণ সন্ন্যাসীর কথা। বিরাশী বৎসর পূর্বে যিনি নগ্নপদে কপর্দকশূন্য অবস্থায় উত্তরকাশী হতে শ্বাপদসংকুল গভীর অরণ্যানীর মধ্য দিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন যমুনোত্রীতে এবং এই উষ্ণকুণ্ডের জলে সিদ্ধ চাল ভক্ষণ করে রাত্রিযাপন করেছিলেন যমুনোত্রীর পর্বতগুহায়।

সেদিনের সে দুর্গমতা আজ আর নাই। এখন এখানে জনসমাগম প্রচুর। পথক্লান্ত দেহটিকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিয়ে প্রস্তুত হতে লাগলুম স্নান ও পূজাদির জন্য। ইতিমধ্যে অধিকাংশ পুরুষ ও মহিলাযাত্রী সেতু পার হয়ে চলে গেছেন উষ্ণকুণ্ডে পূজার থালি হাতে। সীতেন-বাবু, পিল্লাই ও সবলবাবু আমরা শেষ দলের যাত্রী, পূজার সামগ্রী নিয়ে যমুনা পার হয়ে চলেছি স্নানের আশায়। কুণ্ডের বামপার্শ্বে অনতিবিস্তৃত একটি চত্বরে পূজোপকরণাদি ছড়িদারের কাছে গচ্ছিত রেখে চলে গেলুম উষ্ণকুণ্ডের দিকে। বদরীনারায়ণের মত এখানেও একই কুণ্ডে স্নান সেরে নিচ্ছেন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই ঘৃণা-লজ্জা-ভয় ত্যাগ করে। স্বস্তিবোধ করলুম উষ্ণকুণ্ডে স্নান সেরে, সেই সঙ্গে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহটিও হল ব্যথামুক্ত। অনেকের ধারণা উক্ত উষ্ণকুণ্ডগুলির অভাবে যমুনোত্রীতে শীতের প্রকোপ হতো আরও অধিক। এখান হতে ২।৩ মিনিটের মধ্যে সামান্য একটু উচ্চে পূজামণ্ডপ। দলে দলে নরনারী সেখানে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে পূজার আশায়। পূজামণ্ডপের তলদেশে প্রবাহিত প্রস্রবণগুলির জল এত উষ্ণ যে, মণ্ডপস্থ প্রস্তরচত্বরে উপবিষ্ট হয়েও পূজাকালে বেশ অস্বস্তি বোধ করতে হয়। যাই হোক, এঁদের মাঝে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পূজারীর সাহায্যে সমাপ্ত হল যমুনা পূজার প্রথম পর্ব। মূল মন্দিরটি পূজামণ্ডপের বামপার্শ্বে ২।৩ মিনিটের ব্যবধানে অবস্থিত। পূজান্তে পূজারী নির্দেশ দিলেন পূজার অবশিষ্টাংশ মন্দিরস্থ দেবীকে উৎসর্গ করে দিতে। সেইমত পূজার থালি হাতে মন্দির অভিমুখে যাত্রা করলুম। মন্দিরের দরজা বন্ধ। পূজারী গেছেন জলযোগে। ১৫।২০ মিনিটের মধ্যে পূজারী এসে রুদ্ধ দ্বার উন্মোচন করলেন। পাথরের পর পাথর দিয়ে গাঁথা কারুকার্যবিহীন মন্দির, অপ্রশস্ত ঘর, সেখানে কৃষ্ণবর্ণা যমুনাদেবীর মূর্তি। পুরাণমতে ইনি সূর্যকন্যা। যমরাজের ভগিনী। আড়ম্বরহীন, স্বল্পালোকিত মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে থালির অবশিষ্টাংশ পূজোপকরণ উৎসর্গ করে দিলুম দেবীর উদ্দেশে। পূজান্তে

পূজারীর হাতে দক্ষিণা দিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করে দাঁড়ালুম এসে বাহির চত্বরে।

সামনেই কুড়ি হাজার সাতশ' একত্রিশ ফুট উচ্চ বন্দরপুঁছ তার অপরূপ তুষারধবল দেহ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে। তারই দুটি শৃঙ্গের অন্তর্বর্তী পথে অবতরণ করছে একটি ধবল-রেখা—দিব্যদর্শন চম্পাসর। ওই নিষ্প্রাণ হিমবাহই যমুনোত্রী হতে ৪ মাইল ঊর্ধ্বে তুষারস্রাবরূপে ত্রিধারায় বিগলিত হয়ে একটি প্রাণময়ী ঝরণাধারায় রূপান্তরিত। সেই সুনীল জলধারা—দুটি পর্বতের মধ্য দিয়ে ক্ষিপ্রবেগে প্রবাহিত হয়ে দশ হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত যমুনোত্রী মন্দিরের পাদস্পর্শ করে উত্তাল অশান্তরূপে ধেয়ে চলেছে আটশ' ষাট মাইল দূরে প্রয়াগে সঙ্গমতীর্থ সৃষ্টি করতে। এই জলধারাই বুকে ধরে রেখেছে—শাজাহানের সাধের স্বপ্ন মর্মর স্মৃতি। আবার বৃন্দাবনে পূর্বরাগ, অভিসার ও মিলন-বিরহের শাশ্বত সাক্ষীরূপে রূপায়ণ ঘটিয়েছে অপ্রাকৃত রাধাপ্রেমের। তাইতো ছুটে এসেছে জাতি ধর্ম ও অবস্থা নির্বিশেষে দেশদেশান্তর হতে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন চরিত্রের মানুষ এই উৎসমুখে, অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্য রূঢ় বাস্তব আর জীবনের দুঃখ দুর্দশা হতে নিজেকে মুক্ত করে—উপভোগ করতে জীবনের শান্ত সমাহিত আনন্দময় একটি ক্ষণিক রূপ।

কিছুক্ষণ যমুনার নৃত্যচপলা রূপ দেখে ধীর পদক্ষেপে সেতু পার হয়ে এ পারে চলে এলুম। ততক্ষণে অনেকেই এসে লুচি, চচ্চরি আর বঁদে সহযোগে ক্ষুন্নিবৃত্তিতে তৎপর হয়ে পড়েছেন। আমরাও সেই দলে যোগ দিলুম। এবার ফেরার পালা। ব্রহ্মানন্দ ব্যতীত সকল আনন্দেরই আছে একটি আনন্দোত্তর অবসাদ। তবু সকল দেখা ও সকল আনন্দের পশ্চাতে রয়ে যায় একটি দুরাবগাহী স্মৃতি—সেই স্মৃতির রোমন্থনই অবকাশজীবনের পাথেয়। যমুনোত্রীর মায়া কাটিয়ে ফিরে গেলেও তার স্মৃতিচারণই দেবে আনন্দ—শুধু আমাদেরই নয়—বহু ভ্রমণপিয়াসীকেও। আমাদের মত জৈবধর্মী মানুষের কাছে এটিই

পবম লাভ। যে কৌতূহল নিয়ে এসেছিলুম তা তৃপ্ত—যমুনোত্রীর দর্শন-স্পর্শনে। ১২-১৫ মিনিটে যাত্রার জন্য প্রস্তুত—এমন সময় সলিসিটার শ্রীদত্ত নিয়ে গেলেন যমুনা সেতুর ওপর মন্দিরকে পট-ভূমিকায় বেখে ছবি তুলে নিতে। রওনা হয়ে এলুম উৎরাই পথে ফুলচটি অভিমুখে। পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হল ডাণ্ডীব যাত্রী শ্রীমতী বীণাপাণি চক্রবর্তীর সঙ্গে। তিনি তো আমায় দেখে বিস্মিত—এত স্বল্প সময়ে কেমন করে এতখানি পথ অতিক্রম করে এলুম এটুকু ভেবে। এগিয়ে পড়লুম। ২-৪৫ মিনিটে পৌঁছে গেলুম ফুলচটিব জ্যোতিভবনে। মাত্র তিনজন যাত্রী এসে তখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। তাঁদের দলেই যোগ দিলুম। দিবাভাগে মৌমাছিব মত এক প্রকার মক্ষিকার উপদ্রব ও দংশন ব্যতীত ফুলচটির বাসের ব্যবস্থা ছিল আরামপ্রদ। দোতলার সম্মুখ বাবান্দায় একটি করে চেয়ার ও বেঞ্চ সাজান। সেখানে বসে গল্পগুজবে মুখরিত হয়ে উঠত ফুলচটির সান্ধ্য-আসব। যমুনোত্রী পথে শীতেব প্রকোপ যা কিছু ভোগ কবতে হয়েছে ফুলচটিতেই। নিয়মমত নৈশভোজন সমাপ্ত কবে নিঃশব্দে আপন আপন বিছানায় আশ্রয় নিলুম। রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে শীতেব প্রকোপও বেড়ে চলেছে।

তিন

॥ সানাচটি ॥

১৪ই মে ৬-৪০ মিনিটে বেরিয়ে পড়লুম সানাচটি অভিমুখে। সঙ্গে সীতেনবাবু, সরলবাবু ও পিল্লাই। যমুনোত্রী পথে দুস্তর চড়াই মাত্র ভৈরবঘাঁটির। ফুলচটি হতে সানাচটি সামান্য কিছু চড়াই-উৎরাই আর উঁচুনীচু পাথুরে পথ। কঠিন চড়াইগুলি এখন উৎরাই-এ পরিণত। উৎরাইগুলি কঠিন চড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডালিয়া সঙ্গে আসতে চেয়েছিল। সাজসজ্জার বিলম্ব হেতু পিছিয়ে পড়েছে। সীতেনবাবুরাও পিছিয়ে পড়লেন। পাহাড়ী পথে একক চলার সুবিধা আছে। পথ চলা যায় দ্রুত। কথা না বলার দরুণ শ্বাস-প্রশ্বাসে ঘটে না কোন ব্যাঘাত। পথের মাঝে একবার মাত্র দেখা হল শ্রীমতী ইন্দুবালা সরকারের সাথে—ধীর, দৃঢ়চেতা মহিলা। সমগ্র পথটি দৃঢ় পদক্ষেপে এভাবেই চলে এসেছেন যমুনোত্রী যাতায়াতের পথে। বয়স পঞ্চাশোর্ধ্বে। একেবারে সানার প্রবেশ-পথে যেখানে দুটি সেতু পর পর অতিক্রম করতে হয় সেখানে সাক্ষাৎ হয়ে গেল শ্রীমতী দূর্বা ব্যানার্জী ও তাঁর ভগ্নিদ্বয়ের সঙ্গে। সেতু দুটি অতিক্রম করে তাঁদের পশ্চাতে রেখে চলে এলুম সানার মুখে ভীষণ উৎরাই পথে অবতরণ করে। দু-দু' বার উৎরাই মুখে পথ ভুল হল। এখানে দু'তিনটি পথ এদিকে সেদিকে এমনভাবে চলে গেছে যে, সানাচটির পথ কোনটি তা নির্ণয় করা শক্ত। একবার একজন পাহাড়ী আর একবার শ্রীমতী ব্যানার্জী ভুল সংশোধন করে দিলেন। পৌঁছে গেলুম সানা ৯-৫০ মিনিটে। সানার প্রবেশপথে সমতলে দেখা হয়ে গেল আমাদের কামরার সহযাত্রী শ্রীশৈলেন চ্যাটার্জির সঙ্গে—দ্রুতগামী পদযাত্রীদের অন্যতম। সানার চটি বদল হয়েছে এবং পূর্বের চেয়ে চটিটি রূপে-রসে জাঁতে উঠেছে। ইটের ইমারৎসহ

একতলায় দুটি কামরাযুক্ত ঘর, সিমেণ্ট করা মেঝে। তার পাশে দু' দিকে কয়েকখানি দোতলা কাঠের ঘর। এইসব মিলিয়ে পরিবেশ মন্দ নয়। বামপার্শ্বের কাঠের ঘরগুলির কোণের দিকে ঝরণার নল বেয়ে ঝর ঝর শব্দে অবিরল ধারায় জল পড়ছে। নীচেই একশত ফুটের মধ্যে উচ্ছ্বাসময়ী স্বচ্ছসলিলা যমুনা--তার বক্ষ-লগ্না সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডগুলি স্নানঘাটের কাজ করছে। চটির সামনেই চা-দুধ-এর দোকান। সানা পৌঁছেই একতলার একখানি ঘর দখল করে বসলুম। অবনীবাবু ইতিমধ্যে স্নান সেরে কেশবিন্যাস শুরু করে দিয়েছেন। তাম্বুলবিলাসী তারকবাবু পানের বাক্স খুলে পান সাজতে বসে গেছেন। পাঁচুবাবু তাঁব অভ্যাসমত স্নান সেরে ঘটি হাতে ফিরছেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ধীরে ধীরে যাত্রীরা সব পৌঁছতে লাগলেন। কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ছিল একতলার পাকা ঘর দু'খানি মহিলাযাত্রীদের বণ্টন করে দেওয়া। কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগের অভিপ্রায়ে আমরা পুরুষযাত্রীরা এবারে এ দুটি কামরা আমাদের দখলে রেখে দিলুম। তবে মহিলাযাত্রীদের সুবিধা হয়েছিল অন্যদিকে। বিশেষ করে জলের কলটি তাঁদের সামনে থাকায় মহিলারা এসেই কাপড় জামা যার যা আছে কলের জলে ধোয়ার কাজে এমন-ভাবে লেগে গেলেন যে, পুরুষযাত্রীদের কল ব্যবহারের কোন সুযোগই রইল না অন্ততঃ এক ঘণ্টা। কি স্নানের ঘাটে, কি ধর্মশালায়, জলের ব্যবহার বিষয়ে মহিলাদের স্বার্থপরতাটুকু লক্ষণীয়। সানাতেও যমুনায় স্নানের ঘাটে এ দুর্ভোগের অভিজ্ঞতা আছে আমাদের কয়েক-জনের। সীতেনবাবু, পিল্লাই ও সরলবাবু সহ সাথের কুলি রামপাল সিং-এর আগমন পর্যন্ত স্নানের জন্য অপেক্ষা সর্বত্রই করতে হয়েছে। তাঁরা পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গে স্নানের জন্য প্রস্তুত হয়ে যমুনার দিকে গিয়ে দেখি স্নানার্থী মহিলারা দু'একজন করে আসতে শুরু করেছেন এবং কেউ কেউ বসে গেছেন অঙ্গমার্জনায়। আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও তাঁদের স্নানপর্ব সমাপ্ত না হওয়ায় অগত্যা নানা

অসুবিধার মধ্যেই অন্যত্র স্নান সেরে নিতে হল আমাদের কয়েক-জনকে। কুণ্ডু স্পেশ্যালের নিয়মমত মধ্যাহ্ন ভোজনের পর্ব শেষ হল। পচ্ছন্দমত একটি কামরা পাওয়ায় আমাদের কয়জনের রাত্রিযাপনের কোন অসুবিধা হয়নি সানাচটিতে। রজনীর আতিথ্য শেষে তল্পি গুটিয়ে চা-পান করে যাত্রার অপেক্ষায় বসে আছি।

॥ কুৎনৌর ॥

১৫ই মে সকাল ৬-১০ মিনিটে সানা ত্যাগ করে ধীরে ধীরে চলেছি। গত দিনের এক গ্লাস গরম দুধের জের মেটাতে দুপুর হতে ভোর পর্যন্ত মগ হাতে ছোটাছুটি করতে হয়েছে—সাত-আটবার। তাই সাবধানে পথ চলতে হচ্ছে। ফেরার পথে চড়াই বিশেষ নাই। সীতেনবাবু, সরলবাবু ও পিল্লাই-এর সঙ্গে একসাথে চলেছি। পথের মাঝে সহযাত্রী অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তাঁদের পশ্চাতে রেখে এগিয়ে গেলুম। দলবদ্ধ মহিষের অত্যাচারে কিছুক্ষণ করে অপেক্ষা করে মাঝে মাঝে পথ চলতে হচ্ছে। এজন্য অশ্বারোহী যাত্রীদেরও অনেকে পায়ে চলা শুরু করেছেন। এসে গেলুম ওয়াজিরি ও যমুনা চটির মধ্যবর্তী সংকটময় গড়ানে পথটির সন্নিকটে। রমাদির ডাণ্ডী বিশ্রাম নিচ্ছে—তাঁকেও পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হবে এ পথটুকু। পর্বতশীর্ষ হতে পূর্ত-বিভাগের জনৈক কর্মচারী নীচের দিকে প্রস্তর নিক্ষেপ করছে পথটিকে ধীরে ধীরে সুগম করার জন্য। সামান্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দ্রুতপদে অতিক্রম করে এলুম সংকটময় পথটি। এই চারদিনে পথটি পূর্বাপেক্ষা সুগম হয়েছে অনেকটা। এক মাইলের মধ্যে যমুনা চটি পার হয়ে ঢালু উৎরাই পথে সারিবদ্ধ মহিষের আশপাশ দিয়ে অবতরণ করে পৌঁছে গেলুম কুৎনৌর বেলা ৯-১০ মিনিটে।

এ কয়দিনে অনেকেই পথ চলেছেন এক সঙ্গে এক একটি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে। শ্রীমতী আরতি বসুমল্লিক ও কাজল চৌধুরী

চলেছেন শ্রীপুলক কুণ্ডুর সাথে। আরতি সরকার কাশীনাথবাবুর সঙ্গে। বৈমানিক শ্রীদূর্বা ব্যানার্জী ভগ্নিদ্বয় সহ। অবনীবাবুরা তিন-জন কালনাবাসী এক সঙ্গে। সীতেনবাবু, পিল্লাই, সরলবাবু ও মিঃ গুপ্ত প্রায় এক সাথেই। বেহালা হতে আগত দুই বন্ধু কেশববাবু ও সুধীনবাবু পাশাপাশি। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত সস্ত্রীক। দলবিচ্ছিন্ন একক যাত্রী ছিলেন শ্রীমতী ইন্দুবালা সরকার, শ্রীমতী শৈলবালা ব্যানার্জী ও শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। সীতেনবাবুদের সঙ্গে একত্রে যাত্রা করলেও কিছুদূর এসে বিচ্ছিন্ন হয়ে বরাবরই ছিলুম একলা-পথের যাত্রী। স্নেহের পাত্রী ডালিয়া পথ চলার সুবিধার জন্য যখন যার সঙ্গ লাভ করছিল সেই ছিল তার সঙ্গী। ১১ই মে কুৎনৌর হতে ৮-৭৫ মিনিটে রওনা হয়ে এইভাবে যমুনোত্রী যাতায়াতের পথে ৩৮ মাইল পদযাত্রা সমাপ্ত করে "কুৎনৌর"-এ পুনরায় পৌঁছে গেলুম পঁচিশজন যাত্রী ১৫ই মে বেলা ১০টার মধ্যেই। এসে গেলেন চার-জন ডাণ্ডী ও ছয়জন অশ্বারোহী যাত্রী। বিশ্রাম নিয়ে—কুৎনৌরের সেতু পেরিয়ে ঝরণার জলে সংক্ষেপে স্নান সেরে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বেলা ১টায় রওনা হয়ে গেলুম দেড়খানি বাস ভর্তি তেতাল্লিশজন যাত্রী উত্তরকাশী অভিমুখে—সঙ্গে নিয়ে মুদির দোকানে গচ্ছিত স্বামী অভেদানন্দজীর "Complete Works"গুলি।

চার

॥ গঙ্গোত্রীর পথে—উত্তরকাশী ॥

১৫ মে কুৎনৌর হতে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বেলা ১টায় রওনা হয়ে গঙ্গাণী ও বরকত হয়ে ১১ মাইল পথ অতিক্রম করে বাসখানি ধরাসু পথে চলতে শুরু করল। যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী যাত্রার সংযোগস্থল ধরাসু। বরকত হতে ৩৬ মাইল পথ। উপরে উঠছি আরও উপরে—বামপার্শ্বে পাইনের সারি, দক্ষিণে পাহাড়—মধ্যে অজগরের মত পীচ-ঢালা পথ—এঁকেবেঁকে সেই পথ বেয়ে বাসখানি ছুটে চলেছে উত্তর-কাশী অভিমুখে। বরকত হতে রাড়িরধার পৌঁছে সিলকিয়ারী হয়ে একেবারে গিঁউলাতে এসে বাসখানি থামল ১-৩০ মিনিটে। সকলেই নেমে পড়লেন পকৌরী আর চায়ের আকর্ষণে। নিজ নিজ কামরার পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে এক একটি চায়ের দোকানে সারি দিয়ে বসে সকলেই চা-পানে মনঃসংযোগ করলেন। পায়েচলা পথের অবসান ঘটেছে। এবার গঙ্গোত্রী পর্যন্ত পা দু'খানি পাবে বিশ্রাম। কুৎনৌর হতে বরকত—ধরাসু ও উত্তরকাশী হয়ে লংকা পর্যন্ত যে ১২০ মাইল পথ বাস চলাচল করছে আমরা সেই পথেরই যাত্রী। কুৎনৌর হতে লংকা পর্যন্ত উচ্চশ্রেণীর বাস ভাড়া ১৯'০০ টাকা, নিম্নশ্রেণীর ১৩'৫০ পঃ। মধ্যে ভৈরবঘাঁটির চড়াই-উৎরাই ১½ মাইল অতিক্রম করে পুনরায় ৬½ মাইল গঙ্গোত্রী পর্যন্ত বাস মেলে, ভাড়া ১'৫০ পঃ। ড্রাইভারের হর্ণের শব্দে সকলেই সচকিত হয়ে আপন আপন আসনে বসে পড়লুম। গিঁউলা হতে কল্যাণী পেরিয়ে একেবারে পৌঁছলুম ধরাসু, বৈকাল ৪-১৫ মিনিটে কুৎনৌর হতে ৪৭ মাইল পথ অতিক্রম করে। ধরাসুতে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরে বাসখানি সোজা উত্তর পথে দ্রুত চলতে শুরু করল। উঁচু থেকে নেমে এসেছি। প্রায় ৭৪০০´ ফুটের মাথায় উঠে ৪০০০´ ফুটে নেমে এসেছি। পাইনের মাথা

ছাড়িয়ে উপরে উঠেছিলুম—এখন পাইনের পা ছাড়িয়ে নীচে নেমেছি। মাথার উপর সুনীল আকাশ, নীচে শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা আর পাহাড়ের গায়ে গায়ে মেঘের লুকোচুরি খেলা দেখতে দেখতে ধরাসু হতে টুংডা ৯ মাইল ও আরও ৩ মাইল নকোরি ছাড়িয়ে চলে এলুম মল্লী বা মালতী দু'মাইল পথ। এখানে গঙ্গোত্রীর পাণ্ডাদের গ্রীষ্মকালীন আবাস। মল্লী হতে ররেতি আরও ৩ মাইল পথ অতিক্রম করে উত্তরকাশী পৌঁছিবার মাইলখানেক পূর্বে গিয়ানসু বলে একটা জনপদে পৌঁছলুম কুৎনৌর হতে ৬৫ মাইল পথ অতিক্রম করে। একদিকে পর্বতের বিস্তীর্ণ দেওয়াল অন্যদিকে ভাগীরথীর তটভূমি—বিশাল শস্যপ্রান্তর, শ্যামল ক্ষেত। এখানেই সম্প্রতি "নেহেরু ইনষ্টিটিউট অফ্ মাউণ্টেনীয়ারি" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গিয়ানসুর নিকটেই ভাগীরথী ত্রিধাবিভক্তা—অসী, বরুণা ও গঙ্গা। উত্তরকাশী নামটির মূল প্রতিপাদ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পূর্বকাশী বা বারাণসী। এখান হতে ক্ষীণকায়া অসী আর বরুণা সমস্ত পথটি অতিক্রম করে গিয়ে পৌঁছেছে বারাণসীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে এবং সঙ্গম সৃষ্টি করেছে সেখানেও গঙ্গার সঙ্গে। দুই কাশী যেন সূক্ষ্ম যোগসূত্রে আবদ্ধ।

॥ উত্তরকাশী ॥

গিয়ানসু ছেড়ে আমরা নেমে চলেছি ঢালুপথে আরও এক মাইল উত্তরকাশী শহরটির সমভূমিতে। পৌঁছে গেলুম ভাগীরথী তীরে অবস্থিত উত্তরকাশী ৫-৩৫ মিনিটে গঙ্গোত্রী পথে সুবৃহৎ জনপদ। উন্মাদিনী ভাগীরথীর প্লাবন হতে রক্ষার্থে পাথরের বাঁধ দিয়ে শহরটি সুরক্ষিত। সুন্দর পরিচ্ছন্ন শহর সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৩৮০০´ ফুট উচ্চে। পূর্বে ভাগীরথী তার ওপারে বিশাল পর্বতের হরিৎ শোভা। পশ্চিম ভাগেও বৃহৎ গিরিশ্রেণী। এজন্য উত্তরকাশী উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত। এখানে জেলাশাসক, কোর্ট, কাছারী সকলেরই কেন্দ্র। হাসপাতাল,

ডাকঘর, স্কুল, কলেজ, খেলার মাঠ, সরকারী বিপণনকেন্দ্র—এসব নিয়ে শহরটি সমৃদ্ধ। উত্তরকাশী জেলার সদর অফিস। রয়েছে দুটি ধরমশালা, কালীকমলী ও বিড়লা। কালীকমলী আয়তনে বিশাল—গঙ্গাতীরে অবস্থিত। বিড়লা গঙ্গাতীরে নয় পাহাড়ের কাছে। তাছাড়া বর্তমানে সরকারের তরফ থেকেও হয়েছে একটি "টুরিষ্ট লজ্" বিড়লা ধরমশালার পাশেই। দৈনিক ভাড়া কামরা প্রতি ৪·০০ টাকা। বিড়লা ধরমশালা সৌখিন দোতলা একটি বাড়ী। মেঝেটা মার্বেলের, তবে অত্যন্ত জলাভাব। এখানেই দোতলার কয়েকখানি কামরায় দু'রাত্রি বাসের ব্যবস্থা। বাসখানি ধরমশালার সন্নিকটেই থেমে গেল—সামনেই পরিবহন অফিস। বাস থেকে নেমেই আপন আপন বাসযোগ্য কামরার জন্য ব্যস্ত হয়ে সকলেই একে একে সুযোগ-সুবিধামত স্থান সংগ্রহ করে নিলুম। কেহবা ঘরে কেহবা বারান্দায়। পিল্লাই, সরলবাবু সহ আমরা তিনজনে স্থান পেয়ে গেলুম একটি কামরায় সপরিবার ডাক্তারবাবুদের তিনজন এবং গোবিন্দবাবু ও তাঁর বৃদ্ধা মাতার সঙ্গে। সীতেনবাবু ছিলেন আমাদেরই কামরার সম্মুখস্থ বারান্দায়। উত্তরকাশীতে শীতের প্রকোপ তেমন কিছুই নাই। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিড়লা ধরমশালার কলের জলে হাতমুখ ধুয়ে হোল্ডল্ খুলে বিশ্রাম নিতে লাগলুম। সীতেনবাবুরা একদল এবং মহিলারাও অনেকে চলে গেলেন গঙ্গায়। উত্তরকাশীতে বৈদ্যুতিক আলো থাকা সত্ত্বেও সেদিন সমগ্র শহরটিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ছিল বন্ধ। ফলে বাতি জ্বেলেই কাজ চালাতে হল। হরিদ্বারের মত কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে পুরুষ ও মহিলাযাত্রীরা উত্তরকাশীর বাজার ঘুরতে বেরিয়ে পড়লেন সন্ধ্যার পর। বিড়লা ধরমশালা হতে দু'তিন মিনিটের ব্যবধানে দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বাঁক পেরিয়েই বাজার। দু'ধারে দোকান-পসার, মনোহারী, খাবার দোকান, নানা রকম পাথরের মালা আর চুড়ির দোকান। ধরমশালার পাশেই সরকারী বিপণনকেন্দ্র "উত্তরকাশী উদ্যোগ বিভাগ"। আমাদের কামরার শ্রীমতী পারুল

মল্লিক উত্তরকাশী পৌঁছে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ১৫০৲ টাকার পশমী বস্ত্র ক্রয় করে ধরমশালায় ফিরলেন। উত্তরকাশী এখনও নিরিবিলি, গায়ে যথেষ্ট আধুনিকতার হাওয়া লাগেনি। তবে যেভাবে মহিলারা আসছেন তাঁদের সাজসজ্জা নিয়ে—আর দেরী নাই। বিশ্রামের অছিলায় রয়ে গেলুম ধরমশালায়। সেই অবকাশে সপরিবার ডাক্তার-বাবু শ্রীজহর দাঁয়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল—কন্যার বিবাহ দিয়েছেন বীডন ষ্ট্রীটে, বিখ্যাত কাগজব্যবসায়ীর বাড়ী "ভোলানাথ ধামে"। গোবিন্দবাবুব সঙ্গে তাঁর পরিচয় অনেকদিনের। বার্ধক্যের সীমায় পৌঁছে সপরিবারে একক এই দুর্গম তীর্থে যাতায়াত দুঃসাধ্য বিবেচনায় গোবিন্দবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে এসেছেন বিবাহিতা কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে। উত্তরচল্লিশের সীমায় পৌঁছেও অবিবাহিত গোবিন্দবাবু এই সুযোগে তাঁর বৃদ্ধা মাতাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দুর্গম তীর্থে তীর্থে। তাঁর মাতৃসেবা—মাতাপুত্রের স্নেহ-মধুর সম্পর্কের আর একটি অতীত স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দিল। দশ বৎসর পূর্বে এমনি করেই এক সময় ঘুরে বেরিয়েছি তীর্থে তীর্থে আমার স্নেহময়ী জননীকে সঙ্গে নিয়ে। আজ আর তিনি ইহলোকে নাই···। বিস্ময় জাগে একটি মানুষের জীবনের ঘটনার সঙ্গে আর একটি মানুষের জীবনের ঘটনার সাদৃশ্য ভেবে। কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্মচারী সুকুমার নৈশ ভোজনের তাগিদ্ দিয়ে গেল।

১৬ই মে প্রয়োজনের তাগিদেই উত্তরকাশীতে অবস্থিতি। গঙ্গোত্রী ও গোমুখ যাত্রার জন্য উত্তরকাশীর মহকুমা থানা অফিসারের (S. D. P. O.) অনুমতি প্রয়োজন। আজই দরখাস্তগুলি পূরণ করে পেশ করতে হবে কর্তৃপক্ষের কাছে। এজন্য সকাল হতেই ম্যানেজার বিনয়বাবু ব্যস্ত। প্রাতরাশ পর্ব সমাপ্ত করে সীতেনবাবু, সরলবাবু, পিল্লাই, কুণ্ডুবাবু, মিঃ গুপ্ত ও গৌরীপ্রসন্নবাবু এই সাতজনে মিলে বেরিয়ে পড়লুম উত্তরকাশীর সন্ন্যাসী পল্লী উজলীর "রুদ্রাবাস" অভিমুখে স্বামী অভেদানন্দের "Complete Works"গুলি পৌঁছে

দিতে স্বামী সত্যদেবানন্দের হাতে। পাথর বাঁধান গঙ্গোত্রী যাত্রার 'মোটর রাস্তা' ধরে সোজা উত্তরে চলেছি। যতই উজলীর দিকে অগ্রসর হতে থাকি দৃশ্যও তত মনোরম। উত্তরপ্রবাহিনী গঙ্গা উন্মত্ত আবেগে ছুটে চলেছে, প্রাণচঞ্চলা, নৃত্যময়ী ছন্দে। একদিকে ধীরে ধীরে উঁচু প্রস্তরময় তটরেখা গিয়ে মিশেছে উত্তরকাশীর উপত্যকায় আর একদিকে গঙ্গার গা-ঘেঁষে গগনচুম্বী খাড়াই পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে গায়ে মেঘের খেলা। উপরে উদার-উন্মুক্ত আকাশ। এসব মিলে মনকে তন্ময় করে দেয় অনন্তের ধ্যানে। পথিমধ্যে আবাসিক সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়—স্বামী ব্রহ্মস্বরূপানন্দের অক্ষয়কীর্তি—যার উচ্চমানের শিক্ষাপদ্ধতির খ্যাতি সমগ্র উত্তরকাশী জেলায়। চলে এলুম এক মাইল পথ। মোটর পথের বামপার্শ্বে বিশাল পাহাড়ের দেওয়ালের গায়ে উজলীর প্রবেশপথেই কৈলাস আশ্রম। শুরু হল সন্ন্যাসী পল্লী—আনন্দ স্মৃতি, দেবগিরি আর একটু নীচের দিকে "রুদ্রাবাস"। সবগুলিই বাঙালী সন্ন্যাসীদের আশ্রমিক জীবনের কেন্দ্র। পৌঁছে গেলুম "রুদ্রাবাস"। আশ্রম-নিম্নে প্রবাহিত উচ্ছ্বাসময়ী ভাগীরথী। রুদ্রাবাসের মনোরম পরিবেশ পশ্চাতে ফেরার কথা ভুলিয়ে দেয়।

সাক্ষাৎ হল স্বামী সত্যদেবানন্দের সঙ্গে। বয়স সত্তর-এর ওপর। বাহ্য দৃষ্টিতে একজন সাধারণ সন্ন্যাসী মাত্র। অন্তরের খবর কে রাখে? শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সম্পাদক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী-লিখিত পরিচয়পত্র সহ পুস্তকগুলি তুলে দিলাম তাঁর হাতে। দীর্ঘ ৩০ বৎসর পূর্বে তিন ভ্রাতা তপস্যার্থে চলে আসেন উত্তরকাশী। তিনজনেই ছিলেন স্বামী সারদানন্দের মন্ত্রশিষ্য ও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী। তদবধি এখানেই রয়ে গেছেন স্থায়ীভাবে। স্বামী ব্রহ্মস্বরূপানন্দ ছিলেন কনিষ্ঠ। উত্তরকাশীর উন্নতিকল্পে ব্রহ্মস্বরূপানন্দের অবদান চিরস্মরণীয় করে রেখেছে তাঁকে। কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি দেহ-ত্যাগ করেছেন। অলোচনা শুরু করলেন স্বামীজী সন্ন্যাসজীবনের

অভিজ্ঞতার কথা—সাধুর আচরণীয় কর্তব্যের বিষয় নিয়ে। বললেন প্রকৃত ত্যাগী ও ভগবদাশ্রয়ী সাধুর চিত্তে অবশ্যই থাকবে আনন্দ ও শান্তি। তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে এমন একটি শুচি-শুভ্র পরিবেশ সৃষ্টি হল যে, সকলেই অবহিতচিত্তে শ্রবণ করতে লাগলেন তাঁর অমৃতময়ী বাণী। জনৈক ভগবদাশ্রয়ী সন্ন্যাসীর মুখেও শুনেছিলাম, প্রকৃত ত্যাগী ও ভগবদ্বিশ্বাসী সন্ন্যাসী ভগবৎপ্রসঙ্গ ব্যতীত কদাচিৎ অন্য প্রসঙ্গে কালক্ষয় করে থাকেন এবং তাঁদের সান্নিধ্যে সৃষ্ট হয় একটি আনন্দময় পরিবেশ। সেদিন উত্তরকাশীর ভাগীরথী তীরে উজলীর "রুদ্রাবাসে" স্বামী সত্যদেবানন্দের আলোচনার মাধ্যমে এ সত্যটুকু অনুভব করে অনেকেই তৃপ্ত হয়েছিলাম। প্রত্যাবর্তনকালে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি, জড়িয়ে ধরে বললেন স্বামী সত্যদেবানন্দ—"আর কেন ভাই চলে এসো"…। মনটা উদাস হয়ে গেল ক্ষণিকের জন্য। সেই পুরাতন প্রশ্ন। পশ্চাতে কোন আকর্ষণ নাই তবু "ছাড়িতে গেলে ব্যথা বাজে"। এ প্রশ্নের উত্তর নাই। উঠে পড়লুম "রুদ্রাবাস" হতে। ফেরার পথে দেখতে লাগলুম উত্তরকাশীর অলি-গলির মধ্য দিয়ে অন্নপূর্ণা মন্দির, শক্তি মন্দির, কালভৈরব, পরশুরাম, কেদার-ঘাটে বিরাট শ্মশান ক্ষেত্র। প্রবেশ করলুম প্রাচীন বিশ্বনাথ মন্দিরে—সাক্ষাৎ হল আমাদের মহিলা সহযাত্রীদের সঙ্গে। অনেকেই বেরিয়েছেন দর্শনে। বিশ্বনাথের মন্দিরচূড়ায় শোভমান সাত ফুট প্রস্থ ও পনের ফুট দীর্ঘ অষ্টধাতুর ত্রিশূল—অস্পষ্ট হরফে পালিভাষায় কি যেন লেখা। মন্দিরস্থ পূজারীকে ১৲ টাকা দক্ষিণা দিয়ে ১৫ মিনিট কাল বিশ্বনাথের পূজাদি করলুম পূজারীর সাহায্যে। পাশের আসনে শ্রীমতী রমা ঘোষ ওরফে রমাদিও ছিলেন এ পূজার অংশীদার। পূজান্তে পুনরায় সকলে জয়পুরের মহারাণী প্রতিষ্ঠিত একাদশী রুদ্র ও অম্বিকা দেবী দর্শনে যাত্রা করলুম। সেখান হতে কালী মন্দির ও আনন্দময়ীর আশ্রম দর্শন করে ফিরে এলুম ধরমশালায় বেলা ১১টার মধ্যেই।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ছড়িদার এসে সকল যাত্রীদের কাছে গঙ্গোত্রী ও গোমুখ যাত্রার অনুমতি পত্র পূরণ ও স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে গেল। কেহ কেবলমাত্র গঙ্গোত্রী কেহবা গঙ্গোত্রী গোমুখ দুটিই দর্শনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে দরখাস্ত পূরণ ও সই করে দিলেন। ছড়িদার এক কামরা হতে অপর কামরায় ঘুরে ঘুরে দরখাস্তগুলি সংগ্রহ করে ম্যানেজার বিনয়বাবুর হাতে পৌঁছে দিল। বিনয়বাবু নিখুঁতভাবে সেগুলি পরীক্ষা করে মহকুমা থানা অফিসারের (S. D. P. O.) অনুমোদন ও স্বাক্ষর দানের জন্য উত্তরকাশীর মহকুমা থানা অফিসে নিয়ে গেলেন।

উত্তরকাশীর পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে অসী গঙ্গা, দক্ষিণে বরুণা নদী। বরুণা ও অসী গঙ্গার মধ্যবর্তী তীর্থই বারাণসী—বরুণাবত পর্বত-ক্রোড়ে অবস্থিত। পাঁচ ক্রোশ রাস্তায় ঘেরা এই শহরের পূবে কেদারঘাট এবং দক্ষিণে মণিকর্ণিকা, মধ্যস্থলে বিশ্বনাথের মন্দির। এজন্য উত্তরকাশী একটি প্রধান তীর্থস্থান। শুধু তীর্থ নয়, বহু প্রাচীন যুগ থেকে এটি একটি অধ্যাত্মসাধনকেন্দ্র। যোগী, সন্ন্যাসী, মনীষী, দার্শনিক ও সাধু এই উত্তরকাশীর বহু গুপ্তস্থানে আত্মলীন অবস্থায় থাকেন। এমনি একজন প্রসিদ্ধ সাধু রামানন্দ অবধূত থাকেন উজলী হতে আরও আধ মাইল দূরে লাক্ষেশ্বর মহাদেব মন্দিরের সন্নিকটে একটি নিভৃত স্থানে। উজলীর কয়েকজন সন্ন্যাসীর মুখে তাঁর উচ্চাবস্থার কথা শ্রবণ করে অবধি মনটা ছিল উদ্‌গ্রীব তাঁকে দর্শনের জন্য। তাই অপরাহ্ণে লাক্ষেশ্বর মহাদেব মন্দির ও রামানন্দ অবধূতকে দর্শনের আশায় ধরমশালা হতে রওনা হবার উদ্যোগ করছি সীতেনবাবু, সরলবাবু, পিল্লাই ও শৈলেনবাবু সহ আমরা একই কামরার কয়েকজন যাত্রী। এমন সময় আমাদেরই কামরার যাত্রী শ্রীমতী পারুল মল্লিক ও তাঁর কন্যা ডালিয়া সঙ্গে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে বেরিয়ে পড়লেন। পশ্চাৎ নিলেন শ্রীগৌরী সেন ও বীণাপাণি চক্রবর্তী। একই কামরার এতগুলি লোক চলেছি লাক্ষেশ্বর মহাদেব

ও সাধু সন্দর্শনে একটি আনন্দোচ্ছল ভাব নিয়ে। পথের দূরত্বের কথা চিন্তা করে শ্রীগৌরী সেন ও বীণাপাণি চক্রবর্তী কিছুদূর অগ্রসর হয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন ধরমশালায়। চলেছি গঙ্গোত্রী পথের "মোটরমার্গ" ধরে। এক মাইলের মধ্যে পথের বামপার্শ্বে কৈলাস আশ্রম ও দক্ষিণে রুদ্রাবাস ছাড়িয়ে উজলীর সীমা অতিক্রম করে চলে এলুম আরও কিছুদূর। মোটর রাস্তা হতে কিছুটা অবতরণ করে দক্ষিণে একটু অগ্রসর হয়েই লাক্ষেশ্বর মহাদেবের মন্দির। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, এখানে কৌরবরা পুরোচনকে দিয়ে লাক্ষাগৃহ নির্মাণ করিয়ে পাণ্ডবদের হত্যার উদ্দেশ্যে সেই গৃহে অগ্নি সংযোগ করান—যা "জতুগৃহ দাহ" নামে খ্যাত। পুরোচনের মৃত্যু ঘটে লাক্ষাগৃহে। ঈশ্বরানুগ্রহে পাণ্ডবরা পেয়ে যান রক্ষা। একটিমাত্র ছোট দরজাযুক্ত মাঝারি আকৃতির জানালাবিহীন একটি পাথরের ঘর। অভ্যন্তরভাগে দিবালোকেও আলোক-বর্তিকা প্রয়োজন। এখান হতে দু'তিন মিনিটের মধ্যেই সামান্য একটু দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে রামানন্দ অবধূতের আশ্রম।

আশ্রম বললে ভুল হবে—তাঁর বাসোপযোগী স্থানের একটু ব্যবস্থা। প্রবেশপথেই দৃষ্টি পড়ল ঃ মৌন, সমাহিত দৃষ্টি, নগ্নবপু, দীর্ঘকায় এক পুরুষপ্রবর যষ্টি হস্তে চেয়ারে উপবিষ্ট—জগৎ এবং দেহ সম্বন্ধে নির্বিকার ও উদাসীন। ভগবৎ-তত্ত্ব, সৃষ্টিরহস্য, আত্মার অবিনশ্বরতা সব কিছুরই জ্ঞান করামলকবৎ প্রত্যক্ষ ক'রে যেন বাস করছেন পরম নিশ্চিন্তে একটি আনন্দচেতনার মধ্যে। তাঁর তত্ত্বাবধায়ক দু'জন সন্ন্যাসীর কাছে জ্ঞাত হলুম অবধূতের বয়স ১৭৫ বৎসর। বয়সই সাধুদের উচ্চাবস্থার মানদণ্ড নয়। বয়স যাই হোক, রামানন্দ অবধূত যে বিরল উচ্চাবস্থার সাধুদের অন্যতম এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁর সান্নিধ্যে আধ ঘণ্টা অবস্থান করে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে এলুম। সন্ধ্যা আগতপ্রায় এজন্য দ্রুতপদে সকলেই এগিয়ে চলেছি। পথিমধ্যে রুদ্রাবাসের সম্মুখে সাক্ষাৎ হল একজন বাঙালী সন্ন্যাসীর

সঙ্গে—ছিলেন বাগবাজার বিবেকানন্দ মিশনে—স্বামী ত্রিপুরানন্দের কাছে। তপস্যায় এসেছেন রুদ্রাবাসে। দু'এক কথা আলাপের পর বিদায় নিয়ে চলে এলুম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়, বিড়লা ধরমশালার পার্শ্ববর্তী বিপণন কেন্দ্র হতে একটি মাফ্লার ক্রয় করে ফিরে এলুম ধরমশালায়। সীমান্ত অঞ্চলে ক্যামেরা প্রভৃতি ছবি তোলার সরঞ্জাম নিয়ে চলা-ফেরার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন উত্তর প্রদেশ সরকার। এজন্য ক্যামরাবাহী যাত্রীরা কর্তৃপক্ষের অনুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উত্তরকাশীতে সেগুলি গচ্ছিত রেখে লংকা যাত্রার জন্য উদ্যোগী হলেন। বিড়লা ধরমশালায় জলাভাব উল্লেখযোগ্য। এজন্য জল সংগ্রহের ব্যবস্থায় অল্পবিস্তর সকলেই ব্যগ্র। নৈশভোজনের পর সারাদিনের ঘোরাফেরাজনিত শ্রান্ত দেহখানি বিছানায় এলিয়ে দিলুম।

॥ লংকা ॥

১৭ই মে, ৬-৪৫ মিনিটে ধরমশালার সামনে প্রথম গেটের বাস ধরে কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্মচারীসহ তেতাল্লিশ জন যাত্রী রওনা হয়ে গেলুম লংকা অভিমুখে। উত্তরকাশী হতে লংকার দূরত্ব ৫৪ মাইল। সকাল ৬-৩০ মিনিট হতে প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর লংকা পর্যন্ত বাস চলাচল করে চারবার। ভাড়া ৬-৩০ পঃ। উত্তরকাশীর সীমা ছাড়িয়ে পথ নির্জন, বনময়। তিন মাইল পথ এগিয়ে গেলেই হিমালয় যেন তার অফুরন্ত সৌন্দর্যভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেয়। এই পথটুকু পার হয়েই যে সেতুটি অতিক্রম করলুম তার নাম গঙ্গোরী। এখানে অসী নদী গঙ্গায় মিশে সঙ্গম সৃষ্টি করে পুনরায় দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেছে। তের হাজার ফুট উচ্চ একটি বিশাল পর্বতচূড়া প্রান্তে অবস্থিত দু'মাইল ব্যাসযুক্ত ডোড়িতাল বা দুধিতাল নামে একটি স্বচ্ছ নীল হ্রদ এই অসী নদীর উৎস। বিভিন্ন পুষ্পশোভিত এই হ্রদটি হিমালয়ের অপূর্ব শোভাময় একটি শৈল-উদ্যান। এই সুপ্রসিদ্ধ হ্রদের অপরূপ দৃশ্য উপভোগের

জন্য গঙ্গোত্রী হতে চড়াই পথে একটি রাস্তা চলে গেছে ডোড়িতাল বা ডুধিতাল পর্যন্ত।

গঙ্গোরী হতে তিন মাইল পথ নইতাল ছাড়িয়ে চলে এলুম মানেরী, আরও চার মাইল। এখানে কালীকমলীর একটি ধরমশালা আছে। সামরিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে মাঝে মাঝে চেক পোষ্ট পার হচ্ছি। কখনওবা পথিমধ্যে ছোট-বড় ঝরণার সেতু পড়ছে। এমনি করে মানেরী হতে মাল্লা ছ'মাইল সুন্দর পথে ধীরে ধীরে চড়াই উঠে এসেছি ৪৮০০´ ফুট। মাল্লা এ পথের সংযোগস্থল। যাঁরা হাঁটা-পথে কেদার-বদরী যেতে চান, এখান হতে ত্রিযুগীনারায়ণ হয়ে কেদার ও পরে বদরীনাথ যেতে পারেন। একসঙ্গে যাঁরা চারধাম যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী ও কেদার-বদরী করতে চান তাঁরা গঙ্গোত্রী হতে প্রত্যাবর্তন পথে এ পথ ধরেই কেদার-বদরী যাত্রা করেন। এখন পথের আর বাসের কল্যাণে লংকা থেকেই যাত্রার ব্যবস্থা আছে ২৩·০০ ভাড়ায়। বাস চলেছে মাল্লা হতে ছ' মাইল পথ। উত্তরকাশী হতে ১৮ মাইল অতিক্রম করে পৌঁছে গেলুম একটি বৃহৎ জনপদ ভাটোয়ারীতে। এখানে রয়েছে বনবিভাগেব প্রকাণ্ড বাংলো, আশে-পাশে বহু ঘরবাড়ী আর দোকান-পসার। বাস স্ট্যাণ্ডের পাশেই সারি সারি চা, বিস্কুট, পকৌরী, মিঠাই প্রভৃতির দোকান, সামনেই ভাস্করেশ্বর শিবের সুপ্রাচীন মন্দির। ভাস্কর এখানে শিবের তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে শিবলিঙ্গটি প্রতিষ্ঠা করেন। শিবলিঙ্গটি চুরাশী লিঙ্গের অন্যতম। নিজের নামানুসারে মন্দিরের নামকরণ হল—ভাস্করেশ্বর শিবমন্দির। এক কালে স্থানটির নামও ছিল ভাস্করপ্রয়াগ। অদূরে নবনির্মিত কলেজ। ভাটোয়ারীর গায়ে লেগেছে যান্ত্রিক সভ্যতার স্পর্শ। চড়াই শুরু হতেই বাসের গতিবেগ হ্রাস পেল। সাড়ে তিন মাইল পথ শ্রীরঙ্গ গ্রাম অতিক্রম করে আরও আড়াই মাইল পথ ভুক্কী পৌঁছে বাসখানি গাংনানী অভিমুখে চলতে লাগল। ভুক্কী হতে গাংনানী তিন মাইল। উত্তরকাশী হতে ২৭ মাইল পথ অতিক্রম করে

বেলা ৮-৪৫ মিনিটে গাংনানী পৌঁছে বাসখানি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। গাংনানীর উচ্চতা ৬২৮০´ ফুট। এখানে পিলিভিতের রাজার বিরাট ধরমশালা আছে। বাস স্ট্যাণ্ড হতে দু' ফার্লং-এর মধ্যে ব্যাস ও বশিষ্ঠ কুণ্ড। একত্রে বলা হয় ঋষিকুণ্ড।

সামনে বিপুল চড়াই। পথ চলেছে এঁকেবেঁকে। প্রবেশ করছি বন্য হিমালয়ের গহন লোকে। দুই পার্শ্বের পর্বতশৃঙ্গ যেন আকাশের সীমা ছাড়িয়ে কোথায় উঠে গেছে। ভাগীরথীর শব্দও মিলিয়ে গেছে —ক্রমেই উপরের দিকে চলেছে বাসখানি। পেরিয়ে এলুম চার মাইল পথ আর শোনগঙ্গা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে সুন্দর একটি স্থান লোহারীনাগ। এখানে সজ্জানন্দ ব্রহ্মচারীর একটি ধরমশালা আছে। একদিকে বিশাল পর্বতের দেওয়াল, অন্যদিকে ভাগীরথীর ভয়াবহ খাদ। ড্রাইভারের ষ্টীয়ারিং সামান্য এদিক-ওদিক হলে কিংবা এক মুহূর্তের অসতর্কতা বা বিচারবুদ্ধিতে বিভ্রম উপস্থিত হলে গাড়ীশুদ্ধ যাত্রীদের ভাগীরথীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে হবে। এইভাবে আরও পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করে দীর্ঘ চড়াই পথের শীর্ষদেশে ৮৫০০´ ফুটের মাথায় যে অঞ্চলটিতে বাসখানি উঠে এল তার নাম সুকী বা সুখী। দূর হতে আবার দেখা যাচ্ছে ভাগীরথীর ধারাটি—চিক্ চিক্ করছে। পরিবহনটি অবতরণ করছে বিস্তৃত একটি অধিত্যকায়। যানটি এসে থেমে গেল ১০-৪৫ মিনিটে ভাগীথীর তটভূমিতে, একটি জনবসতিহীন প্রান্তরের সীমানায়—প্রায় সাত মাইল পথ অতিক্রম করে। স্থানটির নাম ঝালা। উচ্চতা ৮০০০´ ফুট। কুণ্ডু স্পেশ্যালের অনুষ্ঠান-সূচী অনুযায়ী এখান হতেই আমাদের পদযাত্রা শুরু হবার কথা। কিন্তু পথের কল্যাণে বাস এগিয়ে গেছে আরও ১১ মাইল লংকা পর্যন্ত। নির্জন নদীতীর। প্রাণীচিহ্নহীন জগৎ। গিরিরাজি যেন অটল স্তব্ধ ধ্যানমগ্ন কোন্ আদিকাল হতে। এখানে একমাত্র জীবনের লক্ষণ গঙ্গার চপলতা। ঝালা হতে হরশিল আড়াই মাইল। আধ মাইলের মধ্যেই শ্যামপ্রয়াগ, শ্যামগঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গম।

আরও দেড় মাইলের মধ্যে গুপ্তপ্রয়াগ ছাড়িয়ে একটু চড়াই পথে বাসটি চলতে শুরু করল। পথ বেশী নয়। কিন্তু এটুকু ঘন অরণ্যে সুন্দর। যেন একটা প্রাণহীন ভূভাগ। সহসা অস্তিত্বের চেতনা খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু একটা নৈশব্দ্যভাব। এ পথ নূতন। মোটর চলার জন্য সম্প্রতি নির্মিত। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন পথটি হয়েছে লুপ্ত। আমরা বিশাল গিরিশ্রেণীর নীচে দিয়ে চলেছি পাইন বন অতিক্রম করে। পাইন বনের প্রান্তে এসে চড়াই শেষ হল এবং গুপ্ত-প্রয়াগ হতে আধ মাইল পেরিয়ে এসে বাসখানি পেঁছুল হরশিল বা হরিপ্রয়াগে। উচ্চতা কমবেশী ৮০০০´ ফুট। যতদূর দৃষ্টি যায় নিবিড় পাইন বৃক্ষের বন ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে একপ্রান্ত। পার্শ্ববর্তী নির্ঝরিণী ও জলপ্রপাতের শব্দে পর্বতের সানুদেশ হয়ে উঠেছে মুখর। প্রতিটি পর্বতচূড়া তুষারাচ্ছন্ন। ওরা যেন মহাকালের অনাদিযুগের অতন্দ্র প্রহরী। মুগ্ধ দৃষ্টিতে ভাগীরথীর প্রস্তরসংকুল জলধারা ও চতুর্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য চেয়ে চেয়ে দেখে নিলুম; হরশিল উপত্যকাটি বিস্তৃত। চতুর্দিকের পর্বতশ্রেণী উপত্যকাটিকে যেন প্রাচীরবেষ্টিত করে রেখেছে। অদূরে আর একটি পার্বত্য নদী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। স্থানটি তিব্বতী জাড্‌দের বেশ বড় একটি উপনিবেশ। আধুনিক ধরনের কয়েকটি রেষ্ট হাউস মির্মিত হয়েছে, তাছাড়া আছে পোষ্ট অফিস, ডাকবাংলো, পশুদের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, সরকারী বয়নশিল্প বিদ্যালয়। অধিবাসীরা প্রায় সকলেই বয়নশিল্পের ওপর নির্ভরশীল। সুন্দর সুন্দর কম্বল আর নানা জাতের গরম কাপড় বয়নই তাদের জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায়। পূর্বে তিব্বতের সঙ্গে নিয়মিত ব্যবসা ছিল। রাজনৈতিক বিধানে আজ তা বন্ধ। হরশিল ছেড়ে বাসটি চলতে শুরু করল। পথ বনময় ও সমতল। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে পাখী ডেকে যাচ্ছে। বাসটি চলেছে গহন বনের ভিতর দিয়ে ভাগীরথীকে বামপার্শ্বে রেখে।

ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। আমরা এগিয়ে চলেছি আরও আড়াই

মাইল পথ ধরালীর দিকে। যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রীর পথে এখনও বাজার বসেনি। চটির সংখ্যাও নগণ্য। খাদ্যসামগ্রীও এ পথে দুষ্প্রাপ্য। ধরালী এসে গেছি। বাজার, ঘর, দোকান সবই এখানে আছে। বামদিকে অদূরে বয়ে চলেছে উপলমুখরা ভাগীরথী। নেমে পড়লাম বাস থেকে। সামনেই শ্রীকণ্ঠ পর্বত ভগীরথের তপস্যাপূত স্থান। তুষারে তুষারে আচ্ছন্ন তার শীর্ষদেশ। তার ওপর সৌরকিরণ প্রতিফলিত হয়ে অপূর্ব শোভায় ঝলমল করছে শ্রীকণ্ঠ। ওখান থেকেই ক্ষিপ্রবেগে নেমে এসে দুধগঙ্গা মিশেছে গঙ্গায়। সঙ্গমের পাশেই ধ্বসে পড়া শিবমন্দির। আমাদের সহযাত্রী পুলক কুণ্ডু দুধগঙ্গার কিছু জল নিয়ে এসে গায়ে মাথায় সিঞ্চিত করে দিল। ওপারে পাহাড়ের ক্রোড়গাত্রে মুখী মঠ। গঙ্গোত্রীর পাণ্ডাদের বাসস্থান। শীতের কয়মাস ওখানেই গঙ্গাদেবীর মূর্তি এনে পূজা করা হয়। ধরালী ভারত সীমান্তের শেষ বড় গ্রাম। বাস চলতে লাগল। ধরালী ছাড়িয়ে চার মাইল অতিক্রম করে জংলা নামক একটি ক্ষুদ্র বস্তি পার হয়ে এলুম। সামনেই গঙ্গার পুল, ওপারে চড়াই পথ উঠে গেছে লংকার দিকে। পাহাড়ের দুস্তর শীর্ষদেশে লংকা। সেতু পেরিয়ে ধাপে ধাপে চক্রাকারে লংকার দিকে এগিয়ে চলল আমাদের বাসখানি। উত্তর থেকে গঙ্গা বয়ে আসছে জংলার দিকে। বেলা ১১-৪৫ মিনিটে পৌঁছে গেলুম লংকায়। লংকার উচ্চতা ৮০০০´ ফুট। পাইনের ছায়ায় শোভাময় স্থান। জংলা হতে দু'মাইল পথ। লংকার বাস স্ট্যাণ্ড হতে বামপার্শ্বে ৩।৪ মিনিটের মধ্যে একটু বাঁক ঘুরে নেলাং পাশ পর্যন্ত পথ নির্মাণ করছে সৈন্যবিভাগের লোকজন। এখান হতে দশ মাইল দূরে নেলাং—সেখান হতে একটি পথ চলে গেছে পশ্চিম তিব্বতের দিকে। নেলাং-এর পরই তিব্বত সীমা আরম্ভ। দু'দিকেই সীমান্তপ্রহরী। সেই পথ ধরে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ফিরে এলুম। প্রতিটি মানুষের মনের অবচেতন স্তরে সুপ্ত হয়ে আছে নিরুদ্দেশ যাত্রার একটি তীব্র আকুতি। দুর্গম যাত্রাপথে পা বাড়িয়ে সেটি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়। তাইতো সেদিন নেলাং

পথ ধরে যেতে ইচ্ছে করছিল তিব্বতের সীমা পেরিয়ে আরও আরও দূরে। সময় ও পরিবেশ ছিল প্রতিবন্ধক। এখানেই প্যাকেট ব্যবস্থায় লুচি, আলুর দম, বঁদে সহযোগে মধ্যাহ্নভোজনের পর্ব শেষ হল। বাসপথের সীমান্ত (Terminus) লংকা বেশ গঞ্জ হয়ে উঠেছে। বাস স্ট্যাণ্ড হতে তিন মিনিটের মধ্যেই সারি সারি দোকান-পসার। নানা রকম খাবার, জিলিপী, কচুরী, মিষ্টি, মিঠাই। চায়ের দোকানের তো অভাব নাই—সেই সঙ্গে মনোহারীও। বাস থেকে নেমে ভৈরব-ঘাঁটি যাত্রার জন্য প্রায় এক ঘণ্টার মত অপেক্ষা করতে হল কুলির দুষ্প্রাপ্যতা হেতু। হোল্ডল্‌গুলি বহনের জন্য কোনরূপে কুলি সংগ্রহ করলেন কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্তৃপক্ষ। কিন্তু আমাদের হাতের মালগুলির জন্য কুলি আর মেলে না। বহু চেষ্টায় সীতেনবাবু একজন কুলি সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন পাঁচ টাকা মজুরীতে। কেবলমাত্র দু'তিনজন হাঁটতে অক্ষম মহিলা ব্যতীত এই দেড় মাইল পথটুকু চলেছেন সকলেই পয়দলে। তিনজন মহিলার জন্য কাণ্ডী ভাড়া করা হল। ভৈরবঘাঁটি নামের সঙ্গে চড়াই-উৎরাই-এর দুর্গমতা যেন একটি চিরন্তন যোগসূত্রে বাঁধা। অমরনাথ, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী সব পথেই ভৈরব-ঘাঁটির চড়াই-উৎরাই দেবদর্শনের পূর্বে বেশ একটু তপস্যা করিয়ে নেয়। আর তার বিনিময়েই দর্শনের আনন্দ হয়ে ওঠে উপভোগ্য। ভৈরবঘাঁটির দেড় মাইল পথ চড়াই-উৎরাই। প্রথমে টানা উৎরাই জাড্‌গঙ্গা পর্যন্ত, তারপর দুস্তর চড়াই।

পাঁচ

॥ ভৈরবঘাঁটি ॥

১৭ই মে ১১-৪৫ মিনিটে লংকা হতে রওনা হয়ে আমরা এখন চলেছি উৎরাই পথে জাড্‌গঙ্গা বা জহ্নু গঙ্গার দিকে একটি গিরিগাত্রের সূত্র-পথ ধরে পায়েব নীচে প্রস্তরখণ্ডের অন্তরালে বেগবতী ভাগীরথীর উন্মাদনা লক্ষ্য করে। কুলি সংগ্রহে বিলম্ব হওয়ায় আমাদের পূর্বে অনেকেই রওনা হয়ে এসেছেন। পথের মাঝে দেখা হল শ্রীমতী বীণাপাণি চক্রবর্তীর সঙ্গে, ধীরে মন্থরে বিশ্রাম নিয়ে পথ চলেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাক্ষাৎ হল একটি সংকটময় উৎরাইপথে ধীব পদক্ষেপে অবতবণরতা শ্রীমতী পারুল মল্লিকের সাথে। এক কামরার সহযাত্রী হিসাবে তিনি একটু অধিকারগত দাবী নিয়ে আহ্বান জানালেন এই পথটিতে অপেক্ষা কবতে। তাঁর নিরাপদ অবতরণের পব এগিয়ে পড়লুম সামনের দিকে। লংকা হতে ভৈরবঘাঁটির দূরত্ব দেড় মাইল। এইভাবে উৎরাইপথে চলতে চলতে পৌঁছে গেলুম জাড্‌গঙ্গার লৌহসেতু। পাথরে পাথরে মাতামাতি করে বাম পার্শ্ব হতে ভীম গর্জনে অবতরণ করছে জাড্‌গঙ্গা ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হবার আশায়। সে উত্তাল তরঙ্গরাশির উচ্ছ্বসিত রূপ দর্শনের জন্য প্রত্যেক পদযাত্রীকে সেতু পারাপারকালে ক্ষণেকের জন্যও দাঁড়াতে হবে স্তব্ধ হয়ে। এরূপ কিংবদন্তী যে, এখানেই ছিল জহ্নুমুনির আশ্রম। দক্ষিণপার্শ্বেও প্রায় ২৫০০´ ফুট নীচে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্যা হয়ে ছুটে চলেছে ভাগীরথী। সেতু পার হয়ে সামনেই ভৈরবঘাঁটির সংকটসংকুল উত্তুঙ্গ চড়াই। সেই কঠিন চড়াইপথে ধীরে ধীরে উঠে চলেছি সকলে। চড়াইটা ১৫০০´ ফুটের কম নয়। তারপর আঁকা-বাঁকা পথ। সে পথ আরোহণ কালে অতলস্পর্শী খাদের দিকে দৃষ্টি দিলে মাথা টলে পড়ার ভয় আছে। মাঝপথে

আবার উচ্চ পর্বতশীর্ষ হতে বেগবান বায়ুতাড়িত ছোট-বড় প্রস্তরখণ্ড ঝরে পড়ছে মাথার ওপর। কোনরূপে দ্রুতপদে কষ্টদায়ক চড়াই পথটি অতিক্রম করে ৯৩০০´ ফুট উচ্চ ভৈরবঘাঁটি উপত্যকায় পৌঁছে গেলুম বেলা ২-২০ মিনিটে।

ভৈরবঘাঁটি একটি মনোরম উপত্যকা। চতুর্দিক জনচিহ্নহীন, কিন্তু চীরগাছের শোভায় সমৃদ্ধ। এখানে-সেখানে বন-বাগান, তারই ফাঁকে ফাঁকে ছবির মত এক একটি সরকারী বাংলো ছড়ানো। এখানে পূর্বদিকের গঙ্গার প্রবাহ দক্ষিণ ঘুরে আবার পশ্চিম-উত্তরে বাঁক নিয়েছে। ফলে এই পর্বতের তিনদিকেই গঙ্গা। সত্যই ভৈরবঘাঁটির দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। ইতিমধ্যে কালীকমলীর ধরমশালার দোতলায় একটি ছোট কামরায় আমরা চারজন সহযাত্রী—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, কেশবকিঙ্কর মুখার্জি ও সুধীন চ্যাটার্জি ঠাঁই করে নিয়েছি। সীতেনবাবু ও মিঃ গুপ্ত বাইরের বারান্দায়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বৃন্দাবন হতে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের একজন সাধু এসে আশ্রয় নিলেন সীতেন-বাবুদের পাশেই। কথায় কথায় জানলুম তিনি সন্তদাস বাবাজীর শিষ্য। তাঁর কাছে গোমুখ যাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি আশ্বাস দিলেন গঙ্গোত্রীতে ব্যবস্থা করে দেবার। বামপার্শ্বের ঘরগুলি মহিলা-যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট। কেবলমাত্র তাঁদের মাঝে স্থান পেয়েছেন কাশীনাথবাবু ও পুলক কুণ্ডু। মধ্যে ওঠানামার কাঠের সিঁড়িটি কেদার পথে গুপ্তকাশীর সিঁড়ির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গঙ্গোত্রী-পথে ভৈরবঘাঁটির শীতও উপেক্ষণীয় নয়। আসলে ভৈরবঘাঁটি একটি পর্বতচূড়া—সেখানেই ধরমশালা। সম্মুখ প্রাঙ্গণে ভৈরবনাথের মন্দির। মন্দিরটি বেশ প্রাচীন। সকাল-সন্ধ্যা পুজারতি হয়। যাত্রীরা যাতায়াতের পথে দেবাদিদেবকে প্রণাম জানাচ্ছেন ও প্রণামী দিচ্ছেন। যমুনোত্রী পথের ভৈরবঘাঁটির চেয়ে গঙ্গোত্রীর ভৈরবঘাঁটি বেশ জমজমাট। কারণ, এখান হতে গঙ্গোত্রীর দূরত্ব ৬½ মাইলের কম নয়। যাত্রীরা এখানে রাত্রিযাপন করে প্রত্যূষেই গঙ্গোত্রী রওনা

হয়ে যান। আর যমুনোত্রীর দূরত্ব সেখানকার ভৈরবঘাঁটি হতে মাত্র ১½ মাইল। রাত্রিযাপনের প্রয়োজন হয় না।

যাই হোক, ভৈরবঘাঁটিতে সারি সারি চা-বিস্কুট, জিলিপী, পকৌরী ও ঝুরিভাজার দোকান। যাত্রীরা পেঁাছেই যার যা ইচ্ছা উদরস্থ করে নিচ্ছেন। তাছাড়া আছে একটি মুদিখানা সহ মনোহারী। প্রয়োজনীয় সবকিছুই মেলে। ধরমশালা প্রাঙ্গণের দু'পাশে দুটি জলের কল। পশ্চাতেই সারি সারি চারটি স্যানিটারী শৌচাগার। সেখানেও একটি জলের কল। ধরমশালার মধ্যবর্তী সিঁড়িটি যেমন পুরুষ ও মহিলাযাত্রীদের পৃথক করে রেখেছে তেমনি দু'পাশ দিয়ে শৌচাগারে যাবার দুটি পৃথক পথও রয়েছে। মোটকথা, যমুনোত্রী যাত্রাপথে ফুলচটিতে ছিল যেমন একটি সুষ্ঠু বাসোপযোগী ব্যবস্থা, এখানেও সেইরূপ। ধরমশালার নীচেই দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছোট একটি কামরায় স্বাস্থ্যবিভাগের প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র। সারাদিনের বাসযাত্রার ক্লান্তি অপনোদনের জন্য হিমশীতল কলের জলে গা-হাত-পা ও মস্তকটি বেশ করে ধৌত করে সুস্থ হলুম। যার যেখানে ব্যথা। ততক্ষণে ডালিয়া চলে গেছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কম্পাউণ্ডারের সাহায্যে তার গোড়ালি দুটিতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধাতে। যমুনোত্রীর উঁচু-নীচু পথে জুতাপায়ে চলায় অনভ্যাসের ফলে তার গোড়ালি দুটিতে হয়েছিল ফোস্কা, এখন ক্ষতে পরিণত; সে দুটির তদ্বিরে সর্বদাই তাকে সচেষ্ট থাকতে হয়েছে গোমুখ যাবার প্রাক্-প্রস্তুতিরূপে। শীতের প্রকোপে আমার গলার ব্যথাটাও বেশ বেড়েছে, তারও একটা ব্যবস্থা করতে হল। শৈলেনবাবু কয়েকদিন হতেই আমাশয় ও বাতের ব্যথায় ভুগছেন। তিনিও কয়েকটি ঔষধ-পত্র নিয়ে নিলেন। দশ পয়সা ফী দিয়ে টিকিট করলেই প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র হতে সবরকম ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। যাতায়াতের পথে এগুলি যে কত মূল্যবান তা ভৈরবঘাঁটির মত পার্বত্য অঞ্চলে না এলে ধারণা করা কঠিন। সুতরাং যার যতটুকু প্রয়োজন সে সুযোগ গ্রহণের ত্রুটি করেন নি কেউ।

হোল্ডল্ খুলে জিনিসপত্র গুছিয়ে ধরমশালার বাইরে পথের ধারে এসে দাঁড়ালুম।

সন্ধ্যাগমে আর বিলম্ব নাই। শুধু পাহাড় আর পাইন-দেওদারের গাছ। অদূরে তুষারাচ্ছন্ন পর্বতশীর্ষে অস্তরবির শেষরশ্মি এখনও মিলিয়ে যায় নি। রঙের খেলা শুরু হল। হিমানী পর্বতের শিখরে শিখরে গোলাপী রঙ। মেঘগুলি তাদের মাথায় এসে আবার জড়িয়ে যাচ্ছে—সে রঙের দ্যুতি লাগছে মেঘের কিনারে কিনারে। নিকটবর্তী পাহাড়গুলি দেওদার ও চীরবনে শোভিত হয়ে কৃষ্ণাভ রূপ ধারণ করে যেন স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে রাখীবন্ধন সৃষ্টি করেছে। এ দৃশ্য সমতলবাসীর মনে চমক্ লাগিয়ে দেয়। ক্রমে সন্ধ্যাব ধূসব ছায়া পর্বতশীর্ষ হতে ধীরে ধীরে নেমে এল ভৈরবঘাঁটির বুকে। সেই সঙ্গে শীতের প্রকোপও বৃদ্ধি পেতে লাগল। শীতবস্ত্র ব্যবহারেব আতিশয্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ভৈরবঘাঁটির আশেপাশে গন্ধক পাহাড়, এজন্য এখানে শীত কম। এ যদি কম শীতেব লক্ষণ হয়তো বেশী শীতে কি অবস্থা তা কল্পনার অতীত। ফিরে এলুম মন্দিরসংলগ্ন চত্বরে। বৈকাল হতেই ধরমশালার সম্মুখস্থ একটি চায়ের দোকানে সিঁড়ির ধাপে সতরঞ্চি বিছিয়ে চুল্লীর ঈষৎ অগ্ন্যুত্তাপে আরাম করছেন শ্রীমতী দূর্বা ব্যানার্জি ও ভগ্নিদ্বয়। সেখানে একপাশে উপবিষ্ট হয়ে বেশ আরাম উপভোগ করলুম। ভৈরবঘাঁটির চায়ের দোকানে অনির্বাণ এই চুল্লীগুলি। সেখানে সকাল-সন্ধ্যা সকল সময়েই যাত্রীর ভিড় জমে আছে। দোকানটির মালিক বিষাণ সিং পাঞ্জাব প্রদেশের লোক। তার সহজ, সরল ও মধুর ব্যবহারে সকলেই ছিলুম মুগ্ধ। শুধু তাই কেন—যাতায়াতের পথে যে কয়জন পাহাড়ী অঞ্চলের লোকের সাহচর্য লাভ ঘটেছিল তাদের সকলের আচরণই আমাদের মুগ্ধ করেছিল। সমতলবাসীর মত জটিল জীবন-সমস্যায় তাদের মন কণ্টকিত নয়। সহজ সরল জীবনকে আজও তারা বক্রদৃষ্টিতে দেখতে শেখেনি। সকল ৬টা হতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত

হাসিমুখে বিষাণ সিং গরম জল বিতরণ করে চলেছে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে।

শীতপ্রধান দেশে গরম জলের চাহিদা যে কত মূল্যবান তা বোঝা শক্ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীদের। ব্যক্তিগতভাবে গলার ব্যথার তাগিদে ও প্রত্যূষে শৌচে যাবার জন্য তাব কাছে সকাল সন্ধ্যা জলেব প্রার্থী ছিলুম। এভাবে তাব সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অনেক সুখ-দুঃখের কথা বলেছে সে। সুদূর পাঞ্জাব হতে এখানে এসেছে পেটের দায়ে, তাও ছ'মাসের বেশী চলে না এই ভৈরবঘাঁটির দোকান। সেপ্টেম্বরের শেষেই নেমে যেতে হবে নীচে। এখন দৈনিক তার গড় বিক্রয় ৩০৲ টাকার মত। তাও সবদিন হয় না। দুর্গম-পথের যাত্রী হিসাবেই তাই বিষাণ সিংদের মত মানুষদের ভুলতে পারি না। জীবনেব স্মৃতির পাতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকে তাদেব কথা। উঠে এলুম ধরমশালায়। ইতিমধ্যে গোমুখ প্রত্যাবৃত কয়েকজন যাত্রী এলেন সিঁড়ির পাশের কামরাটিতে। আমাদের টুরিস্ট কোচের সকল যাত্রীই স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে উৎসুক হয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন গোমুখের বিপদসংকুল পথের কথা। বিশেষ করে গঙ্গোত্রী যাত্রাপথে গোমুখ দর্শনের পরিকল্পনা যাঁরা মাথায় নিয়ে এসেছেন তাঁরা স্বভাবতঃই চাক্ষুষ গোমুখদর্শীর মুখে পথের ভয়ালতার বিবরণ শ্রবণে উৎসুক। প্রত্যাগতদের একজন উত্তেজিত হয়ে বলতে শুরু করলেন "যাবেন না মশায় যাবেন না। বিশেষ করে মেয়েদের নিয়ে—তাহলে পথেই তাঁদের রেখে আসতে হবে। আমার তো ভূজবাসায় সাধুর গুহায় রাত্রিবাসকালে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণ যায় আর কি।" তাঁদের মুখে নিরাশার বাণী শুনেও আমাদের মধ্যে যাঁরা গোমুখ যাত্রার জন্য দৃঢ়সংকল্প তাঁরা কেউ হতাশ হয়ে পড়লেন না। অবশ্য দু'একখানি ভ্রমণকাহিনীতে গোমুখ পথের বিপদসংকুলতার যে বর্ণনা আছে তা রীতিমত চাঞ্চল্যকর। এসব সত্ত্বেও আমাদের কয়েকজন গোমুখ যাত্রার সংকল্পে ছিলুম অটল। নৈশভোজনের পর্ব

শুরু হল। শীতের প্রকোপও বেড়ে চলল। রীতিমত গরম জল ব্যবহার আরম্ভ হয়ে গেছে। রাত্রে ছ'খানি র‍্যাগ কাজে লাগাতে হ'ল। তবে কেদার বা অমরনাথ পথের শীত এখনও কোথাও ভোগ করতে হয় নি।

॥ গঙ্গোত্রী ॥

১৮ই মে সকাল ৬-৩০ মিনিটে ভৈরবঘাঁটি ছেড়ে সামান্য চড়াই হেঁটে, হাতের মালগুলি নিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে উপস্থিত হলুম একটি সমতলে। হোল্ডল্‌গুলি আসছে কুলির পিঠে। রৌদ্রকরোজ্জ্বল নির্মল আকাশ। গভীর খাতে গঙ্গার পাথার যেন অরণ্যগর্ভ হতে গুঞ্জরিত। ছ'মিনিটের মধ্যেই বামপার্শ্বে নেলাং-এর নির্মীয়মান গিরিপথ। ভৈরবঘাঁটির অপর প্রান্তে লংকার সঙ্গে পথটি যুক্ত হলেই ভৈরবঘাঁটি চড়াই-উৎরাই পর্বের হবে চির অবসান। তখন বদরীনারায়ণের মত বাস চলবে একটানা ঋষিকেশ হতে গঙ্গোত্রী। ভৈরবঘাঁটি হতে গঙ্গোত্রী একখানি বাসই যাতায়াত করে দিনে অন্ততঃ চারবার। যান্ত্রিক গোলযোগ হেতু গঙ্গোত্রী হতে বাসটির ফিরতে বিলম্ব হল প্রায় তিন ঘণ্টা। ইতিমধ্যে কেউ কেউ এই ছয় মাইল পথ পয়দলে যাত্রা করলেন। এঁদের মধ্যে সীতেনবাবু ছিলেন অন্যতম। তাঁর মালগুলি রেখে তিনি রওনা হয়ে গেলেন। অবশিষ্ট যাত্রীরা পাইনগাছের মধুর হাওয়ায় গল্পগুজবে সময় অতিবাহিত করতে লাগলেন। পাইনের মর্মর শ্বাসের সঙ্গে গঙ্গার কলকণ্ঠ আর দক্ষিণের খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল মনকে তন্ময় করে রেখেছিল। ৯-৩০ মিনিটে বাসখানি এসে পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গে ওঠার জন্য যাত্রীদের ভীড় জমে গেল। হিসাবমত যাত্রী নিয়ে বাসখানি ১৫ মিনিটের মধ্যেই চলতে শুরু করল। মাত্র ছয় মাইলের সামান্য কিছু বেশী পথ। এ পথটুকু ৬৫০´ ফুট চড়াই। উঠেছে ধীরে ধীরে সুসমতলভাবে। বাসে বসে অনুভব হচ্ছে না যে, চড়াই পথে উঠে চলেছি।

একদিকে পাহাড় আর একদিকে গঙ্গা। রাস্তা থেকে নুড়ি আর পাথরের পাড় গিয়ে মিশেছে গঙ্গায়। এইভাবে ৪৫ মিনিট চলার পর বাসখানি ১০-১৫ মিনিটে গঙ্গোত্রীর সীমায় এসে পেঁৗছে গেল ৯৯৫০´ ফুটের মাথায়। দেহ-মনে একটি আনন্দের শিহরণ জাগল। ত্রিভুবন-তারিণী পতিতোদ্ধারিণীব উৎসধারা দর্শন ও স্পর্শন করতে পাব এই আশায়। হাতের মালগুলি নিয়ে বাস থেকে অবতরণ মাত্র দৃষ্টিগোচর হল সম্মুখে পর্বতশীর্ষে উপবিষ্ট তুষারমণ্ডিত যেন এক তপস্বী মূর্তি। শঙ্করমৌলিনিবাসিনীকে ধরাধামে আনয়নের জন্য তিনি যেন দুশ্চর তপস্যায় রত। গঙ্গোত্রী পেঁৗছবামাত্র ধ্যানমগ্ন এরূপ এক তুষার-তপস্বীকে দেখে সকলেই বিস্মিত ও আনন্দিত। গঙ্গার তীরে তীরে সাধুদের কুঠিয়া কোথাওবা পাকা ইমারৎ। সামান্য চড়াই ভেঙে হাতের মালগুলি নিয়ে গঙ্গাতীরে গঙ্গোত্রী মন্দিরের বামপার্শ্বে কালীকমলীর ধরমশালার দিকে এগিয়ে চললুম সকলেই। ধরমশালার বাসোপযোগী দু'খানি ঘরই মহিলাদের দখলে চলে গেছে। এসব ব্যাপারে কুণ্ডু স্পেশ্যাল কর্তৃপক্ষের একটু অসম দৃষ্টি আছে। মূল ধরমশালা হতে বেশ কিছুটা ব্যবধানে পাঞ্জাবী ছত্রে আশ্রয় পেয়েছেন সীতেনবাবু, সরলবাবু ও পিল্লাই, সেই সঙ্গে কালনা হতে আগত অবনীবাবুরা তিনজন। আমরা কয়েকজন স্থান পেয়েছিলাম দীর্ঘ গুহার মত একটি ঘরে। শীতের দেশ বলে তেমন কিছু অসুবিধা হয় নি। গঙ্গোত্রী পেঁৗছেই ভগ্নিদ্বয় সহ দূর্বা ব্যানার্জী অনুমতি পত্রে থানা অফিসারের স্বাক্ষর নিয়ে একজন কুলিসহ রওনা হয়ে গেলেন গোমুখের পথে। ভূজবাসায় স্বামীজীর আশ্রমে রাত্রিযাপন করে পরের দিন প্রত্যুষেই তাঁরা গোমুখ দর্শনে, যাত্রা করবেন।

গঙ্গোত্রী প্রধানতঃ একটি অনুন্নত ভূখণ্ড। ভাগীরথীর উৎসলোক। যোগ-তপস্যার উপযুক্ত ক্ষেত্র। ধ্যানভঙ্গ হবার কোন উপলক্ষ্য বা কোন আকর্ষণ নাই এখানে। ধরমশালার দক্ষিণ পার দিয়ে রেলিংঘেরা

পথ। সেটি ধীরে ধীরে নেমে গেছে মন্দিরের দিকে। ধরমশালার ৫০ ফুট নীচেই গঙ্গোত্রী মন্দির। আমাদের কামরাটির সমান্তরাল রেখায় মন্দিরচূড়া। চূড়ার উপর পিতলের কলস আর ত্রিশূল, রৌদ্রকিরণে জ্বল্ জ্বল্ করছে। মন্দিরচত্বর অতিক্রম করে আরও ১০´ ফুট নীচে ৬।৭ মিনিটের মধ্যে প্রাচীরের মত পাশাপাশি দুটি বিরাট প্রস্তরের খাত বেয়ে নেমে আসছে জলধারা। চলেছে দুলে-দুলে ফুলে-ফুলে পনেরশো সাতান্ন মাইল দূরে সাগরসঙ্গম সৃষ্টি করতে। এখানকার এই ত্রিশ-বত্রিশ ফুট জলধারাই আবার সাগরে মিশে কয়েক মাইল বিস্তৃত হয়েছে। কঠিন দুটি প্রস্তরের মধ্যবর্তী পথে জলধারা এভাবে প্রবাহিত না হলে গঙ্গার গতিপথের কোন স্থিরতা থাকত না। প্রাকৃতিক নিয়মেই তাই এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা। ভগীরথশিলা হতে এখন গঙ্গা চলে গেছে ৬।৭ মিনিট দূরে। মতান্তরে ভগীরথশিলার উপরই মন্দিরটি নির্মিত। জিনিসপত্র গুছিয়ে ১১টার মধ্যে মন্দির-পথেব বাহিরে কলের জলে স্নান সেরে নিলুম। ফেরার পথে দেখে এলুম গঙ্গাদেবীর মন্দির পার্শ্বেই তীর্থযাত্রীদের জন্য বাজার। ব্যাপারীরা মালপত্র আমদানী করে উত্তরকাশী, ভাটোয়ারী ও হরশিল থেকে। রয়েছে খাবার দোকান, মনোহারী প্রভৃতি। ছোটর মধ্যে বাজার মন্দ নয়। যাত্রীরা দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন গঙ্গোত্রীর নিদর্শন হিসাবে কিছু কেনাকাটার ইচ্ছায়। স্নান সেরে পূজার জন্য নেমে এলুম মন্দিরচত্বরে। মন্দির বড় নয়, বিরাট উঁচুও নয় কিন্তু অঙ্গন ও চত্বর বেশ প্রশস্ত। এই সমতল অংশটির নামই ভাগীরথশিলা। মন্দিরটি কবে কোন্ যুগে এই শিলার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বা কে এর প্রতিষ্ঠাতা—সে ইতিহাস কারো জানা নাই। এখনকার এই মন্দিরটি জয়পুরের রাজা নির্মাণ করেছেন। গোমুখের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে গঙ্গোত্রী-মন্দির।

॥ গঙ্গোত্রী-মন্দির ॥

চত্বরের সামনে চারটি গোল স্তম্ভ—কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে গর্ভমন্দির বা মণ্ডপ। পাথরের স্তম্ভ, পাথরের সিঁড়ি, দেওয়াল, ছাদ, সবই পাথরের। গর্ভমন্দিরে উপবিষ্ট হয়ে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ সহ পূজারীর সাহায্যে গঙ্গাপূজা করলুম। এখানে মন্দিরদ্বার সর্বদা উন্মুক্ত। মন্দিরাভ্যন্তরে বেদীর উপর প্রস্তরনির্মিত সুবৃহৎ গঙ্গামূর্তি। ডাইনে যমুনা, বামে সরস্বতী; সেই সঙ্গে স্থান পেয়েছেন লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা ও শঙ্করমূর্তি। সম্মুখে যোড়হস্তে দণ্ডায়মান শান্ত, মহান্ ভগীরথ। ঘৃতের দীপশিখা, ধূপের গন্ধে মন্দির-কক্ষ আমোদিত। পূজারী চরণামৃত বিতরণ করছেন। পূজান্তে কিছু প্রসাদ গ্রহণ করে ফিরে এলুম ধরমশালায়। পুরুষ ও মহিলাযাত্রীদের মধ্যে অনেকেই পূজা সেরে নিয়েছেন আপন আপন অবসরমত। ততক্ষণে প্রথম দফার মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত। ইতস্ততঃ বায়ু সঞ্চালিত হয়ে গঙ্গোত্রীতে চতুর্দিকে ধুলা, বালি ওড়ে সর্বক্ষণ—তাই হাতে হাতে থালা নিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর্ব সমাপ্ত করলুম। বিশ্রামের পর বৈকাল পাঁচটায় গঙ্গার পূর্ব ও পশ্চিম তীরবর্তী সাধুদের কুঠিয়া ও আশ্রম দর্শনে যাত্রা করলুম। গঙ্গোত্রীতে তপস্বী ভারতের মূল সত্যকে আজও অনেকটা চেনা যায়। যা সম্ভব নয়, কেদারবদরী বা অমরনাথে। এখান হতেই গঙ্গা ধরাতলে অবতীর্ণা। স্বর্গ ও মর্ত্যের সন্ধিলোক গঙ্গোত্রী। গঙ্গার পূর্ব ও পশ্চিম পারে সংসার-বিবিক্ত রিক্ত তপস্বী যাঁরা বসে রয়েছেন যোগসাধনায় আপন আপন আশ্রম ও কুটিরে তাঁদের সেই বীজমন্ত্র বহন করে শিবজটাচ্যুতা এই দিশাহারা গঙ্গা চলেছে সমতলের দিকে। সেই সমতলেরই একদল অধিবাসী চলেছি ঐসব যোগী-তপস্বীদের দর্শনার্থে ও প্রণাম জানাতে। মন্দিরচত্বর অতিক্রম করে রাস্তা। তারপর পাথর ও বালির ওপর দিয়ে নেমে এসে একটা কাঠের সেতু পার হয়ে চলেছি পূর্বমুখে। কিছুদূর অগ্রসর হয়েই কেদারগঙ্গা ও গঙ্গার ধারাটি যেখানে ত্রিকোণ হয়ে মিশেছে সেই সংযোগস্থলে আর

একটি কাঠের সেতু পার হয়ে চলে এলুম দণ্ডীস্বামীর আশ্রম। কেদার-শৃঙ্গ হতে নেমে এসেছে কেদারগঙ্গা। পাহাড়গুলির পশ্চাতেই কেদার-শিখর। এই কেদারগঙ্গা ধরে গেলে এখান থেকে দু'তিন দিনেই পৌঁছান যায় কেদারনাথ। তবে সে পথে কচিৎ সাধুসন্তরা যাতায়াত করে থাকেন। চির-তুষারাচ্ছন্ন দুর্গম গিরিপথ মানুষের অগম্য। এপারে পাহাড়টা দূরে তাই সমতলের আয়তন ওপার থেকে বেশী। সেখানে কয়েকখানা পাকা ঘরবাড়ী উঠেছে। সরকারী ডাকবাংলা, দাতব্য চিকিৎসালয়, ডাকঘর প্রভৃতি। এখান হতে ২।৩ মিনিটের ব্যবধানে বেশ প্রশস্ত স্থানে প্রস্তরনির্মিত অনেকগুলি গৃহযুক্ত দণ্ডীস্বামীর আশ্রম। একটি চিকিৎসালয়ও আছে। গিয়ে দেখি ডালিয়া ও তার মা পূর্বসূচী আশ্রমে এসে স্বামিজীর সঙ্গে আলাপ করে একখানি এ্যাল্‌বাম দেখছে। ইতিমধ্যে বেহালা হতে আগত কেশববাবু ও সুধীনবাবু এসে গেলেন আশ্রমে। সকলে মিলে আশ্রমস্থ দেবদেবী দর্শন করে চলে এলুম। সুধীনবাবু ও কেশববাবু চলে গেলেন অন্য পথে, ডালিয়া ও তার মা চলে গেল ধরমশালা অভিমুখে। গঙ্গার নদীশয্যা ধরে চলেছি পশ্চিম তীরবর্তী সাধুদের আশ্রমগুলি দর্শনে। এমন সময় রবিবাবু ও আমাদের ছড়িদার চলে এল সেই পথে। উঁচু নীচু পথ বেয়ে উঠলুম আর একটি আশ্রমে। থাকেন একজন নগ্ন সাধক রামানন্দ অবধূত (ছোট)—ক্ষুদ্র একটি কুঠিয়ায়। ভস্মাচ্ছাদিত দেহ, ধুনির সামনে উপবিষ্ট। সহজ, সুন্দর ও সাবলীল তাঁর ব্যবহার। সেখান হতে আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়ে চলে এলুম এক মৌনী সাধুর আশ্রমে—সম্মুখে সংরক্ষিত একখানি শ্লেটে যার যা বক্তব্য লিখে জানালেই উত্তর দিচ্ছেন সাধুজী। আমাদের দলের যাত্রী শ্রীমতী আরতি সরকার ছড়িদারের মাধ্যমে হিন্দীতে লিখে জানতে চাইল: "আগামীকাল আমাদের গোমুখ যাত্রা সফল হবে কি না?" উত্তরে সাধুজী লিখে জানালেন, "এরূপ বায়ুপ্রবাহ থাকলে নয়"। অবশ্য সেদিন বৈকাল হতেই গঙ্গোত্রীতে

ছিল একটা দম্‌কা বাতাস। সেখান হতে প্রত্যাবর্তন পথে কেদারগঙ্গা ও ভাগীরথীর ঠিক সংযোগস্থলে দেখে এলুম এক প্রসিদ্ধ মৌনী তপস্বীর আশ্রম, নাম—শ্রীকৃষ্ণাশ্রম। এখন তিনি স্থূল দেহে নাই। তবে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী পর্যটক ও তপস্বীদের মুখে মুখে। এঁর বয়স কত কেউ জানতো না। তিনশ' বছর শুনলেও বিশ্বাস করতো অনেকেই। মৌনী ও নগ্ন থাকতেন তিনি। স্বাস্থ্য ছিল যেমন বন্য মহিষের মত, বর্ণও ছিল তদ্রূপ। এঁর সম্বন্ধে বহু কথা ও কাহিনী হিমালয়-পর্যটকদের মধ্যে প্রচলিত আছে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কাশী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য এঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন গাড়ীতে তুলে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে রামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক সন্ন্যাসী গঙ্গোত্রীতে তপস্যায় গিয়ে শ্রীকৃষ্ণাশ্রমকে দর্শন করে এসে বলেছিলেন, "শাস্ত্রে এঁদের 'জাতরূপধর' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সদ্যোজাত শিশুর যেমন মাতৃ-নির্ভরতাই সম্বল—এঁরাও তেমনি ঈশ্বর বা জগন্মাতার ক্রোড়ে একান্ত নির্ভরতায় অবস্থান করেন। নিজেদের কর্মপ্রচেষ্টা কিছুই থাকে না।" এ হেন উচ্চাবস্থার একজন বিরল সাধুর চতুর্দিক রুদ্ধ বাসগৃহখানি প্রদক্ষিণ করে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফিরে এলুম ধরমশালায়। ইতিমধ্যে গঙ্গোত্রী মন্দিরে বেজে উঠেছে সন্ধ্যারাত্রিকের গাড়োয়ালী বাদ্য। ধরমশালার পুরুষ ও মহিলাযাত্রীরা অনেকেই দ্রুতপদে অবতরণ করছেন মন্দির-চত্বরের দিকে। নির্জন উপত্যকা জনসমাগমে হয়ে উঠেছে মুখর। হিম-শীতল বাতাস বইছে। প্রশস্ত গর্ভমন্দিরে সকল যাত্রীই সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে। ঢোল, কাঁসর ও ঘণ্টার তালে তালে প্রধান পুরোহিত মশাল জ্বেলে আরতি শুরু করলেন। মন্দির বাহিরেও মশাল হস্তে ঘুরে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে গঙ্গাস্তোত্র ও ভজন শুরু হল। জনবিরল মন্দির-প্রকোষ্ঠে সমতালে উচ্চারিত স্তোত্র ও ভজন সঙ্গীতের মূর্ছনা সমবেত দর্শকচিত্তে একটি ভাবমধুর পরিবেশ সৃষ্টি করল। আরতি অন্তে মন্দির-চত্বর অতিক্রম করে ধীর পদক্ষেপে

উঠে চলেছি ধরমশালা অভিমুখে আর ভাবছি একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকার কথা "মহাদেবের কণ্ঠনিঃসৃত মহাসঙ্গীতে দ্রবীভূত বিষ্ণুই গঙ্গা"। সেই গঙ্গার জন্মভূমি গোমুখ দর্শনে স্ত্রী-পুরুষ অনেকেই আগ্রহী। মধ্যাহ্নকাল হতেই চলেছে তার উদ্যোগ-পর্ব। কুণ্ডু স্পেশ্যালের দায়িত্ব শেষ গঙ্গোত্রীতে। গোমুখ যাত্রার যাবতীয় ব্যয়-ভার বহন করতে হবে দর্শনেচ্ছু যাত্রীদের। অবশ্য কুলি, পথপ্রদর্শক ও খাদ্যাদির ব্যবস্থা যা-কিছু প্রয়োজন সবই সংগ্রহ করে দেবেন কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্তৃপক্ষ। এ্যাসিষ্টেন্ট ম্যানেজার রবিবাবু এ পথের অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তিনি ইতিপূর্বে গোমুখ গেছেন দু'বার। এবারেও তিনিই আমাদের কর্ণধার। তাঁরই নির্দেশমত তেরজন যাত্রীর মাল বহনের জন্য চারজন কুলি ও একজন পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করা হল। গোমুখ যাতায়াতের পথে জনপ্রতি ৮।১০ কে. জি. হিসাবে কুলিরা মাল বহন করবে মোট ১২০ কে. জি.। অতি প্রত্যূষেই রওনা হবার অভিপ্রায়ে রাত্রেই অনেকে আপন প্রয়োজনমত জিনিসপত্র সহ হোল্ডল্‌গুলি গুছিয়ে রাখলেন। ধরমশালার পাশের কামরায় থানা অফিসে গিয়ে গোমুখ যাত্রার মোট আঠারোখানি অনুমতি পত্রে থানা অফিসারের স্বাক্ষর নিয়ে জনে জনে সেগুলি বিতরণ করে দেওয়া হল। নৈশভোজন সমাপ্ত করে দু'খানি র‍্যাগ জড়িয়ে গঙ্গোত্রীর রাত্রি কেটে গেল।

রাত্রি হতেই উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রস্তুতি-পর্ব হল সমাপ্ত। প্রত্যেকের সঙ্গে গোমুখ যাত্রার ছাড়পত্রখানি আর কুণ্ডু স্পেশ্যাল-প্রদত্ত একটি করে জলখাবারের প্যাকেট। আপন আপন প্রয়োজনমত শীতবস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলুম নয়জন পুরুষ ও পাঁচজন মহিলাযাত্রী গোমুখের দুর্গম পদযাত্রার জন্য। সঙ্গে চারজন কুলি আর হোল্ডল্ সহ জনপ্রতি ৮।১০ কে. জি অবশ্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। পুরুষদের মধ্যে প্রবীণতম পদযাত্রী সত্তর বৎসর বয়স্ক শ্রীগৌরীপ্রসন্ন ব্যানার্জী ও ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক শ্রীসরলকুমার দাস। সেই

সঙ্গে আমরা সাতজন শ্রীকেশবকিংকর মুখার্জী, সুধীন চ্যাটার্জি, সীতেন্দ্রনাথ রায়, পুলক কুণ্ডু, কাশীনাথ মিত্র ও কুণ্ডু স্পেশ্যালের রবিবাবু। মহিলাদের মধ্যে শ্রীমতী ইন্দুবালা সরকার, শৈলবালা ব্যানার্জী, আরতি বসুমল্লিক, আরতি সরকার ও ডালিয়া মল্লিক। ডালিয়াকে বিদায় দেবার প্রাক্কালে মাতৃহৃদয়ের একটি স্নেহকাতর করুণ দৃশ্যে মনটা বিচলিত হয়ে পড়ল। শ্রীমতী মল্লিককে কন্যার নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের মৌখিক আশ্বাস জানিয়ে রওনা হয়ে এলুম। অতি প্রত্যূষে ছটার মধ্যেই বেরিয়ে গেছেন আমাদের আরও চারজন সহযাত্রী শ্রীপতাকীচরণ কুণ্ডু, অবনীকুমার বিশ্বাস, পাঁচুগোপাল পাল ও তারকনাথ ঘোষ। তাঁদের ইচ্ছা গোমুখ দর্শন করে আজই সন্ধ্যায় গঙ্গোত্রী প্রত্যাবর্তন করবেন।

॥ গোমুখ ॥

ফ্লাস্ক ভর্তি জল, পকেট ভর্তি লজেন্স আর স্পাইক দেওয়া লাঠি হাতে ১৮ই মে সকাল ৬-৪৫ মিনিটে চলতে শুরু করলুম চৌদ্দজন যাত্রী দুর্গমতম পথে জাহ্নবীর জন্মভূমি দর্শনে। পশ্চাতে সরলবাবু ও গৌরীপ্রসন্নবাবু সঙ্গে গোমুখের বিখ্যাত পথপ্রদর্শক দিলীপ সিং-এর পুত্র কৃপাল সিং। বহু কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে লোকের মুখে মুখে এই দিলীপ সিং সম্বন্ধে। গোমুখ পথে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কত যাত্রীকে যে সে রক্ষা করেছে তার হিসাব নাই। শব্দ মাত্র শ্রবণে কোন্ পাহাড়ে ধ্বস্ নামছে কিংবা কখন তুষার-ঝড় আসছে তা পূর্বসূচী জ্ঞাত হয়ে যাত্রা বন্ধ করে সে প্রাণরক্ষা করেছে বহু যাত্রীর। এ'সব অনেক কাহিনী জড়িয়ে আছে পথপ্রদর্শক দিলীপ সিং-এর জীবনের সঙ্গে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাবতরণ'-গ্রন্থে বর্ণিত গঙ্গোত্রী হিমবাহ অতিক্রম করে তুষার পথে বদরীনাথ যাত্রাকালে দিলীপ সিং-এর আশ্চর্য ক্ষমতার কথা। "দিলীপ হাত ধরে নিয়ে চলে পাথর থেকে পাথরে। অপর হাতে তার আইস্-অ্যাক্স।

মুখে কোন কথা নেই। শুধু অ্যাক্সের ডগা সামনে এগিয়ে দিয়ে অল্প ইঙ্গিত করে দেখায় কোন্ পাথরের ওপর পা রাখতে হবে। সব পাথরই যেন তার জানাশোনা—এমনি নিঃসংশয়। হঠাৎ আন্‌মনে অন্য ভুল পাথরে পা ফেলতে গেলেই হাতের অল্প টানে সাবধান করে দেয়। তবুও কথা বলে না। মুখে বিরক্তিও ফোটে না। একই সতর্ক গম্ভীরভাব অথচ প্রসন্ন। অদ্ভুত মানুষ।" এখন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ বৃত্তি ত্যাগ করে সে দেশে চাষ-আবাদ নিয়ে ব্যস্ত। তাই তার পুত্র কৃপাল সিং চলেছে আমাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে। চলেছি গঙ্গার দক্ষিণ তীর ধরে, পূর্বে পথ ছিল বাম তীব বরাবর গঙ্গোত্রীতে নদী পার হয়ে। এখন সে পথ বিপদসংকুল। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল গঙ্গোত্রী মন্দিরের চূড়া, মিলিয়ে গেল মন্দিরেব ত্রিশূল আর ধরমশালা। কিছুদূর অগ্রসর হতেই পুলিশ বিভাগের কর্মচারীরা জনে জনে পরীক্ষা করে দেখে নিল গোমুখ যাত্রার ছাড়পত্রগুলি। এগিয়ে চলেছি বন্ধুর পথে। এক মাইলের মধ্যেই গঙ্গাদাস বাবাজীব আশ্রম। থাকেন তুষার-গর্ভে। বিগত ৩০ বৎসরের মধ্যে কখনও আসেন নি এক মাইল পশ্চাতে গঙ্গোত্রীতে। সম্মুখে ক্ষীণ স্বচ্ছসলিলা উপলখণ্ড-প্রহত একটি নির্ঝরিণী বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে গঙ্গায়। হিমালয়ের যে রূপ প্রত্যক্ষ করেছি কেদার আর অমরনাথের পথে —গোমুখের পথে তার সে রূপ নাই। এ এক করালদংষ্ট্রা ভয়াল রূপ। ক্রমেই এগিয়ে চলেছি চড়াই পথে। মাত্র দু'চারজন দর্শনার্থী ছাড়া জীবনের কোন চিহ্ন নাই কোথাও। পথ নির্জন। মাঝে মাঝে কানে আসছে গঙ্গার রুদ্ধ গর্জন। কোথাও মুখব্যাদানরত বিশাল পর্বত মাথার ওপর খাড়া দাঁড়িয়ে তাবই তলদেশ বেয়ে চলে যেতে হচ্ছে 'গুঁড়ি দিয়ে অতি সাবধানে। উচ্চতার জন্য অক্সিজেন কমে আসছে। ব্যাহত হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাস। তুষারের ঘনত্বের তারতম্যে এখানে উত্তাপের কোন স্থিরতা নাই। সৃষ্ট হয় পৃথক পৃথক বায়বীয় চাপের, ফলে হঠাৎ এসে যায় যে কোন মুহূর্তে দমকা বা ঝড়ো হাওয়া।

গতকাল অপরাহ্নে গঙ্গোত্রীতে এ অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় করেছি। দক্ষিণে বিরাট খাদ, সেদিকে দৃষ্টি দিলে মাথা টলে পড়ার সম্ভাবনা। যে সমতল পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের নিত্যকালের পরিচয় তা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। কিন্তু চৌদ্দটি মানুষ এগিয়ে চলেছি—সামনের দিকে এই বিপদ মাথায় নিয়ে কি এক দুর্নিবার আকর্ষণে। যতই বিপদের সম্মুখীন হচ্ছি ততই জেগে উঠছে অন্তরে যেন তাকে জয় কবাব তীব্র অভীপ্সা। এই প্রবৃত্তিই কি মানুষকে যুগে যুগে যুগিয়েছে প্রেরণা অজানাকে জানার অভিসারে? সাক্ষাৎ হল কয়েকজন সেনা বিভাগের কর্মচারীর সঙ্গে, তারাও চলেছে গোমুখ। এ পথে লোক দেখলে মন হয় আশ্বস্ত। কেদাব বা অমরনাথের দুর্গমতাব সঙ্গে এ পথেব দুর্গমতার তুলনা হয় না। এ কথা সত্য, এ পথে নাই চড়াই-উৎরাই-এর অমানুষিক পরিশ্রম কিন্তু আছে মৃত্যুর বিকট ভয়ালতা। মুহূর্তের অসাবধানতায় মানুষ হতে পাবে যে কোন বিপদের সম্মুখীন। প্রকৃতির যে সম্পদ প্রত্যক্ষ করতে চলেছি আমরা সে বড় নিষ্ঠুব। এমন কি তৃষ্ণার্ত মানুষের বারিবিন্দু সংগ্রহেরও কোন উপায় নাই—এ পথে যদি নিজের সম্বল বা সঞ্চয় কিছু না থাকে। অথচ ঘন ঘন তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠাই এ পথের অন্যতম লক্ষণ। এজন্য সঙ্গে প্রয়োজন একটি জলপাত্র। প্রভাতী সূর্যের কিরণসম্পাতে তুষারাচ্ছন্ন পাহাড়ের শীর্ষদেশে শুরু হলো আলো-ছায়ার খেলা। পর্বতগাত্রে শুভ্র তুষারের ওপর সোনালীর অপূর্ব হৈমপ্রভা। জগতে যত রং যেন তার ছড়াছড়ি পাহাড়ের গায়ে-গায়ে। মনে হয় সত্যই দেবলোকে চলেছি। চলে এলুম চীরগাছের জঙ্গলে। দু'পাশে চীরের বন মাঝে সংকীর্ণ পথ। সেই পথ ধরে চলেছি। শিশির-ভেজা চীরপাতার মনমাতানো গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। সহযাত্রী ও কুলিরা এখনও বহুদূরে, সঙ্গে রবিবাবু। দলের অগ্রগামী ব্যক্তি হিসাবে পৌঁছে গেলুম চীরবাসার আশ্রম সন্নিকটে বেলা দশটায় সাত মাইল পথ অতিক্রম করে। উচ্চতা ১১৮৩০´ ফুট। নির্মল আকাশ ও তুষারমুক্ত পথ গোমুখ

যাত্রার অনুকূল পরিবেশ। ভূজবাসায় স্বামিজীর আশ্রমে রাত্রি যাপন করে আগামীকাল গোমুখ যাত্রার পরিকল্পনা ছিল আমাদের। সেটি পরিত্যাগ করে আজই গোমুখ দর্শন করে ভূজবাসায় রাত্রি যাপনের সিদ্ধান্তটি মনে মনে স্থিব করে প্রস্তাবটি অনুমোদন সাপেক্ষে ছায়াঘন চীরগাছের নীচে নিশ্চিন্ত বিশ্রামে গা এলিয়ে দিলুম। গৌরী-বাবু ও সরলবাবু ব্যতীত আধ ঘণ্টার মধ্যেই ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যাত্রীদল একে একে পৌঁছে গেলেন শ্রান্ত-ক্লান্ত পদে চীরবাসায়। আজই গোমুখ যাত্রার সিদ্ধান্তটি উপস্থাপিত করাব সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সম্মতি জ্ঞাপন কবলেন এ প্রস্তাবে। এ্যাসিষ্টেন্ট ম্যানেজার ববিবাবুও খুসী। কুণ্ডু স্পেশ্যাল-প্রদত্ত লুচি, আলুবদম ও বঁদে সহযোগে সকলেই জলযোগ সেরে নিলেন চীরগাছের পাদমূলে।

নবোদ্যমে পথ চলা হল শুরু। চীবগাছে ঘেরা চীরবাসা গেল মিলিয়ে। আরম্ভ হল ভূজগাছের জঙ্গল। আঁকা-বাঁকা তার শাখা। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে সাদা ডালগুলি। গাছের গুঁড়িগুলিও সাদা। চারিদিকে সাদা রঙের খেলা। ছালগুলি মসৃণ কাগজের মত। টেনে তুলতেই পাকে পাকে খুলে আসে। শকুন্তলার যুগে এই ভূর্জপত্রেই প্রিয়জনকে লেখা হতো পত্রাদি। সংস্কৃত সাহিত্যে এর নিদর্শন বহুল। পাশাপাশি জড়িয়ে চীর আর ভূজ। চীরবাসা হতে তিন মাইল পথ ভূজবাসা। চতুর্দিকে নানা আকারের গোলাকার পাথর। সেই সব বড় বড় পাথবে বোঝাই পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে চলেছি সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলে। পাহাড়ের মাথায় সব বরফ। বরফ গলে ঝরণা নেমে এসেছে। ঝরণা মিশেছে গঙ্গার ধারার সঙ্গে। এ'পথের দুর্গমতম পথ চীরবাসা থেকে ভূজবাসা। পর পর দুটি গিলা পাহাড়। দৈর্ঘ্য বিশাল নয়। কিন্তু সংকীর্ণ পথ ঝুরো পাথরের ওপর একেবারে ঢালু হয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে চলে গেছে। অতি সাবধানে পার হতে হচ্ছে—আগে-পিছে কুলি নিয়ে। যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে গড়িয়ে পড়লেই একেবারে ১০,০০০´ ফুট নীচে সলিল সমাধি। যেটুকু

সাবধানতা অবলম্বন করে চলেছি এর বেশী মানুষের অসাধ্য। একজন গতিপথ রোধ করলে পশ্চাতের সকলকেই অপেক্ষা করতে হচ্ছে। একটা পেরিয়ে আবার একটা গিলা পাহাড়। একের পশ্চাতে সারি দিয়ে এগিয়ে চলা। পথের দুর্গমতা যেন ক্রমেই বাড়ছে। দ্বিতীয় গিলা পাহাড়টি অতিক্রমকালে ভয়ের মাত্রা আরও বেড়ে চলেছে, ক্রমে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। নির্জন পথ—আগে-পিছে লোক নাই। তবু চলতে হচ্ছে প্রাণপণ চেষ্টায় সংকীর্ণ বিপদসংকুল ভয়াবহ পথে। পা দুটি অবিরত নীচে সরতে চায়, যে পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলেছি তার গায়ে হাত দিলে সেটিও খসে পড়তে চায়—এরই নাম 'গিলা' বা কাঁচা পাহাড়। পাহাড় দুটি অতিক্রম করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। এবার কিছুটা পথ সমতল। তারপর ভূজবাসা প্রবেশের আরও এক মাইল পূর্বে আবাব শুরু হল বড বড় পাথব বোঝাই অসমতল স্থান—সম্মুখে কোন পথরেখা নাই। পাথরের ওপর পা ফেলে লাফিয়ে লাফিয়ে চলা। পৌঁছে গেলুম ভূজবাসা বেলা ১২-৩০ মিনিটে। উচ্চতা ১২,৪৪০´ ফুট। পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে পড়লুম একটি পথ-নির্দেশক চিহ্ন দেখে। প্রায় ১০০০´ ফুট নীচে সামান্য একটু সমতলে লালবিহারী দাসের আশ্রম—একটি ষ্টীল ফলকে সেটুকুই মুদ্রিত। নেমে গেলুম নীচে সমতলে। নিরাবরণ নিরাভরণ কৌপীন মাত্র সম্বল লালবিহারী দাস এসে দাঁড়ালেন হাসিমুখে প্রয়োজন জানতে। ভাঙা হিন্দীতে সংক্ষেপে জানিয়ে দিলুম আমাদের প্রয়োজনটুকু। সদাপ্রসন্ন মানুষটি সানন্দে সম্মতি জানিয়ে চলে গেলেন নিজ কুঠিয়ার দিকে। টানা দশ মাইল পথ চলে প্রচণ্ড ক্ষুধার তাগিদে প্যাকেটের খাবারগুলির সদ্ব্যবহার শুরু করে দিলুম। সাধুজী লোটা ভর্তি জল নিয়ে এলেন। মালগুলি নিয়ে কুলিদের নীচে আসতে ইঙ্গিত জানালুম। সঙ্গে এল পুলক কুণ্ডু তাদের মালগুলি নিরাপদ স্থানে রাখতে। সাধুজী উন্মুক্ত প্রান্তরেই নিরাপদে মালগুলি রাখার নির্দেশ দিয়ে বললেন, "এখানে চোরের কোন উপদ্রব নাই—মূল্যবান দ্রব্যও উন্মুক্ত স্থানেই রাখতে পার"।

হিমালয়ের নির্জন পার্বত্য অঞ্চল এখনও যে চৌর্যবৃত্তিমুক্ত এ কথা শুনতে ভাল লাগল। অবাঞ্ছিত শীতবস্ত্রগুলি হোল্ডলের উপর রেখে সাময়িক বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি এমন সময় রবিবাবু পৌঁছলেন আশ্রমে লালবিহারীরীজিকে আমাদের চৌদ্দজনের রাত্রি-বাসের কথা জানাতে। ব্যস্ত হয়ে সাধুজী কয়েকখানি মোটা রুটি আমাদের কুলিদের হাতে দিলেন। তারপর চা-পর্ব শুরু হল। পুলক কুণ্ডু চড়াই ভেঙে চলে গেল গোমুখের পথে। ততক্ষণে সহযাত্রী পুরুষ ও মহিলারা গোমুখের যাত্রাপথে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। রবিবাবুও চলে গেলেন। ইতিমধ্যে গোমুখ-প্রত্যাবৃত দুজন সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত হলেন আশ্রমে। লালবিহারীজী তাঁদের মধ্যাহ্ন ভোজনের আপ্যায়ন জানিয়ে বললেন, "আহার্য দ্রব্য প্রস্তুত"। ভূজবাসার আশ্রম হতে চড়াই ভেঙে চলে এলুম গোমুখ যাত্রার পথটিতে। সাধুজী ৫-৩০ মিনিটের মধ্যে আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের কথা জানিয়ে দিলেন—বিদায় নেবার প্রাক্কালে। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল ভূজবাসার আশ্রম।

ভূজবাসা হতে গোমুখ দু'মাইল পথ। কিন্তু প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড-পূর্ণ বন্ধুর দু'মাইল পাথরের উপর পদক্ষেপ করে চলতে হচ্ছে। কখনো দুটি প্রস্তরের মধ্যবর্তী শূন্যগর্ভে জুতাসহ পায়ের গোড়ালি প্রবেশ করে এক নূতন উপসর্গ সৃষ্টি করছে। এ'সব উপেক্ষা করেই এগিয়ে চলেছি চৌদ্দটি প্রাণী ও আগে-পিছে দুজন কুলি। গৌরীশঙ্করবাবু ও সরলবাবু আসছেন কৃপাল সিং-এর সঙ্গে। আজ আর তাঁদের পক্ষে গোমুখ পৌঁছান সম্ভব নয়। কিছুদূর অগ্রসর হয়েই সাক্ষাৎ হল প্রত্যাবর্তন পথে শ্রীপতাকীচরণ কুণ্ডু সহ তিনজনের সঙ্গে। ফিরে চলেছেন দর্শন ও স্নানান্তে গঙ্গোত্রী অভিমুখে। তাঁদের কথায় বুঝলুম এখান হতে আরও এক ঘণ্টার পথ গোমুখ যদি পথভ্রান্ত না হই। প্রস্তরখণ্ডের অবিরত আঘাতে বুড়ো আঙ্গুল দুটো অবশ হয়ে আসছে। গোমুখের পথে মুহুর্মুহু রূপ পরিবর্তন করে প্রাকৃতিক দৃশ্য। শত শত সূর্যরশ্মি

সহস্র রঙে রাঙিয়ে দিচ্ছে পাহাড়গুলিকে। কখনওবা তুষারাচ্ছন্ন পর্বতগাত্রে সৌরকিরণ প্রতিফলিত হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। চোখে গগল্‌স্‌ দিয়ে পথ চলতে হচ্ছে। এমনকি সমগ্র চলার পথটিও সেই আলোর ঝলকে হয়ে উঠছে উজ্জ্বল। কখনওবা কম্পমান একটা শুভ্র ধূম্রপ্রবাহ গিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে নীলাম্বরের গায়ে। প্রতি মুহূর্তে দৃশ্য-পট হচ্ছে পরিবর্তিত। যে আলোকশিল্পী ক্রমাগত এই রংবদলের ভূমিকার অন্তরালে রয়েছেন, তাঁর সে রূপ চিন্তা বা ধ্যান করার প্রয়োজন হচ্ছে না এখানে। সীমাহীন পর্বতমালা ও মহান্‌ দৃশ্যাবলী দৃষ্টে সেই বিরাটেব মহিমা স্বতঃই মানসপটে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। গঙ্গা ডাইনে বাঁক নিল। চলেছি সোজা উত্তরে। সাক্ষাৎ হল ভগ্নিদ্বয় সহ শ্রীমতী দূর্বা ব্যানার্জীর সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করে জানলুম এখনও ৪৫ মিনিটের পথ গোমুখ। সমগ্র পথটি তুষারমুক্ত বলে অনেকটা নির্বিঘ্নে চলা সম্ভব হচ্ছে। অন্যথায় যেসব নালা বা খাদযুক্ত পথে চলেছি তা যদি তুষারাচ্ছন্ন সমতলে পরিবৃত হয়ে থাকতো আশপাশের সুবৃহৎ প্রস্তবখণ্ডগুলির সঙ্গে--তাহলে সে সব স্থানে পদক্ষেপ করলেই হতো তুষার সমাধি। সেদিক দিয়ে এবারে বরফমুক্ত পথ অনেকটা নিরাপদ। বড় বড় পাথরের ঢিবির ওপব অবিরত অসম পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি। এ পথটুকুর যেন আর শেষ নাই। চিহ্নিত কোন পথরেখাও নাই। এলোমেলো ভাবে চলা। কখনো বা একটি প্রস্তরের ঢিবি হতে অন্য একটি ঢিবির ওপর ওঠা। চলতে অক্ষম আরতি সরকার কুলির পিঠে আশ্রয় নিয়েছে এ পথটুকু। যে পথে চলেছেন সীতেনবাবু ও কাশীনাথ-বাবু সে পথে চলতে গিয়ে বাধা প্রাপ্ত হলুম রবিবাবুর ডাকে। উপযুক্ত পথপ্রদর্শক ব্যতীত গোমুখ যাত্রায় বিরত থাকাই যুক্তিসহ।, কারণ সমতলবাসীর পক্ষে গোমুখের সঠিক পথ নির্ণয় করা দুরূহ। অন্ততঃ গোমুখের নদীশয্যায়। "পুনর্মূষিক ভব" যে পথ দিয়ে এসেছিলুম সে পথ বেয়েই চলা শুরু হল। পশ্চাতে ফিরে মনে হল যেন গোমুখের সমগ্র নদীশয্যাটি ক্রমাগত ঘুরে এসেছি। রবিবাবুর উপর বিশেষ

ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলুম—তাঁর ভ্রান্ত পথ-নির্দেশনার জন্য। উত্তরে আশ্বাস দিয়ে বললেন তিনি "চলে এসেছি, সামনেই গোমুখ"। বেলা ২-৩০ মিনিটে ১২৭৭০´ ফুট উচ্চ জাহ্নবীর জন্মভূমি গোমুখ পেঁৗছে গেলুম।

দিকশূন্য, জনশূন্য এক তুষারলোক। যেন দেবাদিদেবের জটার জটিলতা খুলে পড়েছে দিগ্বিদিকে। অনাদিকাল হতে তুষার ও প্রস্তরের তলায় তলায় প্রবাহিত জলধারা। সেই প্রস্তর-জটলার গুহামুখের নামই গোমুখ। বিশাল প্রস্তরময় প্রান্তরের উপর দিয়ে শিশুর চাপল্য নিয়ে প্রথম মৃত্তিকা স্পর্শ করছে ভাগীরথী—জল কিন্তু স্বচ্ছ নয়। মৃত্তিকা ও তুষারমিশ্রিত বিগলিত ধারা পতিত হচ্ছে দুই পার্শ্বের পর্বতগাত্র হতে। সেই তুষারমিশ্রিত জল অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারায় প্রান্তরকে সিক্ত করে মিলিত হচ্ছে গঙ্গায়। পাথরের খাঁজে খাঁজে পদক্ষেপ করে এগিয়ে গেলুম সম্মুখের দিকে দুজন কুলি সহ সাতজন পুরুষ ও পাঁচজন মহিলাযাত্রী। সামনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রকাণ্ড প্রস্তরঢিবির উপর সারি দিয়ে উপবিষ্ট হয়ে আনন্দোচ্ছ্বাসে সকলেই গোমুখের বরফ-গলা জল স্পর্শ করছি হাত দিয়ে। একেবারে গুহামুখে যাবার ইচ্ছা ছিল অনেকেরই। কিন্তু কুলিদের নির্দেশে নিবৃত্ত হতে হল। তারাই এ পথের দিশারী। গুহার দুই পার্শ্বেই পাহাড়—দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী সামান্য একটু স্থান—অসমতল, অসংখ্য অতিকায় প্রস্তরে পূর্ণ। দক্ষিণে ঢালের দিকে গঙ্গোত্রী হিমবাহ। প্রায় ৬০০ শত গজ দীর্ঘ ও ১০০ শত গজ উচ্চ একটি বিশাল বরফের দেওয়াল দুটি পাহাড়ের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। সম্মুখে প্রায় ৩০´ ফুট দূরেই বরফের প্রকাণ্ড গুহা। প্রায় চারশ' ফুট উঁচু। একশ' ফুট বিস্তৃত। ভিতরে অন্ধকার। সেই গোপন অন্ধকারের ভিতর থেকে কল কল শব্দে জলধারা নিঃসৃত হয়ে আসছে গঙ্গারূপে। দূরবীণ সাহায্যে দেখলুম বরফের দেওয়াল হতে গুহামুখে ভেঙে পড়ছে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র তুষারচাপ। সেই তুষারখণ্ডগুলি জলধারায় ভেসে আসছে আমাদের হাতের কাছে। স্ত্রী-পুরুষ সকল যাত্রীই সাগ্রহে

সেগুলি সংগ্রহ করে কেহবা আপন পাত্রে সংরক্ষিত করছেন কেহবা মুখে দিচ্ছেন। এই হিমবাহের দক্ষিণে কেদারনাথ, পূর্বে বদরীনাথ ও সতোপন্থ। এসব অগম্য পর্বতরাজির মধ্যস্থ সুবিস্তীর্ণ হিমবাহ হতে দক্ষিণে মন্দাকিনী ও পূর্বে অলকানন্দার উৎপত্তি। তাদেরই তীরে তীরে গাড়োয়ালের তিনটি বিভিন্ন অঞ্চলে গঙ্গোত্রী, কেদার ও বদরীর প্রসিদ্ধ মন্দির। মন্দিরগুলির উত্তরে কিন্তু একই বিশাল তুষার রাজ্য। গগনচুম্বী গিরিশ্রেণীর বিরাট সমাবেশ। আঠার হাজার হতে তেইশ-চব্বিশ হাজার ফুট তাদের উচ্চতা। সেখান থেকেই নেমে আসে দিকে দিকে হিমবাহের ধারা। তুষার প্রদেশ ছেড়ে এসে সেগুলিই আবার নদীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। পরে নদীতে নদীতে মিলন ঘটে হয় প্রয়াগ সংগম।

"চৌখাম্বা বা বদরীনাথ শিখরের পশ্চিম ঢাল বেয়ে নামে প্রধান হিমবাহ গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার। গোমুখেই গঙ্গোত্রী হিমবাহের পরিশেষ। তুষারগলা নদীরূপে ভাগীরথীর প্রকাশ। এই ভাগীরথীর তীরেই গঙ্গোত্রী মন্দির।

উক্ত তুষারময় রাজ্যের ও চৌখাম্বার অপর দিকে অর্থাৎ পূর্বভাগেও তেমনি সারি সারি হিমবাহ। সেদিকেও বরফ গলে ধারা নামে। নদীর জন্ম হয়—নাম সরস্বতী, অর্বা, বিষ্ণুগঙ্গা প্রভৃতি। এদেরই জলভার নিয়ে যিনি বইতে থাকেন তাঁরই নাম অলকানন্দা। তারই স্থলে বদরীনাথ মন্দির।

আবার এই পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণে আর এক তুষার কেন্দ্র হতে নামেন মন্দাকিনী। তারই তীরে কেদারনাথ মন্দির।"

তুষারকিরীটী হিমালয়ের অসংখ্য হিমবাহের মধ্যে গঙ্গোত্রী[১] অতি অসাধারণ। পঁচিশ মাইল উত্তর-পূর্বে বিন্দুসর হ্রদ হতে সৃষ্ট ২০ মাইল ব্যাপী দীর্ঘ এই হিমবাহ। প্রতি বৎসরই এই উৎসমুখ হয় পরিবর্তিত, এবারে ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ ঘেঁষে। কয়েক বৎসর পূর্বে রবি-বাবুরা দেখে এসেছেন উত্তর-পূর্ব কোণে। এই গোমুখ হতে তুষার

পথে যাওয়া যায় বদ্রীনাথ। ভাগীরথী ও অলকানন্দা দুই নদীর মধ্যবর্তী গিরিপ্রাচীর। গোমুখ থেকে হিমবাহের পথে সেই গিরিশ্রেণী অতিক্রম করে অপর দিকে বদরিকাশ্রম। মধ্যে গিরিবর্ত্ম কালিন্দী খাল ১৯৫১০´ ফুট। পশ্চাতে দাঁড়িয়ে খাড়া হিমানী পাহাড় নীলকণ্ঠ সতোপন্থ ও মেরু। মাথার উপরে নীলাকাশ ও সম্মুখে বিরাট হিমবাহ, তার পশ্চাতে তুষার-মৌলি পর্বত সৌরকিরণে অপরূপ শোভায় মণ্ডিত। মানুষের অদম্য ঔৎসুক্য, অকারণ কৌতূহল, অহেতুক উদ্বেগ, সব এখানে শান্ত, স্থির। শুধু আছে উত্তুঙ্গ তৃণ-লতাহীন পর্বত-প্রহরী, আছে অন্তহীন কালের তুষারলোক, আছে লক্ষ লক্ষ প্রস্তরের জটলা—আছে উচ্ছল গঙ্গার উৎপত্তির শব্দপ্রবাহ। যাকে কঠিন বন্ধনীর মধ্যে আনয়নের জন্য প্রয়োজন ছিল চতুর্দিকে এই গগনস্পর্শী শৃঙ্গমালার। এই বিশৃঙ্খল ছিন্ন-ভিন্ন প্রাকৃত সজ্জা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাক্ষুষ করে নিজের সত্তা যেন কোথায় হারিয়ে যেতে চায়—পর্বতের শীর্ষে শীর্ষে, নীলাম্বরের ফাঁকে ফাঁকে, কোন্ অনন্তলোকে। ফেরার কথা বিস্মৃত হয়ে মন ভাব-তন্ময়তায় আবিষ্ট হয়ে পড়ে। সম্বিৎ ফেরে রবিবাবুর ডাকে। ঘটি ঘটি বরফ-গলা জল দিয়ে স্নান সেরে নিলুম—গঙ্গার উৎসমুখে গোমুখের জলে। অনিচ্ছা সত্বেও ৩-৪০ মিনিটে সকলকে উঠতে হল গোমুখের নদীশয্যা হতে। অন্যথায় ভূজবাসা পৌঁছান হয়ে উঠবে দুষ্কর। কি পুণ্য সঞ্চয় করে এলুম জানি না। তবে দেহ মন তৃপ্ত পতিতপাবনীর করুণা ধারা সিঞ্চনে। পেছন ফিরে তাকাই—গোমুখ যেন আকর্ষণ করছে—জানি এ আকর্ষণ আজন্মের—আমৃত্যুরও। বৈকাল ৫-৩০ মিনিটে ফিরে এলুম ভূজবাসায় দু'মাইল পথ অতিক্রম করে।

চতুর্দিকে খাড়া দাঁড়িয়ে হিমানী পর্বত, তারই মাঝে প্রায় ১২০০০´ ফুট উচ্চে সামান্য একটু সমতলে ভূজবাসা—নির্জন, শান্ত পরিবেশ। সেখানেই লালবিহারী দাসের আশ্রম। যেন মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যান। গোমুখযাত্রীদের নিরাপদ আশ্রয়। অদূরে ভাগীরথী—

শিশুসুলভ চাপল্যে হামাগুড়ি দিয়ে চলে এসেছে দু' মাইল পথ। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, কর্মকর্তা ও সেবক সবই একাধারে লাল-বিহারীজী। পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে নীরন্ধ্র কয়েকটি গুহাগৃহ। মেঝেতে পাইন আর ভূর্জপাতার আস্তরণ। কোনটিতে কম্বল। অর্ধনমিত হয়ে প্রবেশ করতে হয় গুহাভ্যন্তরে। ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে গোমুখ যাতায়াতের পথে কেউ অভুক্ত বা আশ্রয়হীন হয়ে ফিরে যান না আশ্রম হতে। এই নির্জন নিরাশ্রয় ও নিরালম্ব পথে লালবিহারী দাসের অকৃপণ হস্ত সদা-প্রসারিত সকলকে সাহায্য দানে। প্রতিদানে তাঁরা দিয়ে যান অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা-ভালবাসা। এখন এখানেই গড়ে উঠছে বাসোপযোগী অতিথিশালা পর্বতারোহিণী ৺সুজয়া গুহের স্মৃতির উদ্দেশে।

সন্ধ্যাগমের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ। ভূর্জবাসার হাড়কাঁপানো শীত স্মরণ করিয়ে দেয় অমরনাথের পথে শেষনাগ ও পঞ্চ-তরণীর কথা। গুহাগৃহে আশ্রয় নিয়ে সাতজন প্রাণীর গায়ে গা লাগিয়ে তিনখানি র‍্যাগ জড়িয়েও যেন শীত ভাঙে না। অপরদিকে একটিতে পাঁচজন মহিলাযাত্রী সহ পুলক কুণ্ডু ও রবিবাবু। সরলবাবু ও গৌরী-প্রসন্নবাবু আজ গোমুখ যাত্রায় বিরতি দিয়ে শীত-জর্জরিত অবস্থায় নিঃশব্দে আশ্রয় নিয়েছেন আমাদেরই সঙ্গে। আগামীকাল প্রত্যূষে কৃপাল সিংকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা যাত্রা করবেন গোমুখ। লালবিহারীজী কিন্তু এই অকল্পনীয় শীতে সামান্য একটি গাত্রাচ্ছাদন ও কৌপীনমাত্র সম্বল করে দু'জন কর্মীসহ গুহাগৃহের দ্বারে দ্বারে আহার্য বিতরণে ব্যস্ত। রাত্রি ৯টায় আবার চা বিতরণের পর্ব শুরু হল। জনে জনে গরম চা পানের অনুরোধ জানিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সাধুজী। শীতের প্রকোপে র‍্যাগের ভিতর হতে হাত বাড়িয়ে সেটুকু গ্রহণের কষ্টও সহ্যাতীত বিবেচনায় যাঁরা চা-পানে আপত্তি জানাচ্ছেন তাঁদের উপদেশ ছলে সাধুজী বলছেন, "এই গরম চাটুকু পান করলে শীতের প্রকোপ পাবে হ্রাস।" তাঁরই যেন দায়। আশ্রমবাসী কয়েকজন

সাধু ও আমরা কয়েকটি প্রাণী ব্যতীত জীবনের কোম স্পন্দন নাই এখানে। প্রাণীচিহ্নহীন নিস্তব্ধ ভূভাগ।

মানুষের প্রতি মানুষের এমন প্রাণভরা দরদ কোন্ প্রেরণায় লাভ করলেন তিনি? মহৎ শিষ্যের নিকট সেই মহান্ প্রেরণাদাতাটির বিষয় জিজ্ঞাসা করায় উত্তরে জানালেন লালবিহারীজী—"সেই মহীয়ান্ মানুষটি হলেন তাঁর গুরুদেব কৃষ্ণদাস বাবাজী। বাঙালী বৈষ্ণব, থাকেন এখান হতে আরও এক মাইলের ব্যবধানে—তুষারময় পার্বত্য পরিবেশে।" দর্শনের ইচ্ছা থাকলেও উপায় ছিল না। এজন্য ভূজবাসায় আরও একদিন অবস্থিতি প্রয়োজন। কৌতূহল নিবৃত্ত করতে হল। প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করেও লালবিহারীজী মানুষের জন্য করে চলেছেন অক্লান্ত পরিশ্রম। এই দুর্গম জনশূন্য তুষারময় পার্বত্য অঞ্চলে লালবিহারীজীর জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের "শিবরূপে জীব-সেবার" সর্বশেষ বাণীর সার্থক রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করে এককালে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে গেলুম এবং ভগবদ্‌বুদ্ধিতে জীব-সেবার মাধ্যমে মানুষ কেমন করে একটি আনন্দময় সত্তায় অধিষ্ঠিত হয়ে দিব্যপ্রেরণায় বহু-জনের সেবায় নিঃশেষে জীবন উৎসর্গ করতে পারেন—লালবিহারী দাসের আচরণে সেটুকু অনুভব করতে কোন ব্যক্তিরই সংশয় জাগে না। হিমানী-সিক্ত ভূজবাসার শীতপাণ্ডুর রজনীর অবসান হল। আশপাশের তুষারমৌলি শৃঙ্গগুলি নবপ্রভাতের সৌরকিরণে গৈরিক বর্ণ ধারণ করেছে। হিমবন্ত জটাধারী যেন নব সাজে হয়েছেন সজ্জিত। ২০শে মে সকাল ৭-৩০ মিনিটে সকলে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে বিহারীজীকে প্রণাম জানিয়ে ও প্রণামী দিয়ে প্রায় ১০০০´ ফুট চড়াই ভেঙে গঙ্গোত্রী পথে উঠে এলুম বারজন যাত্রী। সকাল ৬টার মধ্যেই কৃপাল সিং-এর সাথে রওনা হয়ে গেছেন গোমুখের পথে সরলবাবু ও গৌরীপ্রসন্নবাবু। দূর্বা ব্যানার্জী সহ ভগ্নিদ্বয়ও যাত্রা শুরু করলেন আমাদের সঙ্গে। মোট যাত্রীসংখ্যা পনের। চলেছি আর ভাবছি ভূজবাসা হতে চীরবাসার সংকটময় দুর্গম গিলা পাহাড় দুটি অতিক্রমের

ভয়ালতার কথা। পাথরের ওপর পা ফেলে এক মাইল পথ অতিক্রম করে তারপর গিলা পাহাড় দুটি পার হয়ে চলে এলুম চীরবাসা ৯-৩০ মিনিটে। সকল যাত্রীই প্রায় ১-১½ মাইল পথ পশ্চাতে রয়ে গেছেন। চীরবাসা হতে গঙ্গোত্রীর পথ তেমন দুর্গম নয়। দ্রুতপদে চলতে শুরু করলুম। বামপার্শ্বে সাথে সাথে চলেছে গঙ্গা। আরও ২½ ঘণ্টা দ্রুতপদে এগিয়ে পৌঁছে গেলুম গঙ্গোত্রী বেলা ১১-৪৫ মিনিটে। প্রবেশ পথেই সাক্ষাৎ হল ম্যানেজার বিনয়বাবুর সঙ্গে। তারপর সকলের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের সংবাদ দিতে চলে গেলুম ধরমশালায় অবস্থিত সকল স্ত্রী-পুরুষ যাত্রীদের। গতকাল রাত্রি ৮টার মধ্যেই পৌঁছে গেছেন শ্রীপতাকীচরণ কুণ্ডু সহ আরও তিনজন যাত্রী—এক-দিনেই গোমুখ যাত্রা ও প্রত্যাবর্তনের নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করে। প্রায় ১ ঘণ্টার মধ্যে একে একে আমাদের সহযাত্রীরাও পৌঁছে গেলেন গঙ্গোত্রীর ধরমশালায়। সকলেই খুসী। ইতিমধ্যে স্নানাহারাদি সমাপ্ত করে নিশ্চিন্ত বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলুম। মধ্যাহ্ন হতেই গঙ্গোত্রীর আবহাওয়া ক্রমেই দুর্যোগপূর্ণ হতে শুরু করল। ধীরে ধীরে দম্‌কা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি নামল। চিন্তিত হয়ে পড়লুম সরলবাবু ও গৌরীপ্রসন্নবাবুর জন্য। আজ প্রাতেই তাঁরা গোমুখ যাত্রা কবেছেন—তাঁদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত সকলেই চিন্তিত। অন্ততঃ যাঁরা গোমুখের বিপদসঙ্কুল পথের কথা জ্ঞাত আছেন। বাইরের আকাশ যতই দুর্যোগপূর্ণ হয়ে উঠছে অন্তরাকাশে চিন্তাও হচ্ছে তত গাঢ়। এ চিন্তার অংশীদার হলেন রবিবাবু। তবে তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন কৃপাল সিং-এর মত পথপ্রদর্শক যখন আছে তখন সুব্যবস্থা একটা হবেই। এমন সময় ৪টা বাজতেই সকল চিন্তার অবসান ঘটিয়ে উপস্থিত হলেন সরলবাবু ও গৌরীপ্রসন্নবাবু,' সঙ্গে কৃপাল সিং। যেভাবে কৃপাল সিং তাঁদের এই বিপদসংকুল পথটি অতিক্রম করিয়ে নিরাপদে গঙ্গোত্রী পৌঁছে দিয়েছে সরলবাবু তার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়ে কৃপাল সিং-এর ভূয়সী প্রশংসা করতে

লাগলেন। এইভাবে পথটুকু অতিক্রম না করতে পারলে ভূজবাসাতেই আজ তাঁদের রাত্রি যাপন করতে হতো। সেই সঙ্গে কৃপাল সিংকে খুসী করে বিদায় দিলেন সরলবাবু। নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল কৃপাল সিং। আজ শুধু বিশ্রাম আর বিশ্রাম। গঙ্গা দেবীর সন্ধ্যাবাত্রিক লগ্নে একবার মাত্র মন্দিব-চত্বরে ও গর্ভমন্দিরে গিয়ে আরাত্রিক দর্শন করে চলে এলুম। বাত্রি ৮॥০টার মধ্যেই নৈশ-ভোজন সমাপ্ত করে বিছানায় আশ্রয় নিলুম। রাত্রি ৪টা হতেই একটা অস্পষ্ট গর্জন কানে আসছে মহাসঙ্গীতের মত—বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে প্রহত হয়ে উদ্দাম বেগে বয়ে চলেছে ভাগীরথী।

॥ গঙ্গোত্রী-উত্তরকাশী-ঋষিকেশ ॥

গঙ্গোত্রীর প্রভাতী-সূর্য পর্বতেব চূড়ায় চূড়ায় শিখরে শিখরে আরক্তিম ঐশ্বর্য ছড়িয়ে দিয়েছে। সে বশ্মিব দ্যুতি লেগেছে ভৈরবী গঙ্গাব অঙ্গে অঙ্গে। সে দৃশ্য দৃষ্টে মনে হচ্ছে যেন ধ্যানমগ্ন দেবাদিদেব নিমীলিত শান্ত চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত কবে শেষবাবেব মত দেখে নিচ্ছেন তাঁর জটাচ্যুতা শৈবলিনীকে। সুকুমারের ডাকে প্রাতঃকালীন চা-পানের তাগিদে ফিরে দাঁড়ালুম। ২১শে মে চারদিনের পাতা সংসাব-গোটানর পালা। বেলা ৮টার মধ্যে প্রাতরাশ শেষ করে তল্পি গুটিয়ে গঙ্গোত্রীব বরফ-গলা জলে স্নানেব জন্য রওনা হয়ে গেলুম। স্নান সেরে ১০-৫০ মিনিট মধ্যে মধ্যাহ্নভোজন সমাপ্ত কবে গঙ্গোত্রীর বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে অনেকেই একে একে ধীরে মন্থরে রওনা হয়ে গেলুম হাতের মালগুলি সঙ্গে নিয়ে। ভৈরবঘাঁটি হতে ফিরতি-বাসে রওনা হতে হবে সকলকেই। সীতেনবাবুরা কেউ কেউ পায়ে হেঁটে রওনা হয়ে গেলেন ভৈরবঘাঁটি অভিমুখে বাসের বিলম্ব দেখে। সকলেই সময়াতিবাহিত করছি বামপার্শ্বে চীরগাছের অন্তরালে প্রবহমানা গঙ্গার রূপ আর সারি সারি সাধুদের কুঠিয়া দেখে। ইতিমধ্যে বাস-খানি আসার সঙ্গে সঙ্গে স্থান দখলের জন্য তাড়াহুড়া পড়ে গেল।

সকলে আপন আপন সুবিধামত স্থানের ব্যবস্থা করে নিয়ে বসে পড়লুম। ১১-৫০ মিনিটে বাসখানি চলল ভৈরবঘাঁটি অভিমুখে। ভৈরবঘাঁটি পেঁাছে গেলুম বেলা ১২-১৫ মিনিটে। এখানেই আমাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা। ভৈরবঘাঁটির পর্বতচূড়ায় অবস্থিত কালীকমলীর ধরমশালায় অবস্থান আর চায়ের দোকানের সম্মুখে চুল্লীর কাছে বসে আরাম উপভোগ, সেই সঙ্গে ভৈরবনাথের পূজারতি দর্শন। সবার উপর ভৈরবঘাঁটিব প্রাকৃতিক দৃশ্য মন মুগ্ধ করে রাখে। ভৈরবঘাঁটিতে বাত্রি যাপন কবে সকাল ৬টাব মধ্যেই রওনা হয়ে উৎরাই পথে অবতরণ শুরু হল জাড্‌গঙ্গাব লৌহ-সেতু পর্যন্ত। তারপব কঠিন চড়াই উত্তরণের পর্ব শেষ কবে বেলা ৬-৪৫ মিনিটে পেঁাছে গেলুম লংকা। বন-জঙ্গলে ঘেরা স্থানটি মনোরম। এগিয়ে গেলুম নেলাং সড়কের দিকে—সেখানে নির্মীয়মান সেতুর পরিবর্তে যে সাময়িক রোপওয়েটি নির্মিত হয়েছে সেটির সম্বন্ধে কুলিদের জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জানলুম এই বোপওয়ে যোগেই ভৈরবঘাঁটি হতে গঙ্গোত্রী যে বাসখানি যাতায়াত কবে তাব খণ্ডাংশ প্রভৃতি নিয়ে যাওয়া হয় ভৈরবঘাঁটিব উত্তুঙ্গ পর্বত অতিক্রম কবিয়ে ওপারের সমতলে। আর ঐ একখানি মাত্র বাসই যাতায়াত করে ভৈরবঘাঁটি হতে গঙ্গোত্রী এই ছয় মাইল পথ। এজন্য সকল যাত্রীকেই এখন ভৈরবঘাঁটির চড়াই-উৎরাই করতে হয় পায়ে হেঁটেই। এখনও এইটুকু মোটর পথ নির্মিত হয় নি। তবে যেভাবে প্রস্তুতিপর্ব চলেছে শীঘ্রই উত্তরকাশী হতে গঙ্গোত্রী টানা বাস চলাচল শুরু হয়ে যাবে। উত্তরকাশীর বাসটির জন্য এখানে প্রায় আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল। সেই অবকাশে কেহবা খাবারের দোকানে কেহবা চা-পর্বে বসে গেছেন। ম্যানেজার বিনয়বাবু সকলের কাছে গঙ্গোত্রী ও গোমুখের পাসপোর্ট বা অনুমতিপত্র সংগ্রহে ব্যস্ত। কারণ, সেগুলি সব হিসাবমত উত্তরকাশীর মহকুমা থানা-অফিসে জমা দিতে হবে। সরলবাবুর কাছে যেতেই তিনি ব্যস্তভাবে এখানে-সেখানে খোঁজাখুঁজি শুরু করার পরও যখন পাসপোর্টটির কোন সন্ধান করতে

পারলেন না তখন তাঁর মুখের যে করুণ অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করে-ছিলাম সে কথা আজও ভুলতে পারি না। কিছুক্ষণ পর তিনিই আবার স্মরণ করলেন হয়তো সেটি পরিধেয় কোটটির মধ্যে হোল্ডলে রয়ে গেছে—যেটি সঙ্গে নিয়ে তিনি গোমুখ যাত্রা করেছিলেন। পুলক কুণ্ডু সত্বর বাসের মাথায় রক্ষিত সরলবাবুর হোল্ডল্ খুলে কোটের পকেট হতে বার করল সেই দুষ্প্রাপ্য বস্তুটি। সরলবাবুর মুখে তখন ফুটে উঠেছে স্বস্তির হাসি। বেলা ৯-০৫ মিনিটে বাস চলতে শুরু করল উত্তরকাশী অভিমুখে। জংলা, ধরালী পেরিয়ে বাস থামল হরশিলে প্রায় আধ ঘণ্টা, গেটের বাসের অপেক্ষায়। হরশিল থেকে একেবারে ঝালা। বৃষ্টি শুরু হল ঝালা হতে। পেঁজা তুলোর মত খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি পাহাড়ের গায়ে গায়ে লেগে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাশে পাশে চলেছে ভাগীরথী, উচ্ছল তার তরঙ্গ। ঝালা হতে সুক্কী ও গাংনানী হয়ে ভুক্কী, শ্রীরঙ্গগ্রাম অতিক্রম করে বাসখানি থামল ভাটোয়ারীতে। এ অঞ্চলের গঞ্জ ভাটোয়ারী। স্ত্রী-পুরুষ সকল যাত্রীই নেমে পড়লুম চায়েব তাগিদে। কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করে বাসখানি পুনরায় চলতে শুরু করল। এখান হতে উত্তরকাশী ১৮ মাইল পথ। পথে মল্লী, মনেরী ও গঙ্গোরী পেরিয়ে ২২শে মে বেলা ১-৪৫ মিনিটে পৌঁছে গেলুম উত্তরকাশী। পৌঁছানর আধ ঘণ্টা মধ্যেই শুরু হল ঝর ঝর বৃষ্টি। ইচ্ছা ছিল উজলীর রুদ্রাবাসে গিয়ে স্বামী সত্যদেবানন্দজীকে গঙ্গোত্রী-গোমুখ প্রত্যাবর্তনের সংবাদ দেওয়া ও সেই সঙ্গে প্রণাম জানিয়ে আসা। বৃষ্টির প্রকোপে তা আর সম্ভব হ'ল না। উত্তরকাশীতে পুনরায় ডাক্তারবাবুদের ঘরেই স্থান পেলুম। কুণ্ডু স্পেশ্যালের নৈশভোজন সমাপ্ত করে সারাদিনের শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহটিকে বিশ্রাম দেবার জন্য সকলেই শয্যাশ্রয়ী হলুম। এখনও উত্তরকাশীর আকাশে, বাতাসে মঠে মন্দিরে ছড়িয়ে আছে একটি ধর্মীয় ভাব।৬

২৩শে মে প্রাতঃকালীন চা-পর্ব শেষ করে সকাল ৬টায় প্রথম

গেটের বাস ধরে যাত্রা হল শুরু ঋষিকেশ অভিমুখে। আকাশ সকাল হতেই মেঘাচ্ছন্ন। পাহাড়-ঘেরা অনিন্দ্যসুন্দর উত্তরকাশী। পূর্ব-পশ্চিম দুদিকে দুটি পাহাড় অর্ধবৃত্তাকারে বেষ্টন করে রেখেছে এই উপত্যকাটিকে, বিধৌত হচ্ছে করুণা-বিগলিত উত্তরপ্রবাহিনী গঙ্গা-ধারায়। ছেড়ে যেতে মায়া লাগে যেমন লেগেছিল পাহালগাম্ ছেড়ে আসতে অমরনাথের পথে। তবু পেরিয়ে এলুম উত্তরকাশীর সীমা। ঋষিকেশ এখান হতে ৯৫ মাইল পথ। বাস ভাড়া উত্তরকাশী হতে ১০·৮০ পঃ। সকাল হতেই প্রায় দুর্যোগপূর্ণ দিন, তারই মাঝে সমতল পথে বাসখানি চলতে চলতে ৭টার মধ্যেই পেঁাছে গেল ধরাসু। সেখান হতে ৮-২৫ মিনিটে টিহরীর সীমা ছাড়িয়ে দোপাট্রা নামে একটি স্থানে এসে বাসখানি প্রায় তিন ঘণ্টা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। সম্মুখে একখানি ট্রাকের এ্যাক্সিলেরেটার ভেঙে পথ রুদ্ধ। স্থানটি কয়েকটি খাবারের দোকান, হোটেল ও পোষাক-মনোহারীর দোকানে সজ্জিত। সকলেই অবতরণ করলুম বাস হতে। বিশেষ করে মহিলারা পোষাকের দোকানে দোকানে দলবদ্ধ হয়ে ঘোরাফেরা শুরু করে দিয়েছেন কিছু কেনা-কাটার আশায়। কুণ্ডু স্পেশ্যালের নির্দেশমত কয়েকজন ব্যতীত অনেকেই এখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর্ব শেষ করে নিলেন। এখান হতে সোজা একটি মোটর পথ চলে গেছে শ্রীনগরের দিকে। অবরুদ্ধ পথ মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাসখানি ১১-২৫ মিনিটে ডাইনে ঘুরে চলতে শুরু করল ঋষিকেশের পথে। নরেন্দ্রনগরের কিয়দ্দূরে পুনরায় যন্ত্রযানটিকে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল পেট্রোলের অভাবে। নানা বিপত্তি অতিক্রম করে এইভাবে বাসখানি ঋষিকেশ পৌঁছল বেলা তিনটায়। মহিলারা সত্বর ইলেক্ট্রিক পোষ্টে দড়ি খাটিয়ে দু'সপ্তাহের ব্যবহৃত-অব্যবহৃত যাবতীয় পোষাক পরিচ্ছদ রৌদ্রে দেবার ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এ' প্রসঙ্গে প্রখ্যাত চিন্তাশীল স্বর্গত অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের একটি মন্তব্য মিলিয়ে নেবার সুযোগ মিলল, তিনি বলতেন,

"থান থান রেশমী কাপড় আর ভারি ভারি সোনার গয়না এর নামই মেয়েজাত। শ্বেতাঙ্গিনীরাও এবিষয়ে বাঙালী মেয়েদের মাসতুত বোন।" সত্যই কিছুক্ষণের মধ্যে প্লাটফরমটি যেন বিখ্যাত দোকানের শো-রুমে পরিণত হল। দেরাদুন এক্সপ্রেস যোগে শ্রীমতী আরতি বসুমল্লিক ও কাজল চৌধুরী রওনা হয়ে গেলেন কলকাতা অভিমুখে। বিদায় দিয়ে ফিরে এল পুলক কুণ্ডু উদাস ও বিষণ্ণচিত্তে। বিদায় নিলেন মহিলা বৈমানিক শ্রীমতী দূর্বা ব্যানার্জী। সকলেরই এখন নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ। সন্ধ্যার প্রাক্কালে টুরিষ্ট কোচের চেয়ার বেঞ্চ নামিয়ে প্লাটফরমে গল্পগুজব আর হাসি-উচ্ছ্বাসে সকলেই যাত্রাপথের স্মৃতি রোমন্থনে মশ্‌গুল। ডাক পড়ল নৈশভোজনের। ঋষিকেশে রাত্রি যাপন করে ২৪শে মে সকাল ৬-৪০ মিনিটে হরিদ্বার রওনা হয়ে গেলুম একখানি যাত্রীবাহী ট্রেনে।

॥ **হরিদ্বার** ॥

২৪শে মে সকাল ৬-৪০ মিনিটে ঋষিকেশ হতে যাত্রীবাহী ট্রেনে রওনা হয়ে হরিদ্বার পৌঁছলুম বেলা ৮-১৫ মিনিটে। সকাল হতে সকলেই ব্যস্ত ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের জন্য। কুণ্ডু স্পেশ্যালের ম্যানেজার ও কর্মচারীরা ব্যস্ত তীর্থভোজের আয়োজনে। যাত্রা অন্তে কুণ্ডু স্পেশ্যাল কর্তৃপক্ষের এটি হচ্ছে একটি বিশেষ ব্যবস্থা। কেদার-বদরী ও অমরনাথ প্রত্যাবর্তন পথেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এখান হতেই আপন আপন ব্যবস্থামত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন সস্ত্রীক সলিসিটর শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্তা রমা ঘোষ (ওরফে রমাদি)। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান সেরে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য পলান্ন প্রভৃতির সুব্যবস্থায় সকলেই তৃপ্ত। এখানে আমাদের প্রায় আড়াই দিন অবস্থিতি। সুতরাং আরাম-বিরাম ও কেনা-কাটার সময় প্রচুর। দেরাদুন এক্সপ্রেস যোগে মিঃ গুপ্ত, কাশীনাথবাবু ও গৌরীপ্রসন্নবাবু দেরাদুন-মসৌরী দর্শনে রওনা হয়ে গেলেন। পরদিন ২৫শে মে সীতেনবাবুরা দুজন গেলেন মসৌরী এক্সপ্রেস যোগে

দোরাছুন-মসৌরী। রবিবাবু, ডালিয়া ও তার মাতা সহ আমরা যাত্রা করলুম মনসা পাহাড় দর্শনে। সমান্য চড়াই পথে যেতেই রবিবাবু উত্থাপন কবলেন কয়েকটি ধর্মীয় প্রশ্ন ঃ কেমন করে ভগবান লাভ করা যায়, কি তার উপায় ইত্যাদি। ধর্মীয় আলোচনায় বড় একটা মন সবে না। তবে যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী, বিশেষ করে রবিবাবুর গোমুখ যাতায়াতের পথের ঋণ অপরিশোধ্য বিবেচনায় সংক্ষেপে তাঁকে বলতে শুরু করলুম ঃ "ব্যাকুলতাই ভগবান লাভের একমাত্র উপায়। এই ব্যাকুলতা আনবাব জন্যই শাস্ত্রে বিভিন্ন পথ ও মতেব সাধনাব কথা উল্লিখিত হয়েছে। যেমন কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান সাধাবণত এই তিন পথেই তাঁকে লাভ কবা যায়। ইদানীং কালের অবতাব শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবও তাই বলে গেছেন। তবে সার কথা হল তাঁকে ভালবাসতে হবে। মানুষ যেমন তাব স্ত্রী, পুত্র ও প্রিয়জনকে ভালবাসে ভগবানের সঙ্গে তেমনি একটি ভালবাসার সম্বন্ধ পাতাতে হবে। অর্থাৎ তাঁকে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করলেই লাভ করা যায়, যেমন শ্রীবামকৃষ্ণদেব করেছিলেন। তাইতো তিনি বলেছেন 'লোকে মাগ ছেলের জন্য ঘটি ঘটি কাঁদে তাঁর জন্য ক'জন কাঁদে।' প্রকৃতপক্ষে এই অবস্থাটি লাভের জন্য এত মত ও পথের সৃষ্টি। কলিযুগে অন্নগত প্রাণ তাই সব সময় ভগবচ্চিন্তায় অতিবাহিত করা সম্ভব নয়, এজন্য নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে তাঁকে লাভ করার যে পথ তাই কর্মযোগ। গীতাতেও এর উল্লেখ আছে। ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হয়ে নিষ্কাম কর্ম করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হলে সেই শুদ্ধ চিত্তে তাঁর স্বরূপ প্রতিফলিত হয়। বহুজনের হিত ও সুখের জন্য নিঃশেষে আত্মবলি দিয়ে সংসারে থেকে এভাবে কর্ম করলেও ভগবান লাভ বা আত্মসাক্ষাৎকার হয়।

ভক্তিমার্গ ঃ ঈশ্বরের কোন এক রূপের প্রতি অনুরাগ ও ধ্যানে তন্ময় হয়ে তাঁর প্রীতির জন্য সব কার্যানুষ্ঠান করাই ভক্তিয়োগের লক্ষ্য। এ পথে ঈশ্বরের কোন এক রূপকে নিজ ইষ্টজ্ঞানে চিন্তা ও ধ্যান করতে করতে শেষে ঈশ্বর দর্শন হয়।

জ্ঞানমার্গের সাধনা নিরাকারের সাধনা। আপাত দৃষ্টিতে যে জগৎ সত্তাকে আমরা নিত্য বলে প্রত্যক্ষ করছি জ্ঞানপথের সাধকগণ এর প্রকৃত সত্তা তা নয় (অর্থাৎ অনিত্য) বলে স্বীকার করে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনরূপ নেতিমার্গের সাধনার মাধ্যমে পরিশেষে আপনার ভিতরে নিত্যকারণ স্বরূপের সন্ধান লাভে ধন্য হন।

এতদ্ব্যতীত যোগপথে যোগীরাও চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা তাঁকে লাভ করে থাকেন। সে কথা আজ থাক।”

কথায় কথায় পৌঁছে গেলুম হরিদ্বার ষ্টেশনে। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যার প্রাক্কালে কনখল সেবাশ্রমে যাত্রা করে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নিরাপদ যাত্রা অন্তে প্রণাম জানিয়ে ও স্বামিজীদের সঙ্গে গোমুখ যাত্রাপথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আলোচনা করে ফিরে এলুম টুরিষ্ট কোচে রাত্রি সাতটায়। মহিলাযাত্রীরা এবং অন্যান্য অনেকেই রওনা হয়ে গেছেন ব্রহ্মকুণ্ডে হর-কি-পৌরীতে, কেউবা হরিদ্বারের অপর তীরবর্তী অঞ্চল দর্শনে।

২৬শে মে সকাল হতে অনেকেই ব্যস্ত। বিশেষ করে মহিলারা, কার কোনো জিনিস কেনা ভুল হয়ে গেছে কিনা তার হিসাব-নিকাশে। শ্রীমতী পারুল মল্লিকের তো কেনার শেষ নাই। যাতায়াতের পথে যেখানে যা ভাল জিনিস দেখেছেন তার নমুনা সংগ্রহ করে তিনি সঙ্গে নিয়েছেন। উত্তরকাশীর পশমীদ্রব্য, ভৈরবঘাঁটির পশমী কম্বল, হরিদ্বারে বাসমতী চাল ও সরকারী বিপণনকেন্দ্র হতে কম্বল ইত্যাদি। যাই হোক, এভাবে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচী আর আলাপ-প্রলাপের মাধ্যমে হরিদ্বার হতে যমুনোত্রী, যমুনোত্রী হতে গঙ্গোত্রী আবার কেউ কেউ গঙ্গোত্রী হতে গোমুখ পর্যন্ত নিরাপদ যাত্রা অন্তে পুনরায় হরিদ্বার এসে পৌঁছে গেছি।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর অপরাহ্ণ চার ঘটিকায় মোরাদাবাদ যাত্রীবাহী ট্রেনে রওনা হয়ে রাত্রি ৯-৪৫ মিনিটে পৌঁছলুম মোরাদাবাদে। অভূতপূর্ব মশক-দংশনজনিত মোরাদাবাদে বিনিদ্র রজনী যাপনের

কথা কুণ্ডু স্পেশ্যালের প্রতিটি যাত্রীর মনে যাত্রাপথের অক্ষয় স্মৃতি হয়ে থাকবে। ২৮শে মে সকাল ৫-৩০ মিনিটে পুনরায় মোরাদাবাদ হতে বেরিলী প্যাসেঞ্জাব যোগে বেলা ৯-৩০ মিনিটে বেরিলী পৌঁছলুম। সেখানে পৌঁছেই ইঞ্জিনেব জল নেবার কলের নীচে দাঁড়িয়ে স্নান সেবে অনেকেই গত রাত্রিব অনিদ্রাজনিত ক্লান্তি অপনোদন করে স্নিগ্ধ হলুম। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বেলা ছু'টায় বেরিলী-বক্সার যাত্রীবাহী ট্রেনে রওনা হয়ে ২৮শে মে সকাল ৬-৪৫ মিনিটে সকল যাত্রীই অবতরণ করলুম বাবাণসী ষ্টেশনে। মধ্যপথে লক্ষ্ণৌতে নেমে গেলেন শ্রীশৈলবালা ব্যানার্জী। কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্মচারী সহ ম্যানেজার বিনয়বাবু চলে গেলেন মোগলসরাই উক্ত ট্রেনে—বেলা এগারটাব মধ্যে মোগলসরাই পৌঁছানব জন্য আমাদের হুঁসিয়ার করে দিয়ে। সঙ্গে বইলেন এ্যাসিষ্টেন্ট ম্যানেজাব রবিবাবু। বাবাণসী ষ্টেশনে নেমেই স্ত্রী-পুরুষ সকল যাত্রীই দ্রুতগতি সাইকেল রিক্শা যোগে চলে গেলুম দশাশ্বমেধ ঘাটে। পথে যেতে খণ্ড, ছিন্ন, কত স্মৃতিই না মনে হচ্ছিল—বৌদ্ধযুগের বিস্মৃত কাহিনী, শিল্পবৈভব, বিম্বিসার অজাতশত্রুর কথা, সেই সঙ্গে ত্রৈলিঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ প্রভৃতি সিদ্ধ মহাত্মাদের কাহিনী। এই কাশীধামেই এ'যুগের অবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবও মথুরবাবুর সঙ্গে নৌকাযোগে মণিকর্ণিকাদি পঞ্চতীর্থ দর্শনে যাত্রাকালে তাঁর ভাবনেত্রে দর্শন করেছিলেন ঃ

"পিঙ্গলবর্ণ জটাধারী দীর্ঘাকার এক শ্বেতকায় পুরুষ গম্ভীর পদ-ক্ষেপে শ্মশানে প্রত্যেক চিতার পার্শ্বে আগমন করিতেছেন এবং প্রত্যেক দেহীকে সযত্নে উত্তোলন করিয়া তাহার কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম প্রদান করিতেছেন—সর্বশক্তিময়ী শ্রীশ্রীজগদম্বা স্বয়ং মহাকালীরূপে জীবের অপর পার্শ্বে সেই চিতার উপর বসিয়া তাহার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ প্রভৃতি সকল প্রকার সংস্কার-বন্ধন খুলিয়া দিতেছেন এবং নির্বাণের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া স্বহস্তে তাহাকে অখণ্ডের ঘরে প্রেরণ করিতেছেন।"

এখানেই শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ আগমন করেছেন বহুবার। স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও অভেদানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের শিষ্যগণ এখানে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেছেন তপশ্চর্যায়। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই পুণ্যধামেই অবস্থান করে দেহত্যাগ করেন স্বামী অদ্ভুতানন্দ (লাটু মহারাজ)। তিনি অনেক সময় ভক্তদের নিকট বিশ্বনাথজীর সাক্ষাৎ দর্শনের কথাও মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন। এ হেন কাশীধামে মন স্বতঃই একটি বিশেষ আনন্দে তন্ময় হয়ে যায়। দশাশ্বমেধ ঘাটের স্বচ্ছ জলে স্নান সেরে চলেছি বিশ্বনাথ ও বিশ্বজননী অন্নপূর্ণা দর্শনে। পথিমধ্যে মাল্যপুষ্পাদি ক্রয় করে মন্দিরের গলিপথে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডাদের দল এসে উপস্থিত। তাদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে বিশ্বনাথজীর মস্তক স্পর্শ করে মাল্যপুষ্পাদি নিবেদন করে দিলুম। সেখান হতে বিশ্বজননী অন্নপূর্ণা মন্দিরে প্রবেশ করে তাঁর উদ্দেশেও নিবেদন করে দিলুম পূজোপকরণ। আমাদের সহযাত্রীদের অধিকাংশ তখনও মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন নাই। প্রত্যাবর্তন পথে সাক্ষাৎ হল কয়েকজনের সঙ্গে। গলির বাহির পথে এসে একখানি রিক্শা ধরে চলে গেলুম কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে যাত্রান্তে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে শেষ প্রণতি জানাতে। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অপূর্বানন্দজীর সঙ্গে গোমুখ যাত্রার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী কৈবল্যানন্দজীর (যোগী মহারাজ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ও প্রণাম জানিয়ে রবিবাবুর কথামত নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হলুম—যেখান হতে সমবেতভাবে যাত্রীদের মোগলসরাই অভিমুখে যাত্রা হবে শুরু। ইতিমধ্যে আপন আপন সুবিধামত অনেকেই কিন্তু রওনা হয়ে গেছেন বাসযোগে মোগলসরাই অভিমুখে। আমরা কয়েকজন দু'খানি ট্যাক্সি করে পৌঁছে গেলুম মোগলসরাই বেলা এগারটার পূর্বেই। বারোটার মধ্যে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করে বিশ্রাম নিতে লাগলুম। বেলা ২-১০ মিনিটে দিল্লী এক্সপ্রেসের সঙ্গে আমাদের

কোচটি যুক্ত হয়ে ছুটল হাওড়া অভিমুখে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুটি কামরার যাত্রীরা পরস্পর প্রণাম ও নমস্কার বিনিময়ের মাধ্যমে একুশ দিনের মধুর সম্পর্কের বিচ্ছেদজনিত সূচনা-পর্বের উদ্‌যাপন করলেন। পাটনায় নেমে গেলেন শ্রীমতী পুষ্প ব্যানার্জী ও মীরা গুপ্ত।

দিল্লী এক্সপ্রেস ছুটে চলছে হাওড়া অভিমুখে। রাত্রি তিনটের মধ্যে তন্দ্রা টুটে গেল—যাত্রাপথের টুকরো টুকরো কত কথাই মনের ওপর ভেসে উঠছে, এ'সবকে অতিক্রম করেও যে কথাটি বার বার মনে জাগছিল—তা' হল হিমালয়ের আকর্ষণের কথা। সত্যই হিমালয়ের বিজন প্রদেশের একটি প্রলোভন আছে। অজ্ঞাতসারে তা যেন সর্বকালেই ডাক দিয়ে চলেছে সকল মানুষকে আবিষ্কারক, অভিযানকারী, তীর্থযাত্রী, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ ও সর্বহারা সন্ন্যাসীদেরও। পর্বতমালার সুবিস্তৃত মহিমা, দূর দিগন্তে গগনচুম্বী চিরতুষার কিরীটমালা, ফুলে-ফলে ও গাছপালায় শোভিত সুন্দর ও ছবির মতো উপত্যকাগুলি, ত্রিভুজাকৃতি বড় বড় ফার ও পাইন গাছের সারি, মনোরম, মনোহর বক্রগতি পার্বত্য স্রোতস্বিনীর স্বচ্ছ জলধারা আর সেই সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন নির্জনতা ও নিস্তব্ধতায় রচিত স্বর্গীয় পরিবেশের শান্ত সমাহিত শান্তি—এ সমস্তই মানুষের অন্তরে এক অপ্রতিরোধনীয় আকুতি জানায় ও স্বর্গীয় সুষমার সৃষ্টি করে। এর বিশেষ একটি সৌন্দর্যময় লাবণ্য ও আকর্ষণী শক্তি আছে।

সকাল ৬-৪৫ মিনিটে ট্রেন থামল হাওড়া ষ্টেশনে। মুহূর্ত মধ্যেই বিশাল জনতার মধ্যে একে একে অদৃশ্য হয়ে গেলেন সকলেই একুশদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে। একে অপরের সঙ্গে এমনি করেই মুহূর্ত মধ্যে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াই সংসারের চিরন্তন রীতি।

॥ পশুপতিনাথ (নেপাল) ॥

এক

॥ হাওড়া—রক্সৌল ॥

জন্মলগ্নের সঙ্গে যে দেবতাটির সম্পর্ক আবার তিনি ডাক দেন। তাই গড়িমসি করে অবশেষে কুণ্ডু স্পেশ্যালের স্ট্র্যাণ্ড রোড অফিসেই উপস্থিত হলুম—১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শিবরাত্রি উপলক্ষে পশুপতিনাথ যাত্রার উদ্দেশ্যে। সেই পৌরাণিক আখ্যায়িকা ঃ জ্ঞাতি বধের দুর্বহ বোঝার ভারে হিমালয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার অভিপ্রায়ে পাণ্ডবদের মহাদেবকে খুঁজে বের করার কাহিনী। শিব কিন্তু তাঁদের গোত্রহত্যা দোষে দোষী জেনে মহিষরূপে পৃথিবী ভেদ করে আত্মগোপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। বায়ুবেগে ভীম যে স্থানটিতে তাঁর পশ্চাদ্দেশ স্পর্শ করে ফেলেন সেটিই হল কেদারতীর্থ। অগ্রভাগ আত্মপ্রকাশ করে নেপালের পশুপতিনাথে, দেহের অপর চারি অংশ নাভি, বাহু, জটা ও মুখ যথাক্রমে মধ্যমহেশ্বর, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ ও কল্পেশ্বরে। কেদারনাথ সহ এই চারিটি স্থানের নামই পঞ্চ কেদার, যাঁদের পক্ষে সবগুলি দর্শন করা সম্ভব হয় না—তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হয় কেদারনাথ ও পশুপতিনাথ দর্শন করেই। একেও দেবাদিদেব মহাদেবের পূর্ণ দর্শন বলা হয়। তাই এবারের যাত্রা শুরু।

কিন্তু স্ট্র্যাণ্ড রোড অফিসে গিয়েই শুনি পশুপতিনাথ যাত্রার দ্রুতগামী ট্রেনের সঙ্গে সংযুক্ত কোচটির সব আসনগুলিই ভর্তি—এমন কি যাতায়াত পথের (passage seat) আসনগুলিও। অগত্যা এবারের যাত্রা স্থগিত রেখে ফেরার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। কিন্তু অলক্ষ্যে যিনি আকর্ষণ করছেন তাঁর ইঙ্গিত বোঝে কে? কুণ্ডু স্পেশ্যালের কর্তৃপক্ষ সুকুমারবাবু বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে বললেন, "একটা ব্যবস্থা হতে পারে, এক রাত্রি যদি একটু কষ্ট করে যেতে

পারেন। তারপর সমস্তিপুর হতে 'মীটার গেজের' গাড়ীতে পেয়ে যাবেন টু-টায়ারে একটি সংরক্ষিত আসন।" রাজী হয়ে গেলুম সুকুমারবাবুর প্রস্তাবে। ২০শে ফেব্রুয়ারী যাত্রার দিন সকালের দিকে কলকাতায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। ফরওয়ার্ড ব্লক রাজনৈতিক দলের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান্ নেতা শ্রীহেমন্তকুমাব বসু মহাশয় নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে উগ্রপন্থীদের হাতে ছুরিকাহত হয়ে নিহত হন। ফলে সমগ্র শহরে বিশেষ করে উত্তর কলিকাতায় পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়। সর্বপ্রকাব যানবাহন বন্ধ। বহু কষ্টে একখানি রিক্শা সংগ্রহ কবে হাওড়া ষ্টেশনে পৌছলুম রাত্রি ৯-৩০ মিনিটে। ষ্টেশনে উপস্থিত হয়ে শুনি অনেকেই অপেক্ষা কবছেন বৈকাল ৪টা হতে। ঘোরা ফেরা কবতেই সাক্ষাৎ হয়ে গেল যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী ও গোমুখেব সহযাত্রী শ্রীমতী আরতি বসুমল্লিক, কাজল চৌধুবী ও কালনা হতে আগত অবনীবাবুদেব একটি দলের সঙ্গে। পবিচিত পরিবেশ স্বভাবতঃই মানুষের মনে একটু আনন্দের দোলা দিয়ে যায়।

"মিথিলা এক্সপ্রেস" চলতে শুরু করল রাত্রি ১০-১৫ মিনিটে। স্থান পেয়ে গেলুম যাতায়াতের পথে (passage seat) ম্যানেজারের জন্য সংরক্ষিত একটি আসনে। কর্তৃপক্ষের তরফ হতে সঙ্গে চললেন বয়সে তরুণ ম্যানেজার শ্রীসুভাষ কুণ্ডু ও এ্যাসিষ্টেন্ট ম্যানেজার হিসাবে বাসুদেববাবু। ২১শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৮-৩০ মিনিটে কিউল ও ১০-১৫ মিনিটে বরৌণী হয়ে একেবারে সমস্তিপুর পৌছলুম বেলা একটায়। পথিমধ্যে বরৌণী সেতুর সন্নিকটেই চকিতে দেখে নিলুম বরৌণী তৈল শোধনাগারটি। সমস্তিপুরেই সমাপ্ত হল স্নানাহারের পর্ব। এবারের যাত্রায় সহযাত্রীদের সঙ্গে আলাপের সুযোগ ছিল কম—ছিলুম একক, বিচ্ছিন্ন। যাতায়াতের পথে কচিৎ দু' একটি বাক্যালাপের অবকাশ পরিচিত সহযাত্রীদের সঙ্গে।

বৈকাল ৪টায় মীটার গেজের গাড়ী চলতে শুরু করল সমস্তিপুর

হতে মন্থর কূর্মগতিতে রক্সৌল অভিমুখে। সন্ধ্যা ছ'টায় পৌঁছলুম দ্বারভাঙ্গা। সেখান হতে রাত্রি ১২টার পর গাড়ীখানি ছাড়ার কথা জ্ঞাত হয়ে অনেকেই বেরিয়ে পড়লুম সাইকেল রিক্‌শা যোগে দ্বারভাঙ্গা মহারাজের কাননঘেরা রাজপ্রাসাদ দর্শনে—যাঁর মুক্তহস্তে দানের খ্যাতি জড়িয়ে আছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। আম্রকানন ও বিবিধ বৃক্ষশ্রেণী শোভিত মহারাজার বিশাল প্রাসাদপুরী ও নিভৃত প্রাসাদ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বরী শ্যামা ও লক্ষ্মেশ্বরী তারামূর্তি দর্শন করে ফিরে এলুন টুরিষ্ট কোচে। রামেশ্বরী শ্যামা ভীষণদশনা—লক্ষ্মেশ্বরী মূর্তি শান্ত। মূর্তি দুটির গঠন-সৌষম্য ও তৎসহ মন্দির পরিবেশ দর্শকচিত্তে ভক্তিভাবের উদ্রেক জাগায়।

নৈশভোজনের পর রাত্রি ১২-৩০ মিনিটে দ্বারভাঙ্গা হতে গাড়ী চলতে লাগল রক্সৌলের দিকে। ২২শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৭টায় পৌঁছে গেলুম রক্সৌল। এখান হতেই শীতের আমেজ অনুভূত হতে লাগল। তিন মাইল এগিয়ে গেলেই ভারত সীমান্ত বীরগঞ্জ। বেলা ৮টায় প্রাতরাশের পর সারিবদ্ধ টাঙাগুলি চলতে শুরু করল পীচঢালা সমতল পথে বীরগঞ্জ অভিমুখে পশ্চাতে রেখে দুপাশে সজ্জিত রক্সৌলের বাজার। বেলা ৯টার মধ্যেই পৌঁছে গেল টাঙাগুলি একটা তরাইয়ের প্রান্তসীমায় বীরগঞ্জে। হরেক রকম গাড়ী-ঘোড়ার সমাবেশ এখানে। গরুর গাড়ী, সাইকেল রিক্‌শা হতে শুরু করে লরী, প্রাইভেট কার, ষ্টেশন-ওয়াগন, বাস সবই। এখান হতে কাঠমাণ্ডুর দূরত্ব ১২৪ মাইল। পৌঁছতে সময় লাগে ৮-১০ ঘণ্টা। আচ্ছাদনবিহীন লরীতে বহু লোক যাতায়াত করছে অল্প ভাড়ায় এই ১২৪ মাইল পথ। ভারতীয় চেক্‌পোষ্টও এখানেই। কর্তৃপক্ষের কল্যাণে কিনা জানি না আমরা নিরাপদেই পার হয়ে এলুম চেক্‌পোষ্টটি।

দুই

॥ বীরগঞ্জ—কাঠমাণ্ডু ॥

কুণ্ডু স্পেশালের ব্যবস্থামত যাত্রা শুরু হল দেড়খানি বাসভর্তি যাত্রীদের কাঠমাণ্ডু অভিমুখে। রক্সৌল হতে বামপার্শ্বে চলেছে একটি "ন্যারো গেজ" রেলপথ আমলেখগঞ্জ পর্যন্ত। বাসের কল্যাণে বর্তমানে কোন যাত্রীবাহী গাড়ী যাতায়াত করে না এ পথে। বীরগঞ্জ শহরের মাঝপথ বেয়ে চলেছে আমাদের বাসখানি। দেখছি দু'পাশের বাড়ীঘর, বাজার, হাট ও হোটেল রেস্তোরাঁ। শুনলাম স্কুল, কলেজ ও অফিস সহ বীবগঞ্জ নেপালের একটি বৃহত্তর শহর। ভারত সীমান্তেব বীরগঞ্জ শহর হতে ভঁইসে পর্যন্ত এই যে মোটর মার্গটি তার সঙ্গে ত্রিভুবন রাজপথযুক্ত হয়ে পৌঁছে গেছে সরাসরি কাঠমাণ্ডু।

ডাইনে বামে, পশ্চাতে সম্মুখে ঘন বন, তারই মাঝে পীচঢালা পথে ছুটে চলেছে বাসখানি। বীরগঞ্জ হতে ২৪ মাইল পথ অতিক্রম করে একটি অরণ্য-সমাচ্ছন্ন পর্বতপ্রান্তে এসে থেমে গেল যন্ত্রযানটি ১১-৪৫ মিনিটে। পৌঁছে গেলুম আমলেখগঞ্জ। পূর্বে এ পর্যন্ত ট্রেনে এসে যাত্রীরা বাস কিংবা লরীযোগে যাত্রা করতেন 'ভীমফেরী' তারপর ডাণ্ডী বদল করে ট্যাক্সি নিতে হতো থানকোট হতে কাঠমাণ্ডু পর্যন্ত। এখন সরাসরি বাস চলছে বীরগঞ্জ হতে কাঠমাণ্ডু। সামান্য কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিয়ে উঁচু-নীচু, আঁকা-বাঁকা পথে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলে চলতে লাগল বাসখানি। আশেপাশে অনুন্নত পর্বতশ্রেণী। এইভাবে চলতে চলতে বেলা ১২-২৫ মিনিটে ছায়াঘন একটি উপত্যকায় এসে পৌঁছলুম। নাম হেতৌরা (Hetauda)। উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৫০০´ ফুট। আমলেখগঞ্জ হতে ১৩ মাইল পথ। চোখে পড়ল বিরাট "রোপওয়ে" বামপার্শ্বের পাহাড়গুলি অতিক্রম করে কোণাকুনি চলে গেছে এখান হতে ২৮ মাইল পথ। ঘন্টায় ২০ টন হিসাবে পণ্যদ্রব্য

আসছে কাঠমাণ্ডু হতে। অনেকের মতে এটি পৃথিবীর অন্য বৃহত্তর "রোপওয়ে"। পাহাড় পথের এই ২৮ মাইল দীর্ঘতর হয়ে ৮৭ মাইল রাজপথে পরিণত হয়েছে। সেই পথ ধরেই সর্পিল গতিতে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে বাসখানি ছুটে চলল। একদিকে ঘন সবুজ অরণ্যানী অন্যদিকে হলুদ রঙের ফসলের বিচিত্র সম্ভার দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলুম মহাভারত পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত ভঁইসে। এখানেই প্যাকেট ব্যবস্থায় শেষ হল আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের পর্ব। স্থানটিতে ছোট একটি বাজার আছে। সম্মুখেই হোটেল রেস্তোরাঁও। বহু লোকজন মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নিচ্ছেন। নেপালী মহিলারা অনেকেই সেখানে পরিবেশিকার কাজ করছে। এখান হতেই শুরু হল "ত্রিভুবন রাজপথ" প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালকে ভারতের উপহার। ভারতকে বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে এই রাজপথটি নির্মাণে।

আমাদের যন্ত্রযানটি ২টার মধ্যেই ভঁইসে ছেড়ে চড়াই পথে ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল ৮২০০´ ফুটের মাথায় সিম্ভাজীয়াং পাহাড়ের দিকে। দুপাশে রডোডেনড্রনগুচ্ছ শোভিত রাজপথ, তারই মাঝে ঘুরে ঘুরে ক্রমেই চতুষ্পার্শ্বস্থ অনুন্নত পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করে বাসখানি উঠে এল পর্বতটির শীর্ষদেশে। এখান থেকে পর্বতশীর্ষগুলির দৃশ্য অতি মনোরম দেখায়। অবশ্য এ দৃশ্য তাঁদের কাছে নতুন কিছু নয় যাঁরা দেখেছেন অমরনাথ যাত্রা পথে ১৪০০০´ ফুট উচ্চ গিরিপথ অতিক্রম কালে গগনস্পর্শী তুষার-ধবল শৃঙ্গমালার বিচিত্র ও বিস্ময়কর সব দৃশ্য। ব্রেক্ টিপে টিপে নীচের দিকে নামছে বাসখানি— অনতিদূরে দৃষ্ট হচ্ছে "ঘণ্টাঘরের (clock tower) মত একটি উচ্চ স্তম্ভ। নেমে এলুম ৮০০০´ ফুটের মাথায় দামন বলে একটা অধিত্যকায় বীরগঞ্জ হতে ৭৮ মাইলের কিছু কম বেশী পথ অতিক্রম করে। এখানে এলে মনে হয় হিমালয় যেন তার রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে দিয়েছে। সমগ্র উত্তর-পূর্ব দিগন্তব্যাপী তুষার-কিরীট

হিমালয় গিরিশ্রেণী। দূর দিগন্তে "সাগরমাথা" (মাউন্ট এভারেষ্ট) পর্বত। অপরদিকে পশ্চিম হিমালয়ের ধবলগিরি, অন্নপূর্ণা, হিমালছুলি ও মানাসলু প্রভৃতি পর্বতমালা অপূর্ব সৌন্দর্যসম্ভারে সমুন্নত। কত অজানা পর্বতেব শৃঙ্গগুলি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আকাশের নীলিমা অবরোধ করে। চতুষ্পার্শস্থ উত্তুঙ্গ পর্বতমালার সুশোভন দৃশ্যাবলী দর্শনের সুবিধার্থে পর্যটকদের জন্য এখানে ১৯৬৩ সালে নির্মিত হয়েছে একটি সুউচ্চ স্তম্ভ (টাওয়ার)। নিকটেই "এভারেষ্ট পয়েণ্ট হোটেল ও রেস্তোরাঁ"। ইচ্ছা করলে ভ্রমণবিলাসীরা এখানে অবস্থান করে এসব নিসর্গ শোভার অপরূপ, অনির্বচনীয় ও অপ্রতিন্দ্বীরূপ চাক্ষুষ করতে পারেন। দামনের রূপসী রূপ ছেড়ে বাসখানি ক্রমেই নীচে নামছে সোনালী-উপত্যকা ও পর্বতশীর্ষ ছুঁয়ে-ছুঁয়ে। পথের ছু'ধার রাঙা হয়ে আছে ফুলে ফুলে, রঙে-রঙে, রডোডেনড্রনগুচ্ছের রক্তিমাভায়। ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে আসতে শুরু করেছে নানা জাতের প্রজাপতি ও পাখিরা। দূরে, আরও দূরে পটে-আঁকা ছবির মতো সুন্দর একটি উপত্যকা—নেমে এলুম ৩০০০´ ফুট নীচে পালং-এ। পথের ছু'ধারে ঘরগুলি বেশ পরিপাটি। কোনটা একতলা, কোনটা বা দোতলা। কোনটা দূরে পাহাড়েব দেওয়ালের গায়ে গায়ে—কোনটা আবার পাহাড়ের পাদদেশে। দেওয়ালেব অর্ধেকটা গিরিমাটি দিয়ে রং-করা অর্ধেকটায় চুন দেওয়া। পালং ছাড়িয়ে বাসখানি পাহাড় ঘেরা পথে পুনরায় চলতে লাগল উপরের দিকে চড়াই পথে। সামনে বিশাল পর্বত পথরোধ করে দাঁড়িয়ে—সেটি অতিক্রম করে পৌঁছে গেলুম টিষ্টুং বৈকাল ৫টায় পালং থেকে ৪৫ মিনিটের মধ্যে। রক্সৌল হতে অতিক্রম করে এলুম ৮৮ মাইল পথ। এখানে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম চা-জলখাবারের জন্য। কয়েকটি নেপালী চায়ের দোকান, রেস্তোরাঁ এই নিয়ে ছোট একটি গ্রাম টিষ্টুং। শীতের প্রকোপ বেশ অনুভূত হতে লাগল এখান হতেই। আধ ঘণ্টা বিশ্রামের পর যন্ত্রযানটি চলতে শুরু করল উঁচু-নীচু রাজপথ বেয়ে। সন্ধ্যা

৭-৩০ মিনিটে সোফিয়াং ও খানিখোলা অতিক্রম করে চলে এলুম। এখান হতে কাঠমাণ্ডু আর ১৬ মাইল। এ পথে নানা জাতের যানবাহন চলাচল চলছে। কেউবা লরীতে দাঁড়িয়ে, কেউবা প্রাইভেট কারে, কেউবা ষ্টেশন ওয়াগনে। আমরা চলেছি কুণ্ডু স্পেশ্যালের সংরক্ষিত বাসে। চলতে চলতে বাসটি থামল এসে থানকোটে টোল ট্যাক্স দিতে। থানকোট হতে কাঠমাণ্ডু উপত্যকার সরাসরি যোগাযোগ। মাত্র ৫ মাইল পথ। কিছুক্ষণ এগিয়ে যেতেই শুরু হল পথিপার্শ্বে সারি সারি বাড়ী। প্রবেশ পথে কেমন একটা খাপ ছাড়া ভাব। অবিন্যস্ত একটি শহর। উচ্চতা ৪২০০´ ফুট। কিন্তু যতই তার অন্দরমহলে প্রবেশ করি ততই চোখে পড়তে থাকে আলো ঝলমল সুবিন্যস্ত শহরের রূপটি। যেন নানা দেশের নানা আভরণে সজ্জিতা কোন তিলোত্তমা স্বাগত জানাচ্ছে পরবাসী অতিথিদের। পৌঁছে গেলুম কাঠমাণ্ডু রাত্রি ৯টায় রক্সৌল হতে ১২ ঘণ্টা পর। মোটর-চালকের খানা-পিনা আর পথিমধ্যে দোস্তদের সঙ্গে হাসি-তামাশাই এই বিলম্বের কারণ। রাজপথের ওপরেই নব-নির্মিত রাজভবন। সেখান হতে ৫।৬ মিনিটের দূরত্বের ব্যবধানে বাম পার্শ্বে সামান্য একটু গলিপথে “হোটেল অপেরা” এখানেই আমাদের ৫ রাত্রি বাস।

॥ কাঠমাণ্ডু ॥

সীমান্তব্যাপী হিমালয়ের তুষারাচ্ছন্ন পর্বতক্রোড়ে অবস্থিত অপরূপ কিংবদন্তীর দেশ স্বাধীন সার্বভৌম নেপাল রাষ্ট্রের রাজধানী এই কাঠমাণ্ডু। উত্তরে তিব্বত ও সাধারণতন্ত্রী চীন, দক্ষিণে ভারতের মহান ভূখণ্ড। এই উপত্যকার সঙ্গে আরও দুটি শহর ললিতপুর (পত্তন) ও ভক্তপুর (ভাদ্‌গাঁও) যুক্ত হয়ে বৃহত্তর কাঠমাণ্ডুর সৃষ্টি করেছে। লোকসংখ্যা যথাক্রমে ১,৫৯,২৩০; ১,৩৫,২৩২ ও ৮৪, ২৪২। পাশাপাশি বাস করছে প্রাচ্যের দুটি বৃহত্তর ধর্মের মানুষ বৌদ্ধ ও হিন্দু এবং এই দুটি ধর্মই নেপালের প্রধান ধর্ম। মূলতঃ

এব অধিবাসীবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, নেওয়ার, লেপ্‌চা, শেবপা ও গুরুং প্রভৃতি। নেপালী ভাষাই এদেব বাষ্ট্রভাষা। শিক্ষিত জনগণই কেবলমাত্র ইংবাজীতে কথাবার্তা বলে থাকেন। জুন, জুলাই ও আগষ্ট এই তিনমাস ব্যতীত কাঠমাণ্ডু সব সময়েই পর্যটকদেব পক্ষে মনোবম। এই উপত্যকাটিব উৎপত্তি সম্বন্ধে ছড়িয়ে আছে নানা কিংবদন্তী আব উপকথা, যেমন আছে কাশ্মীব সম্বন্ধে। "এক সময়ে কাঠমাণ্ডু ছিল জলভবা হ্রদ—নানা প্রাণী ঘুবে বেড়াত সেখানে। কোন পদ্মফুল পর্যন্ত ফুটত না—মানুষেব চিহ্নতো দূবেব কথা। কালে পবিবর্তন ঘটল এই অবস্থাব। দেবতাব আশীর্বাদে ধন্য হয়ে উঠল সেই জল-পুবী। একদিন ভগবান বিপাস্য বুদ্ধ এলেন ওখানে এবং এসেই একটি পদ্মকোবকেব ওপব মন্ত্রোচ্চাবণ কবে সেটিকে হ্রদের জলে ছুঁড়ে দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী কবলেন তিনি—এই কোবক থেকে যখন পদ্ম ফুটবে, তখন এখানে আবির্ভূত হবেন জ্যোতির্ময় স্বয়ম্ভু একটি শিখাব আকাবে।

এই ঘটনাব দীর্ঘদিন পবে একদিন শিখিবুদ্ধকে বলতে শোনা গেল, হ্যাঁ এখানেই, এই পুণ্য পুবীতেই একদিন তাঁব আশীর্বাদেব আলোক ছড়াবে। সেদিন কত লোক আসবে এখানে, আসবে কত তীর্থযাত্রী ও পর্যটক। তৃতীয় বুদ্ধ বিশ্বম্ভু ভবিষ্যদ্বাণী কবলেন, ধনে জনে এ' অঞ্চল ঠিক একদিন ভবে উঠবে। কিন্তু তাব আগে একজন বোধিসত্ত্বেব আবির্ভাব হওয়া চাই।

এ হ্রদের নীচে যে মৃত্তিকা আছে তাব গায়ে সূর্যকিরণ লাগা চাই। বহু বাঞ্ছিত সূর্যকিরণ সত্যিই একদিন লাগল। জল সবে গিয়ে মৃত্তিকা দেখা দিল।

একদিকে সনাতনপন্থীরা বলেন, কাঠমাণ্ডু উপত্যকার মুক্তির মূলে আছেন বিষ্ণু বা কৃষ্ণ। অপরদিকে বৌদ্ধদের মত হল, মঞ্জুশ্রী মুক্তি দিয়েছেন একে। মঞ্জুশ্রী দেখলেন, হ্রদের জলকে ইচ্ছা করলেই সরিয়ে দেওয়া যায়। ইচ্ছা করলেই নূতন একটা স্থলভাগ উপহার দেওয়া

যেতে পারে বিশ্বলোককে। খড়্গপাণি তিনি। সেই খড়্গ দিয়ে পাহাড়ের কিছুটা স্থান যদি তিনি কেটে দেন, তবে হ্রদের সব জল স্বচ্ছন্দেই বেরিয়ে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত কাটলেন তিনি পাহাড়। বাগমতী নদী বরাবর হ্রদের সব জল দিলেন বের করে। দেখতে দেখতে সূর্যকিরণ লাগল এসে হ্রদের তলস্থ মৃত্তিকায়। জন্ম হল কাঠমাণ্ডু উপত্যকার। তখন মঞ্জুশ্রীর শিষ্যেরা বললেন, পদ্মফুল ফুটেছে এতদিনে। স্বয়ম্ভু আবির্ভূত হয়েছেন সেখানে অতএব স্তূপ গড়ো। পদ্মফুল যেখানে ফুটেছে ঠিক সেখানেই স্বয়ম্ভুনাথের পুণ্যতীর্থ গড়ে তোল। কাঠমাণ্ডু শহরের ঠিক পশ্চিম দিকে গড়ে উঠল স্বয়ম্ভুনাথ স্তূপ।"

এসব কিংবদন্তীর কথা বাদ দিয়ে ইতিহাসের নিরীখে বিচার করলেও আমরা দেখতে পাই ৭২৩ খৃষ্টাব্দে গুণকামদেব প্রতিষ্ঠা করেন শহরটিকে ৪২০০´ ফুট উচ্চ এই উপত্যকাটিতে বাগমতী নদীর সঙ্গম-স্থলে। তখন তার নাম ছিল "কান্তিপুর" বা "City of glory"। যেহেতু তার কান্তি বা যশোগাথা ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ-বিদেশে, দূর হতে দূরান্তরে। সুখে সম্পদে ভরা শিক্ষা-দীক্ষায় মহিমময় কাঠমাণ্ডুর মন্দির-স্থাপত্যও যে ছিল উচ্চমানের তার পরিচয় মেলে চৈনিক পরিব্রাজকদের বর্ণনায়। সারা নেপাল চলতো তখন পশুপতিনাথকে স্মরণ করে। মুদ্রায় ছিল পশুপতিনাথের প্রতীক।

খ্রীষ্টজন্মের ২৫০ শত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ কান্তিপুর প্রতিষ্ঠার আরও দেড় হাজার বছর পশ্চাতে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীভরমের এক পরাক্রান্ত নৃপতি ধর্মদত্ত তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন কাঠমাণ্ডু উপত্যকায়। নির্দেশ দেন তাঁর সৈন্যদের এই সুন্দর সুখী উপত্যকায় গড়ে তুলতে একটি মন্দির। বিলম্ব হল না—রাজাদেশে দেখতে দেখতে গড়ে উঠল বাগমতী তীরে এক বিরাট মন্দির—পশুপতিনাথের মন্দির। সঙ্গে সঙ্গে পশুপতি মহল্লা। এককালে যেখানে শুধু বাস করতেন ব্রাহ্মণেরাই—আজ সেখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য সব জাতিরই বাস। সেই যে পশুপতিনাথের পৌরোহিত্য গ্রহণ করলেন দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণেরা আজও সে রীতি রয়েছে অব্যাহত—যেমন আছে বদরীনারায়ণে। কোন্ স্মরণাতীতকালে এসেছিলেন অশোকত্বহিতা চারুমতী। এখানেই ঘর বেঁধেছিলেন রাজনন্দিনী স্বামী দেবপালকে নিয়ে। বৌদ্ধ ও হিন্দুর সম্মিলিত দেবতা পশুপতিনাথ। আজও তাই বৎসরান্তে উভয় ধর্মের জনগণ ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন এই দেবতার চরণে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে। যেমন শ্রাবণী-পূর্ণিমার দিনটিতে হিন্দু মুসলমান একত্রে প্রণাম জানিয়ে কৃতার্থ হন অমরনাথের তুষারলিঙ্গে। তাইতো শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে দর্শনপ্রার্থী হয়ে এসেছেন কিশোর কিশোরী, যুবক যুবতী, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র—জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই।

২৩শে ফেব্রুয়ারী শিবরাত্রি। কুণ্ডু স্পেশ্যালের ব্যবস্থামত সংরক্ষিত বাসে আমরাও চলেছি পশুপতিনাথ দর্শনে। বেলা ৯টার মধ্যেই রওনা হয়ে শহর থেকে প্রায় ৩ মাইল পূর্বে মন্দিরচত্বর হতে প্রায় এক ফার্লং দূরে পশুপতি মহল্লায় পৌঁছে দিয়ে গেল আমাদের বাসখানি। মন্দিরের প্রবেশপথের দুধারে সারি সারি দোকান আর জটাজুটধারী কিছু সাধুসন্ন্যাসীর সমাবেশ। দোকানগুলিতে হরেক রকম মালা, পাথর, ফুল ও পূজোপকরণাদি। দোকানগুলির শেষ যেখানে সেখান হতেই আরম্ভ মন্দিরচত্বর। আজ আর চত্বর বলে নির্ণয় করার কিছু উপায় নেই, অগণিত জনস্রোত। ক্রমে বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে জনকল্লোল হয়ে উঠেছে উদ্বেল। মন্দিরের গর্ভগৃহে উপস্থিত হয়ে দেব-দর্শনই এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। বলিষ্ঠ নেপালী দ্বারপাল ও স্বেচ্ছা-সেবকগণ হিমসিম্ খাচ্ছে জনস্রোত নিয়ন্ত্রণে। একের পর এক সারি দিয়ে চলতে চলতে উপস্থিত হলুম গর্ভমন্দিরে। দূর হতে উদ্দেশে পুষ্প ও মাল্য নিবেদন করে মন্দির প্রদক্ষিণকালে দর্শন করলুম চতুর্মুখ শিবলিঙ্গকে প্রদীপ্ত অনুভূতি দিয়ে। শতাব্দীর পর শতাব্দী লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী এসে এই যে অন্তরের ভক্তি নিবেদন করে গেছেন তা কি

ব্যর্থ হবার জো আছে, তাইতো পাষাণ দেবতাও ক্ষণিকের জন্য মূর্ত হয়ে ওঠেন মনের মণিকোঠায় এক অপূর্ব অনুভূতির আস্বাদে। একদিকে বাগমতী অপরদিকে বনাচ্ছাদিত পাহাড়ভূমি, তারই ক্রোড়ে প্যাগোডা আকারের অপূর্ব, অবিস্মরণীয় এই দেব-দেউল। দুই ছাদযুক্ত স্বর্ণমণ্ডিত মন্দিরচূড়ায় সৌরকিরণ প্রতিফলিত হয়ে জ্বল্ জ্বল্ করছে তার শীর্ষদেশ—রূপের ঝলকে মনে হয় চোখ ঠিকরে পড়ছে। এ এক অপরূপ, চোখ-ধাঁধানো, মন-ভোলানো মন্দির। হবেই না বা কেন ? অন্নপূর্ণা যাঁর ঘরণী—মণি-মাণিক্য, সোনা-রূপার তাঁর অভাব কোথায় ? তাইতো সাধককবি গেয়েছেন "কত মণি পড়ে আছে ওই চিন্তামণির নাছদুয়ারে"—অন্ততঃ পশুপতি মন্দিরে এসে এ কথা বিশ্বাস করতে হবে অতি বড় অবিশ্বাসীকেও। দেবাদি-দেবের অতন্দ্র প্রহরী মন্দিরসম্মুখস্থ বিশাল দেহ যে বৃষটি তাকে দেখেও মন ভরে যায়। ইতিহাস বলে, ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদে পশুপতি মন্দির নূতন করে গড়ে তুলেছিলেন তৎকালীন কাঠমাণ্ডু-অধিপতি জয়সিংহরামদেব—এখন যে মন্দির আমরা দেখছি এটি তাঁরই কীর্তি। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে নেপালাধীশ অভয়মল্ল পশুপতিনাথের মন্দিরে প্রচলিত করলেন লক্ষহোম ও মহাস্নান—রাজ্যে দুর্ভিক্ষ ও মড়ক প্রশমনকল্পে। তারপর পশুপতি মন্দিরের গঠনে বৈচিত্র্য আনলেন বিদ্যোৎসাহী ও সঙ্গীতজ্ঞ রাজা প্রতাপমল্ল। মন্দিরগাত্রের কারুকার্যের মধ্যেও আনলেন অনির্বচনীয়ত্ব। সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে প্রতাপমল্লের পুত্র নৃপেন্দ্রমল্ল পশুপতি-নাথের প্রহরী বৃষটিকেও করলেন স্বর্ণমণ্ডিত। বললেন, "রাজ-রাজেশ্বরের বাহনের গুরুত্বই কি কম ?" ভীমসেন থাপা উনবিংশ শতকে পশুপতি মন্দিরের তোরণদ্বারগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত করে মন্দিরকে করে তুললেন পূর্ণ।

দর্শনান্তে বাহির চত্বরে এসে বিস্মিত নেত্রে চেয়ে দেখলুম সত্যই পশুপতি মন্দির শুধু অনির্বচনীয়ই নয় অবিস্মরণীয়ও বটে। মন্দিরের

পশ্চিমাঙ্গনে পাশাপাশি দুটি স্তম্ভের উপর সোনালী ধাতু নির্মিত বর্তমান রাজা মহেন্দ্র ও রাণী রত্নার দুটি মূর্তি। রাজা নতজানু হয়ে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করছেন পশুপতিনাথকে—রাণীও অঞ্জলি প্রদানে উদ্যতা। উক্ত প্রাঙ্গণেই রয়েছেন ভূতপূর্ব রাজা-রাণীরাও, তবে তাঁদের স্তম্ভ ও মূর্তিগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। কালচক্রের বিবর্তনে নূতনের আবির্ভাবে পুরাতন পড়ে যায় ঢাকা—নূতন রাজা-রাণীদের আগমনের সঙ্গে বর্তমানের রাজা-রাণীও চলে যাবেন ভূতপূর্বদের দলে। পার্শ্ববর্তী মন্দিরের রক্তচক্ষু কালভৈরবই হয়ে থাকবেন অতীত বর্তমানের নিরন্তর সাক্ষী। কালভৈরব মন্দিরের পরেই প্রতাপমল্ল সংগৃহীত রাশি রাশি শিবলিঙ্গগুলি উন্মুক্ত অম্বরতলে সজ্জিত—এঁদেরও মাহাত্ম্য আছে বৈকি ? কিন্তু পশুপতিনাথ দর্শনের পর সেদিন সে মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি।

হাঁটতে শুরু করলুম পশুপতি মহল্লা হতে আরও এক ফার্লং পূর্বে পাথরের পথ বেয়ে গুহ্যেশ্বরী মন্দিরের দিকে। পথে বাগমতী তীরে আর্যঘাট মহাশ্মশান স্মরণ করিয়ে দেয় উত্তরকাশীর কেদাব-ঘাটের বিরাট শ্মশানের কথা। পশুপতিনাথের বিপুল ঐশ্বর্য দর্শনের পব আর্যঘাটে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াতে হয় কিছুক্ষণ জীবনের অনিত্যতার কথা চিন্তা করে—মনে হয় অনিত্যতাই চরম সত্য—চোখের সামনে যেসব ঐশ্বর্যের ঝলক দেখে এলুম তা মিথ্যা। রাজায়-প্রজায় মিলে মিশে এখানে যে সব এক হয়ে গেছে আর্যঘাট তারই সাক্ষ্য। রাজা ত্রিভুবন হতে আরম্ভ করে দীনতম প্রজাটিরও শেষকৃত্য সমাপন হয়েছে এখানেই। চলে এলুম বাগমতীর অপর পারে গুহ্যেশ্বরী মন্দিরের সন্নিকটে সঙ্গে সহযাত্রী শ্রীচক্রবর্তী ও চ্যাটার্জি। চক্রবর্তীর হাতে ক্যামেরা দেখেই তাকে মন্দিরপ্রহরী নির্মমভাবে বিদায় করে দিল মন্দিরপ্রাঙ্গণ হতে। গুহ্যেশ্বরী মন্দিবে ছবি তোলা নিষিদ্ধ। বিষাদভরা মন নিয়ে বাইরে চলে গেলেন শ্রীচক্রবর্তী।

উঁচু উঁচু সিঁড়ি ভেঙ্গে শ্রীচ্যাটার্জির সঙ্গে উঠে এলুম মন্দিরচত্বরে।

গুহ্যেশ্বরী মন্দিরে প্রবেশাধিকার কেবলমাত্র হিন্দুদেরই। পশুপতি মন্দির হতে গুহ্যেশ্বরী আসার এই সহজ সুন্দর পথটি উপহার দিয়েছেন কাঠমাণ্ডুরাজ পৃথ্বীনারায়ণ শা'র যোগ্য পৌত্র জংবাহাদুর—অন্যথায় মানুষ এত সহজে পৌঁছুতে পারত না এই মন্দিরটিতে। বাগমতীর এক পারে পশুপতিনাথ অপর পারে শান্ত স্নিগ্ধ ছায়াতলে দেবী গুহ্যেশ্বরী। পিতার নিকট হতে বিদায় নিয়ে এ যেন মাতৃক্রোড়ে ভক্তের পরমা শান্তি লাভ। সমগ্র মন্দিরটি ত্রিকোণ যন্ত্রের আকারে নির্মিত। পুরাণমতে এটি একান্ন পীঠের অন্যতম। তন্ত্রের কুণ্ডলিনী শক্তির প্রতীক অষ্টধাতু নির্মিত চারটি সাপ মন্দিরচূড়াটি মুকুটের মত বেষ্টন করে রেখেছে। মনে হয় এককালে এটি ছিল তন্ত্রসাধনার বিশেষ স্থান। অঙ্গনতলে একটি গোলাকার পিত্তলের আবরণী (ঢাকনার মত)। সেটি উন্মুক্ত করেই তীর্থযাত্রীগণ পূজাদি নিবেদন করছেন ও স্পর্শ করছেন স্থানটি। একেই পীঠ বা বেদিকা বলা হয়। সাধারণতঃ পীঠস্থানে কোন মূর্তি থাকে না—থাকে আসন ও তৎসহ জলাশয়। মূর্তি পরবর্তী সংযোজন। এখানেও পীঠই প্রধান, মন্দির গৌণ। গুহ্যেশ্বরী সম্বন্ধে প্রচলিত কিংবদন্তী—শোভাবতী হতে এসেছিলেন কনকমুনি নেপালে তীর্থযাত্রায়। মুগ্ধ হলেন তিনি গুহ্যেশ্বরীর মহিমা দর্শনে। পরবর্তী কালে বাংলাদেশের রাজা প্রেমচাঁদদেবকে পাঠালেন নেপালে উক্ত জাগ্রত দেবীর বন্দনা করতে। ভিক্ষুর বেশে একদিন উপস্থিত হলেন প্রেমচাঁদদেব গুহ্যেশ্বরী মন্দিরদ্বারে। শান্তিকরশ্রী নাম নিয়ে বিবিক্ত সন্ন্যাসীরূপে রয়ে গেলেন প্রেমচাঁদদেব। বিস্মৃত হলেন দেশে ফেরার কথা।

সপ্তদশ শতকে প্রতাপমল্ল নূতন করে নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি। ধীরে ধীরে হাজারো লোকের মাঝে চলে এলুম মন্দিরের অঙ্গনতলে, যেখানে পিত্তলনির্মিত আবরণীটি ক্ষণে ক্ষণে উন্মোচন করে ভক্তগণ স্পর্শ করছেন পীঠটি—পূজা দিচ্ছেন অগণিত ধর্মার্থী। তাঁদের মাঝেই ভিড় ঠেলে অগণিত জনতার সঙ্গে স্থানটি স্পর্শ করে মন্দিরে একটি

প্রণাম জানিয়ে এলাম। ধূপে-দীপে, সিন্দুরে-চন্দনে, পুষ্পমাল্যে ভূষিত পার্বতীর চরণে কোন প্রার্থনা জানিয়ে আসিনি সেদিন। মনেও আসেনি। কেবল দু'চোখ ভরে দেখে এসেছি হাজার হাজার মানুষকে ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ করে দিয়ে যিনি গ্রহণ করছেন ভক্তি-অর্ঘ্য সেই বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তির অপূর্ব লীলা। চলতে শুরু করলুম মন্দির-পার্শ্ববর্তী একটি পার্বত্যপথ ধরে চড়াই ভেঙে। পথটির শেষ প্রান্ত গিয়ে পৌঁছেছে রাজরাজেশ্বরের দেউলের সম্মুখে। পথের মাঝে চতুর্দশ শতকে ভক্ত জয়স্থিতিমল্ল নির্মিত তিনটি মন্দির। একটি রাম-চন্দ্রের অপর দুটি লব ও কুশের। রামায়ণ গান ছিল রাজার অতি প্রিয়। রাণীর মৃত্যুর পর হঠাৎ একদিন গান বন্ধ হয়ে গেল। রাজার চিন্তা হ'ল তাঁর মৃত্যুর পরও তো এমনি বন্ধ হয়ে যাবে সব। তাই গড়লেন শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির। আরও দুটি মন্দির লব ও কুশের। কল্পনাপ্রবণ রাজা ভাবলেন যদি একদিন সব বন্ধই হয়ে যায় তখন লব ও কুশ রামায়ণ গান শোনাবেন শ্রীরামচন্দ্রকে। এই মন্দিরত্রয়কে কেন্দ্র করে তাই কিংবদন্তী—রাজার মৃত্যুর পর একেবারে বন্ধ হয়ে গেল রামায়ণ গান কিন্তু আজও লব ও কুশ সেই রামায়ণ গান শোনান রামচন্দ্রকে, সেই সঙ্গে শোনেন রাজা ও রাণী। "রাতের গভীরে পশুপতি মহল্লা যখন হয়ে আসে স্তব্ধ বাগমতী হয়ে ওঠে মূর্তিমতী প্রহেলিকা" তখন নাকি শোনা যায় এই রামায়ণ গান। পৌঁছে গেলুম পশুপতিনাথের সম্মুখ চত্বরে—পুনরায় শেষ প্রণাম জানাতে। তখনও চলেছে অগণিত ভক্তের কাতরকণ্ঠে আবেদন "পশুপতিনাথ কৃপা কর"। ধীরে ধীরে মন্দির ছাড়িয়ে চত্বর, চত্বর ছাড়িয়ে চলে এলুম পশুপতি মহল্লার পথের বাঁকে—তখনও কানে আসছে ভক্তবৃন্দের অস্পষ্ট প্রার্থনা—"হে দেব কৃপা কর, কৃপা কর"। আশ্চর্য এক ভাবাবেগে দেহ মন হয়ে পড়ল অভিভূত। একটার মধ্যে একখানি ট্যাক্সি ধরে চলে এলুম হোটেল অপেরায়, সঙ্গে শ্রীচ্যাটার্জি। অংশীদার জুটলেন সহযাত্রী শ্রীকুসুমার মল্লিক ও তাঁর ভগ্নী।

ফেব্রুয়ারী মাসে কাঠমাণ্ডুর শীতের প্রকোপ কম নয়। তাপমাত্রা ওঠা-নামা করে পঞ্চাশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী ফারেণ-হিটের মধ্যে। দু'খানি র‍্যাগ জড়িয়ে রাত্রি কাটল। কাঠমাণ্ডু হতে শুধু হাতে ফেরা নাকি বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মহিলারা ইতিমধ্যেই কয়েকবার বাজার ঘুরে 'হোটেল অপেরা'তেই শাড়ির শো-রুম বসিয়ে ফেলেছেন। আমাদেরও কয়েকজনের ঔৎসুক্য জাগল কিছু কেনাকাটার জন্য। ১৪শে ফেব্রুয়ারী মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বেরিয়ে পড়লুম সহকর্মী সতীশবাবু প্রদত্ত পরিচয়-পত্র হাতে নিয়ে নেপালপ্রবাসী শ্রীসচ্চিদানন্দ বসুর সন্ধানে। কাঠমাণ্ডুর নিউ রোডে অবস্থিত একটি বিখ্যাত হোটেলের ম্যানেজার তিনি। 'অপেরা হোটেল' হতে ১০ মিনিটের মধ্যেই রত্না পার্ক বাঁয়ে রেখে নিউ রোডের প্রবেশ পথেই বৈদেশিক বিনিময় ব্যাঙ্ক। সেখান হতে ভারতীয় মুদ্রা ১০০৲ টাকার বিনিময়ে ১৩৫টি নেপালী টাকা নিয়ে চলেছি আরও একটু এগিয়ে নির্দিষ্ট হোটেলটির দিকে। সাক্ষাৎ হল শ্রীবসুর সঙ্গে। বেশ অমায়িক স্বভাবের মানুষ তিনি, প্রথম পরিচয়েই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। শুরু হল কাঠমাণ্ডুর বাজার ঘোরা। কেনাকাটা স্বল্পই—উদ্দেশ্য ঘুরে ঘুরে সব দেখা। নিউ রোডের সজ্জিত দু'পাশের দোকানগুলিতে বিদেশী পণ্যের ছড়াছড়ি। জাপান আমদানী করেছে টেরিলিন, ট্রানজিস্‌টার ও ছাতা। চীন হতে এসেছে কলম ও নানা জাতের খেল্‌না—রাশিয়া আমদানী করেছে বিচিত্র সব ছিটের কাপড়। ইউরোপ হতে এসেছে ঘড়ি ও ঔষধপত্র। দু'চোখ ভরে দেখে চলেছি আধুনিক নেপালের এই রূপসজ্জা। ঘুরতে ঘুরতে চলে এলুম কাঠমাণ্ডুর প্রাচীন মহল্লা হনুমান ঢোকার সন্নিকটে। সামনেই প্যাগোডা আকারের তিনছাদ বিশিষ্ট একটি বাড়ী। সচ্চিদানন্দবাবু বুঝিয়ে দিলেন—এটিই হল "কাষ্ঠমণ্ডপ"। কাঠমাণ্ডুর পুরাতন রাজপ্রাসাদের নিকটেই। হঠাৎ মনে হয় কোন একটি আশ্রয়-শিবির। কথিত আছে—একটিমাত্র গাছের গুঁড়ি হতে ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মাণ করান রাজা

লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ। অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত পাষাণমূর্তি গোরক্ষনাথ। দরজার সম্মুখে ৫।৬ ফুট উচ্চ আবেষ্টনী ঘিরে রেখেছে মণ্ডপটিকে। এই কাষ্ঠমণ্ডপ থেকেই রাজধানীর নাম কাঠমাণ্ডু। প্রায় হাজার বছর পূর্বে যার নাম ছিল "কান্তিপুর" বা "City of Glory"। ফেরার পথে টুণ্ডিখাল আর রত্নাপার্ক। 'হোটেল অপেরা' হতে ছ'বেলাই পড়ে এ'গুলি যাতায়াতের পথে। সাজানো গোছানো পরিচ্ছন্ন পার্ক—সুইস্ সরকারের অনবদ্য দান। পার্কের সীমান্তে পদ্মাসীনা রাণী রত্নাদেবীর মর্মর মূর্তি। লোকসমাগম স্বল্পই, কদাচিৎ ঘোরাফেরা করছে ছ'চারটি ছেলেমেয়ে। পাশেই টুণ্ডিখাল—এক সময় ছিল এশিয়ার বৃহত্তম কুচকাওয়াজের ময়দানগুলির অন্যতম। অপরূপ দর্শন এই ময়দানটি। ঘাসের আস্তরণ দেখে মনে হয় কে যেন একখানি সবুজ মসৃণ গালিচা বিস্তৃত করে রেখেছে ময়দানটির উপর। প্রান্তদেশে রাজারাণীর জন্য নির্মিত একটি স্থায়ী বেদী। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তাঁরা সমাসীন থাকেন উক্ত বেদিকাটিতে। টুণ্ডিখাল কয়েকটি অংশে বিভক্ত। উত্তরাংশে রত্নাপার্ক, আর পাশেই মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চ। মধ্যমণিরূপে বিরাজিত উন্মুক্ত ময়দানটি। দক্ষিণাংশে মর্মরপ্রস্তর নির্মিত শহীদ বেদী। উত্তরাংশে "রাণীপোখরি" জলাশয়। মধ্যস্থলে দ্বীপের মত একটি স্থানে শিবমন্দির—পশ্চিম তীর বরাবর যাতায়াতের পথ। রাণী পোখরির চারপাশ ঘিরে রঙবেরং-এর ফুলে ফুলে সাজান একটি উদ্যান। সপ্তদশ শতকে রাজা প্রতাপমল্ল তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র চক্রবর্তেন্দ্রের অকাল মৃত্যুর স্মৃতিরক্ষার্থে নির্মাণ করান এই মনোরম দর্শন "রাণীপোখরি"। এর দক্ষিণ প্রান্তে প্রস্তরনির্মিত একটি হস্তী—দূর হতে দেখে মনে হয় যেন একটি সচল সজীব হস্তী। রাজপথের মোড় ঘুরে টুণ্ডিখালের পশ্চিমে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ভীমসেন থাপা নির্মিত ১৫৬´ ফুট উচ্চ 'ধরাধর' বা 'ঘণ্টাঘর' (Clock Tower)। তার বিপরীত দিকে জেনারেল পোষ্ট অফিস। সন্ধ্যার প্রাক্কালে পুনরায় আলো-ঝলমল কাঠামাণ্ডুর নিউ রোড ধরে সচ্চিদানন্দবাবুর

রেস্তোরাঁয় সযত্ন-পরিবেশিত চা পানের পর ফিরে এলুম 'হোটেল অপেরা'য় অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটি চীনা সামগ্রী ক্রয় করে।

২৫শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৮-৩০ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে 'হোটেল অপেরা' হতে বেরিয়ে পড়লুম তিন মিনিটের পথ "ত্রিভুবন রাজপথে" বৃহত্তর কাঠমাণ্ডুর দর্শনীয় স্থানগুলি দেখার উদ্দেশ্যে। সঙ্গে শ্রী··· চক্রবর্তী ও শ্রী···চ্যাটার্জি, সহযাত্রী জুটলেন আমাদেরই কোচের এক দম্পতি। বেতারযন্ত্র সংযুক্ত আরামপ্রদ হালকা জাপানী ট্যাক্সি ছুটল সৌখীন্ নেপালী তরুণ চালকের হাতে, প্রথমেই স্বয়ম্ভূচৈত্য অভিমুখে। কাঠমাণ্ডু উপত্যকার জন্মলগ্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যার অচ্ছেদ্য যোগসূত্র। নবনির্মিত রাজভবন বাঁয়ে রেখে রাজপথ ধরে দক্ষিণে বাঁক নিয়ে ১৫ মিনিট চলার পরই ট্যাক্সিখানা পৌঁছে গেল কাঠমাণ্ডুর পশ্চিমে—দু'মাইল ব্যবধানের মধ্যেই "স্বয়ম্ভূচৈত্যে"। নেপাল মিউজিয়াম অতিক্রম করে সৈন্যবিভাগের ছাউনি পেরিয়ে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হতে লাগল গাড়ীখানি। তারপর সর্পিলগতিতে চক্রাকারে পাহাড়টি বেষ্টন করে স্বয়ম্ভূনাথ স্তূপের ৩০০´ ফুট নীচে থেমে গেল ট্যাক্সিটি। হাঁটা-পথেও সরাসরি পৌঁছান যায় স্বয়ম্ভূ স্তূপ। পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে চড়াই শুরু হল ধীরে ধীরে। প্রায় ৫০০ শত সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলুম স্বয়ম্ভূ স্তূপের চত্বরে। প্রবেশ পথের সামনেই প্রস্তর স্তম্ভোপরি দানব নিধনের অস্ত্র বিরাট একটি বজ্র। কিংবদন্তীর দিক থেকে এখানেই প্রস্ফুটিত হয়েছিল পদ্মফুল; আর এখানেই আবির্ভূত হন স্বয়ম্ভূনাথ। পদ্মের বিনিময়ে স্থানটিতে রয়েছে ইঁট, পাথর আর মাটি দিয়ে গড়া অর্ধবৃত্তাকার এক বিরট পাষাণ-বেদিকা।

দু'হাজার বৎসর পূর্বের এক অবিস্মৃত বৌদ্ধ চৈত্য। কথিত আছে স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ এটি দর্শন করে গিয়েছিলেন। স্তূপটির উপরিস্থ চতুষ্কোণযুক্ত স্তম্ভ হতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে হিরণ্যদ্যুতি। স্তম্ভগাত্রের চতুর্দিকে বুদ্ধের যুগ্মনেত্র। লোহিত, শুভ্র আর কৃষ্ণবর্ণের সংমিশ্রণে

যেন চক্ষুগুলি হতে উৎসারিত অপার করুণা। স্তম্ভটির উপরিভাগ শঙ্কু আকারের। শঙ্কুটি আবার চক্রবেষ্টিত। চক্রগুলি আবার ধীরে ধীরে ক্ষুদ্রাকারে পরিবর্তিত হয়ে সবশেষে একটি চন্দ্রাতপকে ধারণ করেছে। সেই চন্দ্রতাপ হতেও বিচ্ছুরিত স্বুবর্ণজ্যোতি—দৃষ্টি যেন ঝল্‌সে যায়। এত স্বুবর্ণের প্রাচুর্য সম্ভব হল কিরূপে ? ইতিহাসে তার সাক্ষ্য মেলে—স্বুবর্ণ দান করেছিলেন এক ঋষি। নিঃশেষে দান করে গেছেন তাঁর জীবনের সব সঞ্চয় এই স্বয়ম্ভুনাথে। শিল্পীরাও বুলিয়েছেন তাঁদের প্রতিভার অকৃপণ হস্ত স্বয়ম্ভুচৈত্যেব কারুশিল্পে। নেপালেব তদানীন্তন শাসনকর্তা জংবাহাদুর উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে চীন থেকে নিয়ে এসেছিলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীদের। নির্দেশ দিয়েছিলেন অর্থাভাব কিছু হবে না। শিল্পীরা যেন তাঁদের শেষ প্রতিভা ঢেলে নির্মাণকার্য সমাপ্ত কবেন নেপালের বিহার ও চৈত্যগুলির। ঘটলোও তাই। ভগবানের পাদপীঠ নব জন্ম লাভ করল প্রতিভাধর শিল্পীদের হাতে। আর তাঁরাও ভগবানের আশীর্বাদ নিয়ে সকলেই দেশে ফিরলেন ভিক্ষুবেশে। সিংহলের "স্বর্ণমতীচৈত্য" ও ব্রহ্মদেশেব "সোয়েডাগু" প্যাগোডার মতই স্বয়ম্ভুচৈত্যের খ্যাতি দেশ-বিদেশে। স্মরণাতীত কাল হতে নেপালের সঙ্গে তিব্বতের রাজধানী লাসার ছিল একটি যোগসূত্র। বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার গূঢ়ান্বয়ী প্রতীকগুলির স্বুস্পষ্ট প্রকাশ স্বয়ম্ভুচৈত্যের শিল্প ও স্থাপত্যে এবং দর্শকমনে তা গভীর রেখাপাত করে। এই মহাযান শাখাই এক সময় নেপাল হতে তিব্বত এবং সেখান হতে দূরপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্বয়ম্ভুচৈত্যের যা-কিছু শিল্পস্থাপত্য সবই মহাযান শাখার কোন না কোন গূঢ় ও রহস্যময় প্রতীক সম্বলিত। গর্ভমন্দিরেব চতুষ্পার্শ্বস্থ ভিত্তিগাত্রের পাঁচটি ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, বৈরোচন, অমিতাভ ও অমোঘোষসিদ্ধ ; যথাক্রমে মূল চারটি দিকের দেবতা এবং বিশ্বের কেন্দ্রস্বরূপ বলে কথিত। মূল চৈত্যটির পশ্চাতে শীতলাদেবীর মন্দির। বামপার্শ্বে লোচনা, মামাকী, বজ্রধাত্রী, পাণ্ডারা ও তারাদেবীর

মন্দির। শীতলা মন্দিরের পাশেই অপর একটি মন্দিরে বিশেষভাবে লক্ষণীয় প্রজ্জ্বলিত একটি অগ্নিশিখা—এরূপ কিংবদন্তী যে, এই অগ্নিশিখাটি সৃষ্টির ঊষালগ্ন হতে অধ্যাত্মালোক বিকীরণ করে আসছে। প্রত্যেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী যাঁরা "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" এই মন্ত্র জপ ও তপস্যা করেন তাঁরা সকলেই এই অগ্নিশিখায় ঘৃতাহুতি প্রদান করেন এবং যে সমস্ত আগন্তুক লামারা দর্শকরূপে এখানে উপস্থিত হন তাঁরাও আহুতি দেন উক্ত অনির্বাণ শিখায়। সকল মহাযান ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস উহাই অদিবুদ্ধের স্বয়ংপ্রভজ্যোতি, যেহেতু তিনি প্রথমে জ্যোতি বা শিখার আকারেই শিখিবুদ্ধরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন কাঠমাণ্ডুর জন্মলগ্নে হ্রদের ভাসমান পদ্মকোরক হতে। এখানেই অবস্থিত কাঠমাণ্ডু উপত্যকার শিশু অভিভাবিকা 'হারাতি' মন্দির। কাশ্মীরে যেমন হিন্দু মুসলমান উভয়েরই রয়েছে সমন্বয়ধর্মী দেবদেবী। নেপালেও দেখে এলুম সেই বৈশিষ্ট্য। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের সহাবস্থান। দেখলুম, মূল চৈত্যের পার্শ্ববর্তী কক্ষে বৌদ্ধ লামারা তান্ত্রিক চক্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে নিবিষ্ট চিত্তে মনঃসংযোগ করছেন বোধিচিত্তে—চক্রেশ্বর পরিবেশন করছেন অনুষ্ঠানদ্রব্যাদি। এই চক্রানুষ্ঠান ও বেধিচিত্ত সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায় যে, বৌদ্ধধর্মের প্রাচীনপন্থীরা ছিলেন 'হীনযান'-সম্প্রদায়ভুক্ত। মোটামুটি বুদ্ধ-নির্দেশিত 'অর্হৎ'ত্ব অর্জন বা নির্বাণ সিদ্ধিই ছিল এঁদের প্রধান লক্ষ্য—অর্থাৎ ধ্যান এবং অন্যান্য নৈতিক আচার-আচরণের নিষ্ঠাপূর্ণ চর্যার মাধ্যমে 'অস্তিত্ব'কে 'অনস্তিত্বে' বিলোপ করার শূন্যতাময় সাধনাই ছিল হীনযানীদের উদ্দেশ্য। অপরপক্ষে, মহাযানী সাধনপন্থার পরিণামী উদ্দেশ্য নির্বাণ নয়—বুদ্ধত্ব লাভ। হীনযানীদের দৃষ্টিতে "নির্বাণ" একটি অনস্তিত্বমূলক. (Negative) শূন্যতাময় অবস্থা অপরপক্ষে, মহাযানী দর্শনের বুদ্ধত্বের অবস্থা ইতিবাচক (Positive)। বুদ্ধত্ব অর্থে বোধিচিত্তের অধিকার লাভ। মহাযানীদের অনুভব অনুযায়ী বোধিচিত্ত হচ্ছে শূন্যতা এবং করুণার একটি সমন্বিত যৌথরূপ। এক কথায় বলা যেতে পারে

হীনযানীদের বস্তুনিষ্ঠ (objective) নৈষ্ঠিকতা এবং সংস্কারগত (conventional) আচারপরায়ণতার গণ্ডীকে অস্বীকার করে মহাযানী বৌদ্ধসম্প্রদায় ধর্মকে ব্যক্তিগত সাধনা, উপলব্ধি এবং সিদ্ধিসাপেক্ষ করে তুললেন। গোষ্ঠীসাপেক্ষ নীতি সমাচরণের পরিবর্তে মহাযান ধর্মের এই ব্যক্তিসাপেক্ষতা ও অনৈষ্ঠিকতার আদর্শ যুগপৎ হীনযানের মৌল বৌদ্ধ-নিয়মতন্ত্রকে শিথিল করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সমকাল-প্রচলিত অ-বৌদ্ধ ধর্মের নানা ধাবা এসে তাতে যুক্ত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য এবং অন্যান্য ধর্মের আচাব আচরণ, পূজা ও মন্ত্রতন্ত্রাদির ক্রম প্রবেশের ফলে মহাযানী ধর্মপন্থা দিনে দিনে পরিবর্তিত হতে লাগল। ফলে ক্রমশঃ জেগে উঠল মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতি নানা 'যান'পন্থা। বজ্রযানীরা মনে করেন নির্বাণের সত্তামাত্রই তিনটি অবস্থায় স্থিত হতে পারে। (১) শূন্য, (২) বিজ্ঞান ও (৩) মহাসুখ। সর্বশূন্যতার মহাজ্ঞানই এঁদের মতে নির্বাণ ; এই নির্বিকল্প জ্ঞানকে বজ্রযানীরা বলেছেন 'নিরাত্মা'। নিরাত্মা হচ্ছেন দেবী বা নারী। আর বোধিচিত্ত দেব বা পুরুষ। বোধিচিত্ত যখন নিরাত্মায় মগ্ন হয়ে নিরাত্মাতেই বিলীন হন তখনই হয় "মহাসুখ"-এর উদ্ভব। চক্রানুষ্ঠাণের মাধ্যমে এই বোধিচিত্তের লয়সাধনাতেই মগ্ন ছিলেন সেদিন স্বয়ম্ভূচৈত্যের লামাগণ। হস্তপ্রসারিত করা মাত্র সকলের অজ্ঞাতে পরিবেশক দিয়ে গেলেন কিঞ্চিৎ "কারণ বারি"। স্বয়ম্ভূনাথের প্রসাদ বিন্দুজ্ঞানে সেটুকু গ্রহণ করে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি' এই বলে শেষ প্রণাম জানিয়ে এলুম। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছি আর ভাবছি সত্যই মাত্র চার বৎসরের রাজত্বকালে জ্যোতির্মল্ল শৈবধর্মী হয়েও বৌদ্ধচৈত্য রক্ষা ও নির্মাণকল্পে যা করে গেছেন তা অবিস্মরণীয় তো বটেই এমন কি ইতিহাসেও এর নজীর বিরল।

চালক দ্রুতগতি ট্যাক্সি চালাতে শুরু করল শেওপুরী পর্বত অভিমুখে "বুধিনীলকণ্ঠ" দর্শনের জন্য। আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে

গেলুম একটি বনস্থলীতে। জলাশয়ের নীচে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নির্মিত অপরূপ বিষ্ণুনারায়ণ মূর্তি শেষ নাগের উপর শায়িত। অনন্ত নিদ্রায় আচ্ছন্ন। নিখুঁত ভাস্কর্যের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি—যা হতে দৃষ্টি ফেরান যায় না। চতুর্দিক ঘুরে-ফিরে বার বার দেখতে ইচ্ছা করে এই মূর্তিটি। মহিলারা ধূপ-দীপ জ্বেলে ভক্তিভরে পূজারতি করছেন শায়িত নারায়ণের উদ্দেশ্যে। ট্যাক্সিচালক হর্ণ দিয়ে সময় সংকেত করতেই উঠে বসলুম নির্দিষ্ট আসনটিতে—সহযাত্রী চারজনও বসলেন নিজ নিজ আসনে। ট্যাক্সি ছুটল "বালাজু ওয়াটার গার্ডেন"-এর দিকে। রৌদ্র-ঝলমল দিন। বেলা ৯-৩০ মিনিটে এসে উপস্থিত হলুম বালাজুর টিকিটঘরের সামনে। বালাজু স্মরণ করিয়ে দেয় কাশ্মীরের পথে 'ভেরীনাগের' কথা। চারিদিকে জল চিরে চিরে রকমারি ফুলের সজ্জা—তারই মাঝে বাইশটি মকরের মুখ হতে অবিরত জল ঝরছে। তার অদ্ভুত কলতান ভেসে আসছে কানে। জলের ধারাগুলি মিলিত হয়ে পড়ছে নীচের কয়েকটি জলাশয়ে। আধুনিক পদ্ধতিতে নির্মিত একটি "সুইমিং পুল"। উদ্যানটির পূর্বপ্রান্তে পাইন আর ফার ঘেরা নাগার্জুন পর্বত। অনেকেই যাচ্ছেন উপরের দিকে। আমাদের সহযাত্রী-দম্পতিও কিছুটা ঘুরতে গেলেন পর্বতের উপরিদেশে—ফলে রাত্রাপথে বিলম্ব হল আমাদের।

॥ ললিতপুর ॥

আমরা তিনজনে বেরিয়ে এলুম বালাজু উদ্যান হতে—প্রত্যাবর্তন পথে বুধি-নীলকণ্ঠের অনুরূপ আর একটি বিষ্ণুমূর্তি দর্শন করে। চলেছি ললিতপুর বা পত্তন অভিমুখে। কাঠমাণ্ডু হতে তিন মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত অপরূপ কারুশিল্পনগরী ললিতপুর। প্রবেশ পথে যেন একটা শ্রীহীন উদাস ভাব। কিন্তু অন্দরমহল দরবার স্কোয়ারে পৌঁছে প্রথমে "কৃষ্ণমন্দির" দর্শনকালেই মনের প্রেক্ষাপটে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ললিতপুরের এক কালের অমিত ঐশ্বর্যের কথা।

প্রস্তরনির্মিত অপরূপ এক মন্দির। কারুশিল্পের দিক থেকে সমগ্র নেপালে অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে—পাঁচতলা চক-মিলানো অপূর্ব এই দেব-দেউল। চন্দ্রাতপশোভিত সিংহাসনের মত ছোট ছোট কুঠরিযুক্ত এই মন্দিরটি প্রথম দর্শনেই মনে হয় যেন দাঁড়িয়ে আছে একখানি অচল রথ। তিনতলা পর্যন্ত এক একটি দিকে আসন আছে তিনটি করে। চারতলায় এক এক দিকে একটি করে সিংহাসন। মন্দিরশীর্ষটি ক্রমেই অপ্রশস্ত হয়ে উঠে গেছে উপরের দিকে চূড়ার মত। এমন একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে এই মন্দিরটির যা দর্শকমনে জাগিয়ে দেয় একটি বিস্মৃত যুগের শিল্পরুচির গরিমা। রামায়ণ মহাভারত হতে অপরূপ সব দৃশ্য মন্দিরগাত্রে খোদিত। রাধা-কৃষ্ণ যুগল মূর্তির স্বপ্ন দেখে রাজা সিদ্ধিনরসিংহ ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে গড়ে তোলেন এই মন্দিরটি। কিন্তু প্রতিষ্ঠা দিবসে এক বিপদ উপস্থিত হল। কান্তিপুরের রাজা (বর্তমান কাঠমাণ্ডু) প্রতাপমল্ল ললিতপুর আক্রমণ করে বসলেন। দলে দলে সৈন্যসামন্ত সব এগিয়ে আসতে লাগল কৃষ্ণমন্দির অভিমুখে। সেদিন উপস্থিত ছিলেন গুর্খারাজ দামরশাহ। অনন্যোপায় সিদ্ধিসিং সাহায্য চাইলেন তাঁর। দামরশাহও মুহূর্ত মধ্যে ললিতপুরের সৈন্যসামন্ত ও সেনা-পতিসহ যুদ্ধ শুরু করে দিলেন প্রতাপমল্লের সৈন্যদের সঙ্গে। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল চতুর্দিকে প্রতাপমল্লের সৈন্যগণ। নির্দিষ্ট দিনে প্রতিষ্ঠা হল কৃষ্ণমন্দির। কৃষ্ণমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা এ.হেন রাজা সিদ্ধিনরসিংহ পরিণত বয়সে হঠাৎ একদিন সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন তীর্থে তীর্থে। ফিরে এলেন না আর। ললিতপুরের ইতিহাস এই কথাই বলে।

একের পর এক প্রতিটি তলা ঘুরে দেখে নীচে ট্যাক্সিচালককে অপেক্ষা করতে বলে চলতে শুরু করলুম "মহাবুদ্ধমন্দির"-এর দিকে, সঙ্গে শ্রীচ্যাটার্জি। সদাশিব দেবের রাজত্বকালের অক্ষয় স্মৃতি এই "মহাবুদ্ধ মন্দির"। বৌদ্ধমন্দির হলেও প্রাচীন হিন্দু টেরাকোটার ছাঁদে এটি নির্মিত। মন্দিরের প্রধান প্রবেশপথে দুই পাশে দুটি সারিতে বুদ্ধমূর্তি।

নীচে থেকে উপরে দৃষ্টি দিলে আকাশ-ছোঁয়া এই মন্দিরের প্রতিটি ইষ্টকে দেখা যায় বুদ্ধমূর্তি। সাদৃশ্য রয়েছে বুদ্ধগয়ার মন্দিরটির সঙ্গে। এর অপূর্ব স্থাপত্য-শিল্প জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই মুগ্ধ করার দাবী রাখে। নীচে হতে উপর পর্যন্ত সর্বত্রই বুদ্ধমূর্তি। যেন একই সত্যকে বহু রূপে দেখাবার বিচিত্র প্রয়াস। ফেরার পথে "হিরণ্যবর্ণ মহাবিহার" খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে নির্মিত ভাস্করবর্মার সাধের স্বপ্ন। মূল বিহারের উপর প্যাগোডাযুক্ত ছাদ স্বুবর্ণত্যুতিতে ঝল্‌মল করছে। দেওয়ালগাত্রে বুদ্ধচরিতের সব অপরূপ দৃশ্য। নেপালী শিল্পীদের অনবদ্য মহিমা ঘোষণা করে "হিরণ্যবর্ণ মহাবিহার" তার নাম সার্থক করে তুলেছে। বিহারের সর্বোচ্চ তলার বুদ্ধমূর্তিটি যেন দর্শনার্থীদের ইঙ্গিতে জানিয়ে দিচ্ছে উপনিষদের সেই মহাবাণী—"মা গৃধ কস্যসিৎ ধনং"। সম্মুখে বৃহৎ প্রার্থনা-চক্র। সেখান হতে চলে এলুম মচ্ছেন্দ্র-নাথ মন্দির। এটি নির্মিত হয় ১৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে। বিরাট তিনতলা প্যাগোডা একটি। সম্মুখ স্তম্ভে প্রবেশপথের দিকে মুখ করে সারি সারি সব জীবজন্তু। রক্তবর্ণ কাষ্ঠনির্মিত মচ্ছেন্দ্রমূর্তি অধিষ্ঠিত এখানে। হিন্দু ও বৌদ্ধদের মিলিত দেবতা এই মচ্ছেন্দ্র। মন্দিরের সিলিং-এ মার্বেলের সূক্ষ্ম কাজ। হিন্দুদের ধারণা নাথসম্প্রদায়ের প্রধান এই মচ্ছেন্দ্রনাথ। বৌদ্ধদের ধারণা মচ্ছেন্দ্রনাথ অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি বুদ্ধের প্রতিমূর্তি। নেপালের বহু উৎসবের মধ্যে মচ্ছেন্দ্র-নাথের রথযাত্রা একটি পরম রমণীয় উৎসব। বৈশাখ হতে শুরু হয়ে উৎসব চলে এক মাস। ষাট থেকে সত্তর ফুট উচ্চ এই রথটি। নেপালী বাদ্যভাণ্ড সহ এই রথের শোভাযাত্রার পুরোভাগে ললিতপুরের সুন্দরী ললনাগণ মনোজ্ঞ সাজে সজ্জিত হয়ে পুষ্পমাল্য হস্তে নৃত্যগীতের ছন্দে ছন্দে অগ্রসর হতে থাকেন। এই উপলক্ষ্যে ঘণ্টাধ্বনি ও ধূপ-ধুনাদি সুগন্ধি দ্রব্য সহ সুবর্ণ ছত্র হস্তে পুরোহিতগণ এই মহান্ দেবতার অর্চনাদি দ্বারা দেবতার সম্মুখভাগে প্রথম সারিতে যাত্রা করেন। মচ্ছেন্দ্রনাথের রথযাত্রা উৎসব নেপালের বৃহত্তম উৎসব। এর বিপরীত

দিকেই মীননাথ মন্দির একটি সরু গলিপথে। মোটরচালক ও অন্যান্য সহযাত্রীর কথা স্মরণ করে সত্বর প্রত্যাবর্তন করতে হল "দরবার স্কোয়ারে"। শিল্পীমনের অপরূপ বিকাশ, চোখজুড়ান শহর এই ললিতপুর। এক সময় কাঠমাণ্ডুকে যেমন বলা হতো "City of Glory" বা কান্তিপুর তেমনি ললিতপুরকে বলা হতো City of Beauty" বা লাবণ্যপুরী। কাঠমাণ্ডুর নামকরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই নামকরণ করা হয়েছে ললিতপুরের। এ'কে শিল্পীমনের "যাদুঘব" বললেও অত্যুক্তি হয় না। স্মবণাতীত কালের নেপালী শিল্প-স্থাপত্যের এক অনবদ্য প্রকাশ এই ললিতপুবে। দ্বিতল, ত্রিতল প্যাগোডা—মন্দিরেব অভাব নাই এখানে। একে বৌদ্ধ-সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু বললেও চলে। কাম্বোডিয়ার 'আংকোরভাট', সিংহলেব 'কাণ্ডি', থাইল্যাণ্ডের 'নাথাউন পাথন' এবং ব্রহ্মদেশের "মান্দালে" ও "কিয়োটো"ব সঙ্গে তুলনীয় ললিতপুরের শিল্পস্থাপত্য।

দরবার স্কোয়ারের চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে মন্দির আর প্যাগোডা। শুধু মন্দিব আর মন্দির। প্রধান মোড়টির দু'পাশে গড়ে উঠেছে মন্দির আর প্যাগোডা। কোনটা বিষ্ণুমন্দির, কোনটি শিবমন্দির, কোনটিবা বুদ্ধমন্দির। জাতিধর্মনির্বিশেষে হিন্দু-বৌদ্ধ দেবদেবী সব এক হয়ে গেছে।

দরবার স্কোয়ারে রাজপ্রাসাদেব তোরণ সম্মুখে রাজা যোগনরেন্দ্র মল্লের বিরাট স্বুবর্ণ মূর্তি—প্রস্তর স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। প্রবেশ করলুম রাজপ্রাসাদের স্বুবর্ণ-তোরণ দিয়ে—অন্দরমহলে। অসংখ্য তার চত্বর। অজস্র তার কুঠরি। সেই সঙ্গে দেওয়ালগাত্রের ভাস্কর্য ও কাঠের কারুকার্য বিস্ময় জাগায়। বহু মন্দির তার সামনে স্বুবৃহৎ সব ঘণ্টা। অসংখ্য প্রস্তরনির্মিত দেবদেবীর মূর্তি আর সেই সঙ্গে দেবদর্শনের উপযোগী গ্যালারী। কত অলিন্দ, কত স্তম্ভ—দেখে শেষ করা যায় না। বিখ্যাত ফরাসী মনীষী মসিয়েঁ সিলভ্যাঁ লেভী তাই এই রাজদরবার দেখে মন্তব্য করেছিলেন, "অতীতের শেষ স্মৃতি-

চিহ্ন এই রাজপ্রাসাদটি আজও অপরূপ সৌন্দর্যে উজ্জ্বল। কে এই রাজপ্রাসাদের বর্ণনা দিতে সক্ষম? কাষ্ঠের উপর কারুকার্যখচিত নীল, লাল ও সোনালী আভা এককালে দর্শকমনকে অভিভূত করে। বিশেষ করে উজ্জ্বল শ্বেতমর্মর প্রস্তরোপরি ব্রোঞ্জনির্মিত মূর্তিগুলি অপূর্ব শোভায় শোভমান"।

এ হেন রাজপুরী হতে বিদায় নিয়ে এসে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম ট্যাক্সিতে। চালক যাত্রা শুরু করল ভক্তপুর বা ভাদগাঁও অভিমুখে।

॥ ভক্তপুর ॥

কাঠমাণ্ডু হতে ন' মাইল পথ ভক্তপুর। ঘর, বাড়ী, মাঠ, ময়দান সব অতিক্রম করে ৪৫ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল আমাদের গাড়ীখানি অপ্রশস্ত ও অপরিচ্ছন্ন প্রবেশ পথ বেয়ে ভক্তপুরের দরবার স্কোয়ারে। এক কালে ভক্তপুর ছিল ভক্তদেরই নগরী—তাই এর নাম ভক্তপুর। ত্রয়োদশ শতকে রাজা আনন্দমল্ল প্রতিষ্ঠা করেন এই নগরটি। কিন্তু নিজের প্রতিষ্ঠিত শহরে শান্তিতে থাকতে পারেন নি তিনি। দক্ষিণ ভারতের শত্রু নান্যদেব তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে তিনিই সেখানকার রাজপদে হয়েছিলেন অধিষ্ঠিত। দরবার স্কোয়ারের চতুষ্পার্শ্বে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রাচীন প্রাসাদ ও অপূর্ব সব মন্দির। রাজপ্রাসাদের স্বুবর্ণ দেউলে মধ্যযুগীয় চিত্রকলার অপূর্ব নিদর্শন। তৎকালীন ভাদ-গাঁওরাজ রণজিৎমল্ল এই স্বর্ণ দেউলটির নির্মাতা। স্বুবর্ণমণ্ডিত সিংহদ্বার অতিক্রম ক'রেই প্রবেশ করতে হল মূল রাজপ্রাসাদে। নেপালী কারুশিল্পের এটি একটি বিশেষ নিদর্শন। বহু শিল্পীর সাধনা আর প্রভূত ঐশ্বর্যের ফলশ্রুতি রণজিৎমল্ল নির্মিত এই রাজপ্রসাদ। সারিবদ্ধ ৫৫টি ময়ূরগবাক্ষ (Peacock window) যক্ষমল্লের রুচিবোধের অক্ষয় স্মৃতি বহন করছে আজও ১৪২৭ খ্রীষ্টাব্দ হতে। জিতমিত্রের পুত্র ভূপতীন্দ্রমল্ল ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এটি পুনর্নির্মাণ করান। তাইতো স্তব্ধ

বিস্ময়ে দেখতে হয় দরবার স্কোয়ারে পৌঁছেই সুদৃঢ় একটি স্তম্ভোপরি ভূপতীন্দ্রমল্লের জ্যোতিষ্মান্ নতজানু মূর্তিটি। ইষ্টদেবী তেলেজু-ভবানীর চরণে করযোড়ে তিনি অর্ঘ্য নিবেদন করছেন চিরকালের জন্য। কারো কারো মতে ভূপতীন্দ্রমল্ল অপলক নেত্রে দর্শন করছেন তাঁর নিজের সৃষ্টি। যাই হোক, আমরা আরও অভিভূত হলাম ভাদগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের উগ্রচণ্ডী ও ভৈরব মূর্তি দুটি দেখে। শোনা যায় শিল্পীকে অমর করে রাখার জন্য তাঁর হস্ত দুটি ছেদন করে রেখে-ছিলেন তৎকালীন মল্লরাজ। রাজপ্রাসাদের সুবর্ণ দেউলের কারুকার্য পৃথিবীর এক অপরূপ বিস্ময়।

এ সম্বন্ধে প্রাচ্য শিল্পরীতির বিখ্যাত সমালোচক পার্সী ব্রাউন মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "শিল্প এবং ধর্মীয় রীতি যে দিক থেকেই বলি না কেন সুবর্ণময় দেউলটির কারুশিল্পের বর্ণনা সাধ্যাতীত। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য যে দেশের শিল্পীরাই এটি নির্মাণ করুন না কেন তাঁদের শিক্ষা যে চরমোৎকর্ষ লাভ করেছিল এ বিষয় সন্দেহের অবকাশ নাই। শিল্পকর্মের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে প্রাচীন নেওয়ার জাতির শিল্প, ধর্ম ও বুদ্ধিবৃত্তির সৌকর্য সাধনার এটি একটি চরম সার্থকতা বলা যেতে পারে।"

এই দরবার স্কোয়ারে আরও একটি "সিংহ দরজা" আছে। সেটি হিন্দু দেবদেবী যথা ভৈরব, নরসিংহনারায়ণ প্রভৃতির মর্মরমূর্তি-শোভিত। ধীরে ধীরে প্রবেশ করলুম রাজ-অন্তঃপুরে। শূন্যপুরী—মাত্র তন্দ্রাচ্ছন্ন কয়েকজন দ্বারপাল। মূল চত্বরে তেলেজু-ভবানীর মন্দির। দুর্গাপূজার সময় এই দেবীর পূজা হয় মহাসমারোহে। প্রাসাদ সম্মুখে জমাট প্রস্তরের সুবৃহৎ একটি ঘণ্টা। মল্লরাজদের আমলে সান্ধ্য আইন বলবৎকল্পে এই ঘণ্টাধ্বনি করা হোতো। রাজপ্রাসাদ সংলগ্নদ্বিতলে "জাতীয় চিত্রশালা"। দর্শনী দিয়ে প্রবেশ করতে হল। দ্বিতলে গিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে দেখতে লাগলুম চিত্রশালাটি। বৌদ্ধ ও হিন্দুতান্ত্রিক দেবদেবীর অপূর্ব সংগ্রহশালা এটি। সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল ৩৫০ বৎসর

পূর্বের একটি প্রস্তরমূর্তি। অর্ধেক বিষ্ণু ও অর্ধেক শিব। নেপালের শিল্পকলা সম্বন্ধে উল্লেখ করতে হলে—নেপালকে শিল্পসৌন্দর্যের যাদুঘর বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় যাবতীয় শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের এক আকর্ষণীয় সংগ্রহ রয়েছে এখানে। সর্ব-কালেই হস্তনির্মিত কারুশিল্পের উৎকৃষ্টতার জন্য নেপালী শিল্পকলার আন্তর্জাতিক খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। বিশেষ করে পর্বতবেষ্টিত নির্জন হিমালয় ক্রোড়ে অবস্থিত নেপাল রাজ্য বৈদেশিক ও মুসলমান আক্রমণ হতে মুক্ত থাকায় তার শিল্প ও ভাস্কর্য ছিল অক্ষত। অন্যথায় ভারতবর্ষের মত মুসলমান আক্রমণ দ্বারা নেপাল বারবার বিধ্বস্ত হলে —সেখানকার মূল্যবান শিল্প-ভাস্কর্যেরও ঘটতো বিকৃতি—বহু প্রাচীন শিল্পকলা হতো বিস্মৃতির গর্ভে লীন। সেদিক থেকে নেপাল ভাগ্য-বান। ধর্মীয় প্রভাব থেকেই নেপালী শিল্পকলার উদ্ভব। এজন্য প্যাগোডা, স্তূপ, মন্দির, রাজপ্রাসাদ এমন কি সাধারণ বাসগৃহাদিরও অলংকরণ করা হয়েছে ধর্মীয় প্রভাবযুক্ত শিল্পকলার মাধ্যমে। যে কোন পর্যটক কাঠমাণ্ডু, ললিতপুর ও ভক্তপুরের চিত্রকলা ও ভাস্কর্য-রীতি দেখলেই সেটি চাক্ষুষ উপলব্ধি করতে পারবেন। সত্যই সৌন্দর্য-মহিমার এক বিশেষ দিক বিকশিত হয়েছে নেপালী শিল্প-কলায়। তাছাড়া নেপালের সমুদয় শিল্পকলায় ঘটেছে বৌদ্ধ ও হিন্দু শিল্পরীতির রূপায়ণ। নেপালের শিল্প ও ভাস্কর্যকে সাধারণতঃ দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি হল "প্যাগোডা রীতি" ও অপরটি হল "স্তূপ রীতি "প্যাগোডা রীতির" শিল্পকলার নিদর্শন মেলে তেলেজু-ভবানী, নয়াতোপোল প্রভৃতিতে। আর "স্তূপ রীতির" নিদর্শন সাধারণতঃ দেখা যায় কাঠমাণ্ডুতেই অধিক "স্বয়ম্ভু চৈত্য" ও "বোধনাথ স্তূপ"-এ। এতদ্ব্যতীত নেপালের কাষ্ঠশিল্প, ব্রোঞ্জশিল্প এবং ভাস্কর্য শিল্পও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মোটরচালকের হর্ণের শব্দে ফিরে আসতে হল দরবার স্কোয়ারের অঙ্গনচত্বরে। সেখান হতে বৎসলা মন্দির। নির্মাণ-

কৌশল কিছুটা ললিতপুরের কৃষ্ণমন্দিরের মত। সমগ্র মন্দিরটাই পাথর কেটে তৈরী। তার মধ্যে আছে ব্রোঞ্জনির্মিত আশ্চর্য এক ঘণ্টা। এরূপ কিংবদন্তী যে, এই ঘণ্টার শব্দে জেগে ওঠে মৃত্যুধ্বনি এবং এই ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণে চতুষ্পার্শ্বস্থ সারমেয়গণ শুরু করে আর্তনাদ। রাজা ভূপতীন্দ্রমল্ল রাজ্যে অমঙ্গল নাশের জন্য নির্মাণ করিয়েছিলেন এই ঘণ্টাটি।

মোটরচালকের সহকারী এখানেও কাঠের কারুকার্যশোভিত পশুপতিনাথের একটি মন্দির দেখিয়ে গলিপথ দিয়ে নিয়ে এল নেপালের সর্বোচ্চ এমন কি পৃথিবীর অন্যতম উচ্চ প্যাগোডামন্দির 'নয়াতপোলের' সামনে। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে ভূপতীন্দ্রমল্ল প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটি শৈবদেবতাকে উৎসর্গীকৃত। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রীতে হেলানো কয়েকটি সুদৃঢ় খুঁটির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পাঁচ-ছাদযুক্ত এই মন্দির। সিঁড়ি উঠে গেছে ধাপে ধাপে প্রায় ৪০।৫০´ ফুট পর্যন্ত। শেষ ধাপ হতে শুরু হল মন্দির—ইট আর কাঠ মিলে অতুলনীয় এর নির্মাণচাতুর্য। জাপানের 'হারুঞ্জি' আর নেপালের 'নয়াতোপোল' একই কারুকার্যশোভিত।

মন্দিরের প্রথম ধাপে প্রস্তরনির্মিত বিরাট দুটি নরমূর্তি—জয় ও ফট্টমল্লের। এরা সাধারণ মানুষের চেয়েও শক্তিতে ছিলেন দশগুণ। দ্বিতীয় ধাপ সিঁড়ির প্রবেশ পথে দুটি প্রস্তরনির্মিত হস্তী। মল্লদের চেয়ে এরা আবার দশগুণ শক্তিশালী। ধাপের তৃতীয় স্তরে দুটি সিংহ। এরা আবার হস্তীর চেয়ে দশগুণ বলশালী। উঠে এলুম চতুর্থ তলার সিঁড়িতে—এখানে দুটি "গ্রিফিন"-এর প্রতিমূর্তি, যার বাস্তব সত্তা নাই। কল্পিত একটি জীব—দেহটি সিংহের কিন্তু মস্তকে দুটি ঈগলের ডানা। এদের শক্তি আবার সিংহদের চেয়েও দশগুণ অধিক। তারপর পঞ্চম বা শেষ স্তরে দুটি দেবীমূর্তি। সিংহিনী ও সিংবাহিনী। এঁরাই সবার চেয়ে শক্তিময়ী। নেপাল-সভ্যতার এক সুবর্ণযুগে এঁসবের সৃষ্টি। বিশাল অখণ্ড এক নেপালরাজ্য ছিল

তখন। 'নয়াতপোল' হতে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই ভৈরবনাথের এক জীর্ণ মন্দির—দেখতে অনেকটা "কৃষ্ণমন্দিরের" মত—১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণকার্য শেষ করান রাজা ভূপতীন্দ্রমল্ল। একদিন এখানে দাঁড়িয়েই তিনি ঘোষণা করলেন "এ' হল ধ্বংসের দেবতা ভৈরবনাথের অধিষ্ঠান ভূমি।"

এগিয়ে যাই দত্তাত্রেয় মন্দিরের দিকে—প্রবেশ পথে ফুলওয়ালীরা এক সঙ্গে সকলেই ঘিরে ফেলে আমাদের। সকলের একই চাহিদা—প্রত্যেকের কাছেই কিছু ফুল ক্রয় করতে হবে। সকলেই কিছু কিছু ফুল ক্রয় করলুম দত্তাত্রেয় মন্দিবের দেবতাদের পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের জন্য। প্রাচীনত্বেব দিক হতে ভৈরবনাথের মন্দিরকে অতিক্রম কবে গেলেও দত্তাত্রেয় মন্দিরের কারুকার্য ও সৌন্দর্য কিছুমাত্র ম্লান হয় নি পাঁচটি শতাব্দীর শীতগ্রীষ্মের ছোঁয়ায়। ১৪২৬ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করান রাজা যক্ষমল্ল। মন্দিরটি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা বিশ্বমল্ল একে পুনর্নির্মিত করেন। সেই থেকে পাঁচ শতাব্দীকালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে আজও দত্তাত্রেয় মন্দির অম্লান, অপরূপ। জনকোলাহলের কোন উপদ্রব এসে পেঁাছেনি এখানে। নীরবে, শান্ত-স্তব্ধ পরিবেশে এক মহিমময় রূপ ধারণ করে দাঁড়িয়ে এই দেবমন্দির। চূড়া ও ছাদ হতে শুরু করে দেওয়ালগুলিও কারুকার্যমণ্ডিত। স্তম্ভ, গরুড়মূর্তি, এমন কি ঝুল-বারান্দাসহ মন্দিরটি রমণীয় দর্শন। নেপালী-বাসিন্দাদের গলিপথ বেয়ে ফিরে এলুম দরবার স্কোয়ারে। শেষ দর্শন প্রতাপমল্লের অক্ষয় স্মৃতিবাহী "সিদ্ধ পোখরি" নামে একটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকা। সুসংস্কৃত করে তিনিই নাম দেন "সিদ্ধপোখরি"। তারপর ভীমসেন থাপা একে নবযৌবন দান করেন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে বহু অর্থব্যয়ে। সোনালী মাছ এসেছিল সুদূর চীন থেকে। কিন্তু আজ তা মুমূর্ষু, জরাজীর্ণ—দেড়শত বৎসর পূর্বের মেরামতি কাজ যেন আর তাকে যৌবনোচ্ছলা করে ধরে রাখতে অক্ষম। চালক গাড়ীর মুখ ফেরাল কাঠমাণ্ডুর দিকে।

দ্রুত চলতে শুরু করল গাড়ীখানি পৃথিবীর অন্য বৃহত্তম স্তূপ "বোধনাথ" অভিমুখে। কাঠমাণ্ডু হতে ৫ মাইল দূরে উত্তর-পূর্ব কোণে, ধান ও ভুট্টাক্ষেত বেষ্টিত স্থানে সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ২৫০০ হাজার বৎসর পূর্বের এক অম্লান স্মৃতি এই বোধনাথ স্তূপ। প্রথম দর্শনে স্তূপটি দেখে বিস্মিত হতে হয় বৈকি? সারা পৃথিবীর মধ্যে রেঙ্গুনে অবস্থিত 'সোয়েডাগু' প্যাগোডার সঙ্গেই এটি তুলনীয়।

ধর্মপ্রাণ নেপালাধীশ মানদেব নির্মাণ করেছিলেন এই মহান স্তূপটি —সাল-তারিখের কোন নজীব মেলে নি। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের মত তিনি সম্মান ও মহিমায় হয়ে উঠেছিলেন উজ্জ্বল। স্তূপটির চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাঙ্গণটি নেপালী কুটিরশিল্পে সজ্জিত। কিন্তু তাব অগ্নিমূল্যের দরুণ সাধারণ ক্রেতাদের হস্তক্ষেপ করার উপায় নাই। ইতিমধ্যে সহ-যাত্রীদেব অনেকেই পেঁ'ছে গেছেন "বোধনাথ স্তূপ" দর্শনে। সকলেই উঠতে থাকি স্তূপটির গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে। এ'ত স্তূপ নয় যেন পর্বতের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। পৃথিবীর বৃহত্তর এই বৌদ্ধচৈত্যটি গোলার্ধের মত শ্বেত-শুভ্রবর্ণ অষ্টকোণবিশিষ্ট সমতল ক্ষেত্রের উপর গড়ে উঠেছে গর্ভগৃহটি। মন্দিরাভ্যন্তরে সংরক্ষিত কশ্যপ বুদ্ধের স্মারকচিহ্নের কিছু ধ্বংসাবশেষ। অষ্টকোণী ক্ষেত্রটিকে বেষ্টন করে রয়েছে একটি প্রাচীর, তারই গাত্রে বয়েছে আশীটি কুলুঙ্গী—প্রতিটিতেই একটি করে বুদ্ধমূর্তি। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বস্তু "বোধনাথের" সুউচ্চ চূড়া। পিরামিডের আকারে উঁচু হয়ে উঠেছে এর শীর্ষদেশ। পিরামিডটি উঠেছে গোলার্ধের উপরিদেশ হতে। পিরামিডের গাত্রে হৈমদ্যুতি—তাকে আবেষ্টন করে রয়েছে ত্রয়োদশ স্বর্ণ বলয়—তাই তার এত জ্যোতি। স্বর্ণ বলয়গুলি আবার ক্রমেই সূক্ষ্ম হয়ে চূড়ার নিকটবর্তী হয়ে একটি রমণীয় ছত্রকে ধারণ করে রেখেছে। ছত্রটিও অপূর্ব কৌশলে নির্মিত নানা ধাতুর সংমিশ্রণে। চূড়াটির নীচে যে বর্গাকার ভূমি আছে সেখানে রয়েছে বুদ্ধের উন্মীলিত চারটি যুগ্ম নেত্র। নিরীক্ষণ করছেন অপলক নেত্রে সমগ্র মানবজাতির এক মহান্ উন্নত ভবিষ্যৎ আর সেই সঙ্গে

তাদের সকল কর্মে ন্যায়পরায়ণতা। তিব্বত-বহির্ভূত অঞ্চলে লামাদের এটি একটি বিখ্যাত তীর্থ। চৈত্য-প্রাঙ্গণটিও তিব্বতী লামা ও পুরোহিতদের বাসস্থান। এটিকে নেপালের তিব্বতীপল্লী বললেও অত্যুক্তি হয় না। আশপাশের দোকানগুলি অগণিত নেপালী শিল্পসম্ভারে শোভিত। ট্যাক্সি ছুটল পশুপতি মন্দির অভিমুখে। সূর্য তখন ঢলে পড়েছে মাথার উপর থেকে। পৌঁছে গেলুম পশুপতি মন্দির-চত্বরে। আজ আর কোন জনকোলাহল নাই—নাই জনগণের অবিরত গতাগতি। শান্ত-শুভ্র পরিবেশ। আনন্দ-তন্ময়চিত্তে হিন্দু ও বৌদ্ধের মিলিত দেবতাকে প্রদক্ষিণ করে ও মধ্যাহ্ন আরাত্রিক দর্শনে মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রণাম জানিয়ে ফিরে এলুম 'হোটেল অপেবা'য় বেলা দুটোয়।

তিন

॥ তেলেজু মন্দির ॥

২৫শে ফেব্রুয়ারী মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রাম নিয়ে বৈকাল ৫টায় শ্রীচ্যাটার্জি ও চক্রবর্তী সহ বেরিয়ে পড়লুম পায়ে হেঁটে কাঠমাণ্ডুব পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি দেখার জন্য। ঘুরতে ঘুরতে চলে এলুম কাঠমাণ্ডুব প্রাচীন বাজমহল্লা—হনুমান ঢোকাব দরবার স্কোয়ারে। প্রাসাদ সম্মুখেই গগনচুম্বী তেলেজু মন্দির। মন্দিরে অধিষ্ঠিতা নেপাল-রাজ-বংশের কুলদেবী তেলেজু-ভব'নী। সুউচ্চ ভিত্তিব উপর নির্মিত অপূর্ব কারুকার্য শোভিত ত্রয়োদশতল এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন তৎকালীন নেপালরাজ মহেন্দ্রমল্ল ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। ত্রিতলছাদগুলি পিত্তলনির্মিত—সুবর্ণময় তার শীর্ষদেশ। কার্ণিশগুলিতে দোতুল্যমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টাগুলি ঈষৎ বায়ু-সঞ্চালিত হয়ে টুং টাং শব্দ করে দর্শনার্থীদের স্মরণ কবিয়ে দিচ্ছে মহেন্দ্রমল্লের এক মহিমময় শিল্পরুচির কথা। ফিবে যেতে হয় সুদূর অতীতের এক তন্ত্রসাধনাব যুগে—যার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তেলেজু মন্দিরের কারুশিল্পে। হিন্দুতন্ত্রে যেমন দেবদেবীর মন্ত্র, পূজা, মণ্ডল, মুদ্রা ও সাধনার কথা—বৌদ্ধতন্ত্রও তেমনি মন্ত্র, মুদ্রা ও মূর্তিপ্রধান। এই উভয় তন্ত্রেব সংমিশ্রণে নেপালে গড়ে উঠেছে মন্দিরগুলি—অলঙ্কৃত হয়েছে দেওয়ালচিত্র, তান্ত্রিক প্রথায়। এক টাকা দর্শনী দিয়ে প্রবেশ করতে হল রাজদরবারে। প্রবেশ দ্বারে বিরাট রক্তমূর্তি হনুমান—হনুমানঢোকা নামকরণের সার্থকতা প্রতিপন্ন করছে। নিঃশব্দ পাষাণপুরী, অগণিত পারাবতের আশ্রয়স্থল। এখানে সেখানে মাত্র কয়েকজন তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রহরী। আয়তাকার—চকমিলান প্রাসাদ। প্রাঙ্গণের উত্তর প্রান্তে স্তম্ভযুক্ত বারান্দায় প্রাক্তন নৃপতিদের তৈলচিত্রের অপরূপ সমাবেশ। দেখে মনে হয় সকলেই যেন জীবন্ত। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি বেদিকা। বর্গাকার

কয়েক ফুট উচ্চ একটি স্থান। নৃপতিগণের অভিষেক-লগ্নে উক্ত স্থানটিই মণিমাণিক্য আব সুবর্ণ-রৌপ্যে খচিত হয়ে, হয়ে ওঠে অপরূপ দর্শন। দক্ষিণ প্রান্তে এসে শুরু হল রাজপ্রাসাদের নবম তলার চূড়ায় ওঠা। মনুমেণ্ট বা কুতবমিনারের মত ক্রমেই তলাগুলি ছোট হতে হতে আরও ছোট হয়ে পরিশেষে শীর্ষদেশ। তারপর সিঁড়ি বেয়ে ধীর পদক্ষেপে ওঠা। শীর্ষদেশ হতে সমগ্র কাঠমাণ্ডুকে দেখায় পটে-আঁকা ছবির মত। যেমন দেখা যায় শ্রীনগরের শঙ্করাচার্য পাহাড় হতে কাশ্মীব ভূখণ্ডকে। স্বয়ম্ভূনাথ, বোধনাথ, পশুপতিনাথ, বাগমতী সবই দেখা যাচ্ছে। নেমে এলুম প্রাসাদশীর্ষ হতে—ফেরার পথে প্রণাম জানিয়ে রাজপ্রাসাদের প্রস্তরমূর্তি কালভৈরব বা ধ্বংসেব দেবতাকে। সন্ধ্যার পর আলো-আঁধাবি হনুমানঢোকা হতে চলে এলুম সুসজ্জিত আলো-ঝলমল্ নিউ বোডে। সেখান হতে বত্না পার্ক-হয়ে—রাজপথ ধরে পৌঁছে গেলুম 'হোটেল অপেরা'।

॥ নাগেরকোট ॥

২৬শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টায় গত দিনের সৌখীন মোটরচালকটি তার গাড়ী নিয়ে উপস্থিত। কথা ছিল রাত্রি ৪টায় নাগেরকোট যাবার। নাগেরকোট সম্বন্ধে সংক্ষেপে এটুকুই বলা যায় যে, ভক্তপুর হতে বাম পার্শ্বে বাঁক ঘুরে উত্তর-পূর্বে প্রায় ১২ মাইল দূরত্বের ব্যবধানে এই নাগেরকোট—দার্জিলিং-এর মত একটি মনোরম শৈলনগরী। উচ্চতা ৭,০০০´ ফুট। চতুর্দিকে চলেছে গিরিরাজের শৃঙ্গাবলীর মিছিল। যে দিকে দৃষ্টি যায় দেখা যায় বৈচিত্র্যের সমাবেশ। নয়নাভিরাম সব দৃশ্য। দেহমন স্নিগ্ধকারী হিমেল হাওয়া যেন জানিয়ে দেয় চলে এসেছি গিরিরাজের অঙ্গনতলে। মেঘমুক্ত দিবসে দেখা যায় ২৯,০২৮ ফুট উচ্চ সাগরমাথা বা মাউণ্ট এভারেষ্ট—সুনীল আকাশ ভেদ করে উঠে গেছে তার শীর্ষদেশ—তুষারমৌলি তার শৃঙ্গ। সামনে দাঁড়িয়ে যেমন দূরে পূর্ব পশ্চিমে দেখা যায় পর্বতের মিছিল ধবলগিরি

অন্নপূর্ণা, হিমালচূলী ও মানালস্থু প্রভৃতি এখানে দাঁড়িয়ে দেখা যায় ঐ পর্বতগুলি মুখোমুখি। দেখা যায় গৌরীশংকরের অপূর্ব দৃশ্য। ৭,১৩৩´ ফুট নাগেরকোটের শীর্ষদেশে রয়েছে 'মহাদেও পোখরি' নামে একটি শৈল হ্রদ—সেখানে প্রতিষ্ঠিত দেবাদিদেব মহাদেবের মূর্তি। আরও কত সব নাম-না-জানা পর্বতের শৃঙ্গ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে যেন পর্যটক-দের স্বাগত জানাচ্ছে। দক্ষিণের অংশ ঘন বনাচ্ছাদিত, সেখানে দেখা যায় বিচিত্র রংএর সব পক্ষিকুল সেই সঙ্গে বিভিন্ন বকমেব চিতাবাঘ। এখানকার এই মনোরম দৃশ্যাবলীর আলোকচিত্র গ্রহণেব জন্য দর্শক ও পর্যটকদের সকলের হাতেই থাকে একটি কবে ক্যামেরা ও দূরদূরান্তরের দৃশ্য দর্শনের জন্য বাইনোকুলার। নাগেরকোটে এসে স্তব্ধ-গম্ভীর গিরিরাজি দেখে সত্যই চোখ জুড়িয়ে যায় সেই সব দর্শকদের যাঁরা কেদার-বদরী অমরনাথ আর গোমুখ যাত্রাকালে অপরূপ সব পার্বত্য শোভা স্বচক্ষে দর্শন করেন নি। পাঁচ মাইল পূর্বে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে ইন্দ্রবতীর মত পার্বত্য জলাশয়। জল-তরঙ্গে মুখরিত স্থানটি পর্যটকদেব মন ভোলায়। নৌবিহারের ব্যবস্থাও রয়েছে সেখানে। কিন্তু আমাদের মোটবচালকটির অতিনিদ্রাই এসব দৃশ্যাবলী দর্শনের সাধে বাদ সাধল।

॥ দক্ষিণা কালিকা ॥

২৭শে ফেব্রুয়ারী কাঠমাণ্ডু ছেড়ে রওনা হতে হবে কলকাতার পথে —তাই তাকে নিরাশ না করে আমরা পাঁচজনে মিলে 'ফারপিং'-এ দক্ষিণাকালী দর্শনে যাত্রার অন্য প্রস্তুত হয়ে নিলুম। কাঠমাণ্ডু হতে ১২ মাইল পথ। গাড়ী ছুটল ৮-৩০ মিনিটে চম্পাদেবী ও মহাভারত পর্বতের ঢালের দিকে—পুরাতন শহর ফার্পিং অভিমুখে। কাঠমাণ্ডুর দু'মাইলের মধ্যেই কীর্তিপুর শহরতলী—৩০০´ ফুট উচ্চে অবস্থিত, চারিদিকে সমভূমি। গৌরবে আর মহিমায় মূল শহর কাঠমাণ্ডুকেও দিয়েছে টেক্কা। এখন হতে ৭০০ শত বৎসর পূর্বে সুন্দরের পূজা করতে

গিয়েই এই কীর্তিপুর শহরের প্রতিষ্ঠা। তবে এর রক্তাক্ত ইতিহাসও কম নয়। সে কথা এখন থাক।

এখানেই মোটর মার্গ হতে ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই ত্রিভুবন বিশ্ব-বিদ্যালয় গড়ে তুলেছেন তাঁর পুত্র রাজা মহেন্দ্র শাহ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখেই চালককে তার গাড়ী নিয়ে যেতে নির্দেশ দিলাম। নব-নির্মিত বাড়ীগুলি মনোজ্ঞ দর্শন সন্দেহ নাই কিন্তু বাহ্যিক ঐশ্বর্যের তুলনায় আন্তর-দৈন্যের সীমা নাই। কারণ এখানে অধ্যয়নের উপযুক্ত ছাত্র-সংখ্যা নগণ্য। গাড়ী চলতে শুরু করল ফার্পিং ও দক্ষিণাকালী অভিমুখে। বেলা বেড়ে চলে—শীতের রৌদ্রে সবুজ মাঠের মাঝ দিয়ে পীচঢালা পথে ছুটে চলে আমাদের গাড়ীখানি। প্রাকৃতিক দৃশ্যে মন-প্রাণ একটা তৃপ্তির আস্বাদে ভরে ওঠে। পাহাড় ছেড়ে শুভ্র মেঘখণ্ড-গুলি পাড়ি জমায় আকাশের দিকে।

বেলা ৯-৩০ মিনিট মধ্যেই পৌঁছে গেলুম দক্ষিণা কালিকার মন্দিরচত্বরে। বনাচ্ছাদিত পরিবেশ, তৎসহ স্বচ্ছ জলধারাবেষ্টিত স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য মনের মধ্যে একটি শুচিশুভ্র ভাব এনে দেয়। স্তরে স্তরে কতকগুলি সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে—সেখানেই চতুর্দিকে গাছপালা ঘেরা প্রস্তরগাত্রে দক্ষিণা কালিকার মূর্তিটি। সিন্দুরে চন্দনে এরূপ বিভূষিতা যে, মূর্তিটিকে বোঝার উপায় নাই। দলে দলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ভক্তিবিনম্র চিত্তে দর্শন করছেন মূর্তিটি। মহিলারা ধূপ-দীপ ও পূজোপকরণাদি সহ ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক দেবীকে উৎসর্গ করছেন পূজার উপকরণ। প্রায় ১ ঘণ্টাকাল পূজারতি দর্শনের পর বিদায় নেবার প্রাক্কালে পুরোহিত-গণের নিকট জানা গেল যে, কালিকাদেবীর ঊর্ধ্বাঙ্গ পার্শ্ববর্তী পর্বতশিখরে অবস্থিত। শুরু হল দ্রুতপদে পর্বতশীর্ষে আরোহণ। স্ত্রী-পুরুষ অনেকেই হলেন সহগামী। অনেকে আবার চড়াই উত্তরণে অক্ষমতার জন্য মধ্যপথ হতে প্রণাম জানিয়েই প্রত্যাবর্তন করলেন। তবু বেশ কয়েকজন পর্বতশীর্ষে আরোহণ করে লামা

যোগিনীকে কিছু দক্ষিণা দান করে দর্শন করলুম পর্বতশীর্ষস্থ মাতৃমূর্তি।

নীচে তখন কালিকাদেবীর সামনে ছাগ, মোরগ প্রভৃতি পশুবলি শুরু হয়ে গেছে। অধিকক্ষণ অপেক্ষা না করে মাতৃদেবীকে প্রণাম জানিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে সকলে শিখানারায়ণ দর্শনে যাত্রা করলুম। খাড়া পর্বতের উপর খোদিত শিখানারায়ণের মূর্তি। প্রবেশ পথে ছোট্ট একটি চতুষ্কোণ পুষ্করিণী। সংক্ষেপে দর্শন শেষ করতে হল—বেলা বৃদ্ধির কথা স্মরণ করে। গাড়ীর মুখ ফিরল কাঠমাণ্ডুর দিকে—বেলা তখন ১২টা। বামপার্শ্বে কীর্তিপুর আর নেপাল বিশ্ববিদ্যালয় ফেলে রেখে পৌঁছে গেলাম হোটেল অপেরায় বেলা ১টায়। যথারীতি মধ্যাহ্ন ভোজনের পর্ব শেষ করে বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় অপরাহ্নে বেরিয়ে পড়লুম কাঠমাণ্ডুর কেন্দ্রস্থল হনুমানঢোকার অলি-গলি আর সড়ক-পথে সব কিছু দেখার উদ্দেশ্যে সঙ্গে শ্রীচক্রবর্তী ও চ্যাটার্জি। কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করতেই সন্ধ্যা নেমে এল কাঠমাণ্ডু শহরে—আলো জ্বলে উঠেছে কাঠমাণ্ডুর পথে পথে। আমরা তিনজনে চলতে শুরু করেছি আলো-আঁধারি পথে কাঠমাণ্ডুর বস্তি অঞ্চলে। স্থানে স্থানে বিক্রয় হচ্ছে মহিষের দলা দলা মাংস—বহু হিপ্পি-দম্পতি চলেছে একের পর এক সেই সব রাস্তা বেয়ে। রাত্রি ৮টায় নিউ রোড হয়ে ফিরে এলুম হোটেলে। নৈশভোজন সমাপ্ত হল। কাঠমাণ্ডুর শীতের রাত্রি কাটল। সকাল হতেই শুরু হল তল্পি-গোটানর পালা।

চার

॥ ফেরার পথে ॥

২৭শে ফেব্রুয়ারী চা পান ও প্রাতরাশের পর বেলা ৮টায় দু'খানি বাস যাত্রী নিয়ে রওনা হল রক্সৌল অভিমুখে। যে পথ দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই পথেই ফেরা। পশ্চাতে পড়ে রইল কাঠমাণ্ডু উপত্যকার সমতল প্রান্তর। উপত্যকার বাড়ীঘরগুলি ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। পাহাড়ঘেরা আশ্চর্য একটা রূপকথার দেশ থেকে ক্রমেই সরে আসছি আমরা। এমনি করে ৩ ঘণ্টা চলার পর বেলা ১১টায় পৌঁছে গেলুম টিষ্টুং। সেখানেই শেষ হল আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের পর্ব প্যাকেট ব্যবস্থায়। বেলা ১২টার মধ্যেই টিষ্টুং হতে রওনা হয়ে ভঁইসে পৌঁছে গেলুম ৩-২০ মিনিটে। নেপালের বৈচিত্র্যময় বন-পাহাড়, মাঠ-ময়দান দেখতে দেখতে—সোনালী ও সবুজে ভরা ক্ষেত্র অতিক্রম করে ঢেউ-খেলানো পাহাড়ের গা বেয়ে ভঁইসে থেকে ৩-৫৮ মিনিটে গাড়ী ছেড়ে চলল হু হু শব্দে। পৌঁছে গেলুম নেপালের বীরগঞ্জ সীমান্তে অপরাহ্ণ ৬টায়। এখান হতেই প্রথম শুরু হল শুল্ক বিভাগের কর্মচারীদের কড়া তদন্ত নেপাল হতে আনীত দ্রব্যসামগ্রীর উপর। এই তদন্তের আরও কঠোর ব্যবস্থার সম্মুখীন হতে হল ভারত সীমান্ত বীরগঞ্জে। সমস্ত যাত্রীদের বিছানাপত্র, স্যুটকেশ, ট্রাঙ্ক সবকিছু তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে যার কাছে যা কিছু আপত্তিকর পাওয়া গেল সেগুলি বাজেয়াপ্ত করে শুল্ক বিভাগের কর্মচারীরা মালগুলির পরিবর্তে রসিদ লিখে দিল কলকাতা হতে উপযুক্ত শুল্ক দিয়ে সেগুলি মুক্ত করে নেবার জন্য। আমাদের তিনজনের কাছে আপত্তিকর কিছু না পাওয়ায় সত্বর ছাড়া পেয়ে পৌঁছে গেলুম রক্সৌল। এতেও সময় লাগল প্রায় আড়াই ঘণ্টা।

রক্সৌল ষ্টেশনে পৌঁছলাম রাত্রি ৮-৩০ মিনিটে। সত্বর নৈশভোজন

সমাপ্ত করে মীটার গেজের গাড়ীর বেঞ্চে বিশ্রামের জন্য আশ্রয় নিলুম। রাত্রি ২টায় রক্সৌল হতে গাড়ী ছেড়ে ধীরে মন্থরে চলতে চলতে দ্বারভাঙ্গা এসে পৌঁছলুম ২৮শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৯-৩০ মিনিটে। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বেলা ২-৫০ মিনিটে দ্বারভাঙ্গা হতে গাড়ী ছাড়ল। সমস্তিপুর পৌঁছলুম বেলা ৪-১৫ মিনিটে। তখন রিম্ ঝিম্ বৃষ্টি নেমেছে। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের দল কেউবা উত্তর-তিরিশের কোঠায় বেরিয়ে পড়লেন সমস্তিপুরের বাজার ঘুরতে —সঙ্গে কুণ্ডু স্পেশ্যালের সুদর্শন যুবক সুভাষ কুণ্ডু। বিশেষ একটি বয়সে এসে এই সব যৌবনসুলভ উচ্ছলতা সাক্ষী হয়ে উপভোগ করতে ভালই লাগে। এ বয়সটা পশ্চাতে ফেলে আসা যৌবন-স্মৃতির রোমন্থনের পালা। এইসব তরুণদের মনের মুকুরে যেন নিজেকে আর একবার নূতন করে দেখে নেওয়া। নৈশভোজনের পর রাত্রি ১০-৩০ মিনিটে ছেড়ে এলুম সমস্তিপুর। ট্রেন চলছে কূর্মগতিতে। এমনি করে এসে সকাল ৬-৪৫ মিনিটে পৌঁছে গেলুম যশিদী ষ্টেশনে। সেখান হতে ৭-৪৫ মিনিটে মধুপুর। গাড়ীখানির ইঞ্জিন বিকল হওয়ায় প্রায় ৩ ঘণ্টা অবস্থানের পর পুনরায় ট্রেনটি চলতে শুরু করল হাওড়া অভিমুখে। মধুপুরের অনেক স্মৃতি জমা হয়ে আছে মনের মণিকোঠায। সে ১৯৪৬ সালের কথা। সুপণ্ডিত উচ্চকোটির সাধক স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য তখনও জীবিত—যাঁর সুবৃহৎ পাতঞ্জল যোগদর্শন ভাষ্য অমর করে রেখেছে তাঁকে। থাকতেন গুহাপন্থী হয়ে। শিষ্যসেবকগণ খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আসতেন গুহা-গৃহের প্রকোষ্ঠটিতে। এ হেন পুণ্যশ্লোক মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল কয়েকদিন। ওখানেই সাক্ষাৎ হয় সে যুগের নৃত্যপটিয়সী অভিনেত্রী লীলা দেশাই-এর মায়ের সঙ্গে। হাওড়া নিবাসী বাঙালী মহিলা বিখ্যাত বেহালাবাদক ডাঃ দেশাইকে বিবাহ করে চলে যান আমেরিকায়। বেশ কিছুদিন থাকার পরও যখন আমেরিকার বিশাল পরিবেশে বেহালাবাদক হিসাবে কোন সুযোগ পেলেন না ডাঃ দেশাই তখন অবশেষে

অনুসন্ধান করে উপস্থিত হলেন প্রচারক সন্ন্যাসী স্বামী অভেদানন্দের কাছে—ভারতীয় বেহালাবাদক হিসেবে তিনি তাঁর (ডাঃ দেশাই-এর) কোন সুযোগ করে দিতে পারেন কিনা এটুকু জানতে। শ্রীমতী দেশাই বললেন "স্বামী অভেদানন্দের নিকট পরিচয় পত্র নিয়ে আমেরিকার কয়েকটি সঙ্গীত-সংস্থার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ডাঃ দেশাই এবং পরবর্তী কালে বেহালাবাদক হিসাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তিনি আমেরিকায়। আমরা চিরকৃতজ্ঞ সেই মহাপুরুষের কাছে।" বলেই মস্তকে দুটি হাত ঠেকিয়ে আবার বলে চললেন শ্রীমতী দেশাই আবেগপ্লুত স্বরে: "স্বচক্ষে দেখে এসেছি সে দেশে প্রচারক স্বামী অভেদানন্দেব অভূতপূর্ব সাফল্য। শুনেছি অগণিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সঙ্গে একাসনে বসে তাঁর এক-দেড় ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা। দেখেছি কেমন করে তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন তাঁর ওজস্বিনী বক্তৃতায় আমেরিকার মত জড়বাদী দেশে। আহা! আজ আর তিনি স্থূল দেহে নাই—ডাঃ দেশাইও নাই।" আনন্দ পেয়েছিলাম সেদিন শ্রীমতী দেশাই-এর সঙ্গে স্বল্পক্ষণের আলোচনায়। গাড়ী চলেছে হাওড়া অভিমুখে। ভাবছি, চার বৎসর পূর্বে যাত্রা শুরু করেছিলাম কেদারনাথে শিবদর্শনের জন্য। পরিক্রমা শেষ শিবদর্শনে। এই শিবকে কেন্দ্র করেই তো গড়ে উঠেছে শৈবতন্ত্র আর তার বিভিন্ন সম্প্রদায়। সম্প্রদায় বিভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য এক। শিবই হল তাদের মতে পরম-তত্ত্ব বা পরমপুরুষ। এ শিব শক্তিযুক্ত শিব। কারণ, শক্তিই শিবের প্রকাশ। 'শৈব'রা মূলতঃ অদ্বৈতবাদী—তবে এ উপলব্ধি বিশুদ্ধ শাংকর অদ্বৈতবাদ নয়। জীবের সঙ্গে শিবের সাযুজ্য। শিব-শক্তির সামরস্য সাধন। অবশ্য সাযুজ্যের মাত্রাভেদ নিয়ে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মতভেদ আছে। তা থাক্, তবু শিবই সকলের আরাধ্য। গাড়ী পৌঁছে গেল হাওড়া ষ্টেশনে সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে। হাওড়া সেতু অতিক্রমকালে শিরজটাচ্যুতা শৈবলিনীকে প্রণাম জানিয়ে ফিরে এলুম দীর্ঘদিনেব চির-পরিচিত আবাসে।

⊙